Family Development Package - Book 7

মহিলা পুরুষের সলাতে কোন পার্থক্য নেই

চিত্রসহ সহীহ দলিল ভিত্তিক

জিবরাঈল আ.-এর দেখানো রসূল সা.-এর সলাত

তোমরা ঠিক সেভাবে সলাত আদায় কর
যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ।
(সহীহ বুখারী)

Prophet's Prayer

আমির জামান
নাজমা জামান

মহিলা পুরুষে সলাতে কোন পার্থক্য নেই

চিত্রসহ

Prophet's Prayer

সহীহ দলিল ভিত্তিক জিবরাঈল আ.-এর দেখানো

রসূল সা.-এর সলাত

এছাড়া এই বইতে রয়েছে

যাকাত ও সিয়ামের উপর ২০০টি প্রশ্ন ও উত্তর

আমির জামান
নাজমা জামান

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ

তোমরা ঠিক সেভাবে সলাত আদায় কর যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ ।
(সহীহ বুখারী হাদীস #৬৩১, #৬০০৮, #৭২৪৬)

সম্পাদনায়

✍
আবদুর রহীম বিন হাবিবুর রহমান
দাওরায়ে হাদীস, কামিল (হাদীস), বি.এ (পি.সি)
মুদাররিস, মুহাম্মাদী মডেল মাদ্‌রাসা
ইমাম, আল-আমীন জামে মসজিদ
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

✍
ফরিদ উদ্দিন আহমাদ
দাওরায়ে হাদীস
দারুল উলুম মাদানীয়া মাদ্রাসা, ঢাকা

Published by
Institute of Family Development, Canada
www.themessagecanada.com

সহীহ্ দলিল ভিত্তিক রসূল ﷺ -এর সলাত, যাকাত ও সিয়াম

Amir Zaman
Nazma Zaman
Toronto, Canada
Email : themessagecanada@gmail.com

1st Edition: July 2013
2nd Edition: December 2015

প্রাপ্তিস্থান

Bangladesh:

IFD Trust	**UZ Sales Centre**	**Taleb Pharma**	**Al-Maruf Publications**	**Kabir Pablishers**
Mohammadpur		NurJahanRoad		
Dhaka	Dhaka	Dhaka	Katabon, Dhaka	Chittagong
01710219310	01712846164	01917216350	029673237	01613061653
01682711206	01675865180	01712177474	01913510991	

Canada:

TIC	**ATN Book Store**	**Proton Book Centre**
Toronto Islamic Centre	Danforth, Toronto	Danforth, Toronto
575 Yonge St. Toronto	416-686-3134	416-388-4250
647-350-4262	416-671-6382	647-346-4250

Other Countries:

New York, USA	**California, USA**	**London, UK**	**Singapore**
917-671-7334	714-821-1829	447424248674	65-938-67588
718-424-9051	714-930-6677		

মূল্য ঃ ২৫০ টাকা (BDT)
Price: $7 (Seven Dollars)

ভূমিকা

আস্‌সালামু আলাইকুম

আমি কি জানি আমার সলাত সহীহ হচ্ছে কিনা? আমি কি জানি আমার সলাত রসূল ﷺ-এর দেখিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে হচ্ছে কিনা? আমি কি কখনো সলাতের উপর দলিল ভিত্তিক পড়াশোনা করেছি? আমি কি কখনো প্রকৃত কারণ খুঁজে দেখেছি আমার সলাতের মধ্যে আর রসূল ﷺ-এর সলাতের মধ্যে এতো পার্থক্য কেন হলো? কীভাবে আমরা এই সকল প্রশ্নের উত্তর সহজে পেতে পারি?

আল্লাহর রসূল ﷺ নিজে সলাতের প্রতিটি ধাপ যেভাবে এক এক করে দেখিয়েছেন তার সহীহ দলিলসমুহ এই বইতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বইতে সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কারও রেফারেন্স দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। আমাদের সামনে যদি রসূল ﷺ-এর সহীহ দলিল থাকে সেখানে অন্য কারো ফতোয়া গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন একটি বিষয়ে রসূল ﷺ বলেছেন একরকম আবার অন্য আরেকজন বলেছেন অন্যরকম। আমরা অবশ্যই রসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরব। তাই সলাতের প্রতিটি বিষয়ে, প্রতিটি ধাপে রসূল ﷺ-এর যে সহীহ দলিল রয়েছে আমরা সেটাই গ্রহণ করবো এবং অনুসরণ করবো, ইনশাআল্লাহ। অন্ধভাবে কাউকে অবশ্যই অনুসরণ করবো না।

সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ ইমেইল অথবা টেলিফোনে জানালে আগামী সংস্করণে তা প্রতিফলিত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে সঠিক পথে থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন।

জাযাকআল্লাহু খাইরন,

আমির জামান
নাজমা জামান
টরন্টো, ক্যানাডা

এই বইতে কোন জাল এবং দূর্বল হাদীস দলিল হিসেবে নেই

সূচীপত্র

৫ম অধ্যায় ঃ অন্যান্য সলাত

৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ সলাতের অন্যান্য বিষয়

আমি কি জানি
১০ বছর বয়স থেকে আমার সন্তানের উপর সলাত ফরয?

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ
"সাত বছর বয়স হলে তোমাদের সন্তানদের সলাত আদায়ের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়স হওয়ার পর এজন্য তাদের প্রতি কঠোর হও এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।" (আবূ দাউদ)

সলাত (নামায) না পড়লে কার ক্ষতি ?

মুমিন এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য সলাত (নামায)

"মুমিন ও কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত পরিত্যাগ করা।"
[সহীহ মুসলিম]

সলাত (নামায) ত্যাগকারী ইসলাম হতে বের হয়ে যায় অর্থাৎ কাফির হয়ে যায়

"তবে এখন যদি তারা তাওবা করে সলাত পড়ে ও যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।" [সূরা আত তাওবা ঃ ১১]

যে সলাত (নামায) ছেড়ে দিল সে কুফরী করল

"আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মাঝে চুক্তি হচ্ছে সলাতের। অতএব যে ব্যক্তি সলাত ত্যাগ করল সে কুফরী করল।"
[আবূ দাউদ, আহম্মদ, তিরমিজি, নাসাঈ]

বেনামাযির জানাযা পড়া নিষেধ

আর তাদের কেউ মরে গেলে তার জানাযা তুমি কখনই পড়বে না তার কবরের পাশে কখনই দাঁড়াবে না কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে।
[সূরা আত তাওবা ঃ ৮৪]

বেনামাযির জন্য জাহান্নাম

(ডান পাশস্থ লোকেরা) অপরাধীদের সম্পর্কে বলবে তোমাদের কিসে জাহান্নামে পাঠিয়েছে? তারা বলবে আমরা সলাত আদায় করতাম না অভাবগ্রস্তদের আহার দিতাম না। [সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৪১-৪৪]

যারা সলাত (নামায) বিনিষ্ট করল তাদের জন্যে আযাব অনিবার্য

অতঃপর তাদের পর সেই অযোগ্য অবাঞ্চিত লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হল যারা সলাতকে বিনষ্ট করল, আর কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং অচিরেই অমঙ্গল অথবা ক্ষতি প্রত্যক্ষ করবে। [সূরা মারইয়াম ঃ ৫৯]

যারা তাদের সলাত সম্বন্ধে উদাসীন তাদের জন্য দুর্ভোগ। [সূরা মাউন]

সলাতের গুরুত্ব

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব হবে তার সলাতের। যার সলাত শুদ্ধ হবে তার সকল আমলই পরিশুদ্ধ হবে। আর যার সলাত বাতিল হবে তার সকল আমল বাতিল হবে। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ত্বাবারানী, আওসাত)

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) হতে বর্ণিত রসূল ﷺ বলেছেন ঃ বান্দা যখন সলাতে দন্ডায়মান হয় তখন তার সমস্ত গুনাহ হাযির করা হয়। অতঃপর তার মাথায় ও দুই কাধে রেখে দেয়া হয়। এরপর ঐ ব্যক্তি যখনই রুকু, সাজদায় যায় তখনই গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে। (তাবারানী, বায়হাকী)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আ পর্যন্ত, এক রমাদান হতে অন্য রমাদান পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী যাবতীয় (ছগিরা) গুনাহের কাফফারা স্বরূপ। যদি সে কবীরা গুনাহসমূহ হতে বিরত থাকে, যা তাওবা করা ব্যতীত মাফ হয় না। (সহীহ মুসলিম)

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ ঘরে অথবা বাজারে একাকী সলাতের চেয়ে মসজিদে জামা'আতে সলাত আদায়ে ২৫ অথবা ২৭ গুণ সওয়াব বেশী। তিনি বলেন, দুই জনের সলাত একাকীর চাইতে উত্তম। ..... এভাবে জামা'আত যত বড় হয় নেকী তত বেশী হয়। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ওবাদা ইবনু সামেত (রা.) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আল্লাহ তোমাদের জন্য ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে সলাতের রুকনসমূহ পরিপূর্ণ করে যথাযথ খুশূ-খুযূ সহকারে ঠিক সময়ে আদায় করবে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তা পালন করল না তার জন্য আল্লাহর কোন প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন কিংবা শাস্তি দিতে পারেন। (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায়, বান্দার আমল সমূহের মধ্যে সলাতই হচ্ছে মূল। যার সলাত ঠিক হবে তার সব আমলই সঠিক হবে। আর যার সলাত বিনষ্ট হবে তার সব আমলই বিনষ্ট হবে।

১ম অধ্যায়
মহিলাদের সলাত

মহিলা-পুরুষে সলাতে কোন পার্থক্য নেই

সহীহ হাদীস অনুযায়ী ক্বিয়াম (দাঁড়ানো), রুকু, সাজদাহ, জলসায় মহিলা-পুরুষের জন্য একই নিয়ম। আমাদের দেশে মহিলারা যে নিয়মে রুকু, সাজদাহ এবং বৈঠক করেন তা রসূল ﷺ -এর দেখানো নিয়ম নয়। আল্লাহ ত'আলা বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ

الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

“আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করে তখন কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর ঐ নির্দেশের ব্যতিক্রম করার কোন অধিকার থাকে না; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা অমান্য করল, সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।” (সূরা আহযাব ঃ ৩৬)

যদি আমরা উপরের এই আয়াতটি সঠিকভাবে বুঝে থাকি, তবে আমাদেরকে নিম্নের হাদীসটি অবশ্যই মানতে হবে।

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Pray as you seen me praying (Sahih Bukhari)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ঠিক সেভাবে সলাত আদায় কর যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ।

[সহীহ বুখারী ঃ তাওহীদ প্রকাশনী #৬৩১ ১ম খন্ড পৃ. ৩০৫, #৬০০৮ ৫ম খন্ড পৃ. ৪৪৬, ৭২৪৬ ৬ষ্ঠ খন্ড পৃ. ৪১৯, আধুনিক প্রকাশনী # ৫৯৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন # ৩০৬]

উপরের এই হাদীসে রসূল ﷺ বলেননি যে পুরুষরা আমার মতো করে সলাত আদায় করবে এবং নারীরা আয়িশা (রা.)-র মতো সলাত আদায় করবে। বরং তিনি পুরুষ-মহিলা সকলকেই বলেছেন তাঁর মতো সলাত আদায় করতে।

কোন্ আলেম কিভাবে সলাত আদায় করেন সেটা মূল বিষয় না। সলাত-সিয়াম থেকে শুরু করে আমাদের জীবনের সকল ইবাদত এবং কার্যক্রমের একমাত্র মানদণ্ড হবে আমাদের রসূল ﷺ। আর আমরা আমাদের জীবনের সকল কার্যক্রমে রসূল ﷺ -কেই অনুসরণ করবো। রসূল ﷺ তাঁর জীবনে সমস্ত কাজ কিভাবে করেছেন সেটাই আমাদের বিচারের মূল মানদণ্ড।

তাই আল্লাহর রসূল ﷺ যেভাবে সলাত আদায় করেছেন আমাদেরকেও ঠিক সেভাবেই সলাত আদায় করতে হবে, এর ব্যতিক্রম করার কোন উপায় নেই। বাজারে সলাত বা নামায শিক্ষার অনেক বই পাওয়া যায়, কিন্তু তার মধ্যে বেশীরভাগ বই-ই রসূল ﷺ -এর ঐ হাদীসের উপর ভিত্তি করে লেখা নয়।

আমরা সকলেই জানি যে রসূল ﷺ -এর জীবনে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) দু'দিন প্রাকটিক্যাল করে রসূল ﷺ -কে ৫ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা দেখিয়েছেন এবং শিখিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

নিশ্চয়ই জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বিভিন্ন উপায় বা বিভিন্ন স্টাইলে সলাতের নিয়ম-কানুন দেখাননি, একরকমই দেখিয়েছেন। যে সকল বিষয়ে দলিলস্বরূপ অনেক 'সহীহ হাদীস' (authentic hadith) রয়েছে সেখানে দুর্বল বা জাল হাদীস অনুসরণ করার তো প্রশ্নই উঠে না। তাই রসূল ﷺ যেভাবে সলাত আদায় করেছেন তার প্রতিটি বিষয় সরাসরি সহীহ হাদীসে দলিলস্বরূপ রয়েছে। ইনশাআল্লাহ আমরা সে অনুযায়ী নিজেদের সলাত আদায় করার চেষ্টা করবো।

সহীহ বুখারীর বর্ণনা অনুসারে রসূল ﷺ -এর একজন স্ত্রী সাওদা (রা.) তিনি বলেছেন যে, 'রসূল ﷺ যেভাবে সলাত আদায় করতেন আমারাও ঠিক সেভাবে সলাত আদায় করতাম।'

পুরুষ মহিলাদের সলাতের মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই। সলাতে নারীরা পুরুষদের অনুগামী। (মির'আত ৩/৫৯, নায়ল ৩/১৯)

মসজিদে নববীতে নারী-পুরুষ সকলে রসূল ﷺ -এর পিছনে একই নিয়মে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ও জুম'আ আদায় করেছেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

মহিলা-পুরুষ দু'জনেই বুকে হাত বাঁধবেন

প্রকাশ থাকে যে, সলাতে দাঁড়িয়ে মেয়েদের জন্য বুকে হাত বাঁধা ও পুরুষের জন্য নাভির নীচে হাত বাঁধার যে রেওয়াজ চালু আছে, হাদীসে বা আছারে (সাহাবীদের বক্তব্যে) এর কোন প্রমাণ নেই। বরং এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, সলাতের মধ্যকার ফরয ও সুন্নাতসমূহ মুসলিম নারী ও পুরুষ সকলে একই নিয়মে আদায় করবেন। দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টি সাজদার স্থানে থাকবে।

মহিলাদের রুকু

যে ব্যক্তি রুকু ও সাজদায় স্বীয় মেরুদন্ড সোজা করে না, তিনি (রসূলুল্লাহ) সেই সলাতকে বাতিল বলে ফায়সালা দিতেন কারণ সেই ব্যক্তি হচ্ছে একজন সলাত চোর। (মুসনাদে আহমাদ)

রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ ঐ ব্যক্তির সলাত যথার্থ হবে না, যতক্ষণ না সে রুকু ও সাজদাতে তার পিঠ সোজা রাখে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)
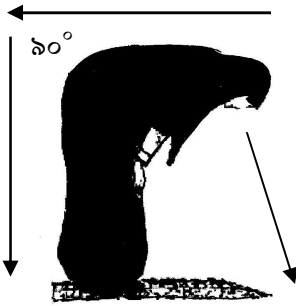
উপরের দু'টি হাদীসে রসূল ﷺ রুকু ও সাজদাতে পিঠ সোজা রাখতে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। এবং এটাও বলেছেন যে পিঠ সোজা না রাখলে সলাত যথার্থ হবে না। কিন্তু আমাদের দেশে মহিলারা সহীহ হাদীস না জানার কারণে রুকু ও সাজদায় পিঠ সোজা রাখেন না। মনে রাখতে হবে, রুকুর সময় দৃষ্টি সাজদার স্থানে থাকবে।

মহিলাদের সাজদাহ

অনেক মহিলা সাজদায় গিয়ে মাটিতে নিতম্ব রাখেন। এই মর্মে 'মারাসীলে আবূ দাউদে' বর্ণিত হাদীসটি নিতান্তই 'যঈফ'। এর ফলে সাজদার সুন্নাতী তরীকা বিনষ্ট হয়। সাজদাহ হল সলাতের অন্যতম প্রধান 'রুকন'। সাজদাহ নষ্ট হলে সলাত বিনষ্ট হবে।

আর মহিলাদের জড়সড় হয়ে সাজদাহ করার ব্যাপারে কোন হাদীস সহীহ নেই। (সিলসিলাহ জয়ীফাহ) এ জন্যই ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) বলেন, 'সলাতে মহিলা ঐরূপই করবে, যেরূপ পুরুষ করে থাকে।' (সিফাহ স্বালাতিন নাবী ﷺ)

রসূল ﷺ সাজদার সময় দুই বাহু দূরে সরিয়ে রেখে বগল ফাঁকা করে রাখতেন। ইচ্ছে করলে দুই বাহুর এই ফাঁক দিয়ে ছোট ছাগল ছানা দৌঁড়ে যেতে পারতো। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

তাই মহিলাদের সাজদার সময় বুক হাটুর সঙ্গে চেপে রাখা যাবে না। বরং সাজদাহ লম্বা করে দিতে হবে যাতে পিঠ সোজা হয়ে থাকে এবং পেটের নিচ দিয়ে ছোট ছাগল ছানা পার হয়ে যাওয়ার মতো জায়গা ফাঁকা থাকে। নিম্নের চিত্রটি মহিলাদের সাজদার সঠিক পদ্ধতি। সাজদার সময় চোখ খোলা রাখতে হবে এবং দৃষ্টি সাজদার স্থানে থাকবে।

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাজদাহ অবস্থায় বাহুদ্বয় কুকুরের মত বিছিয়ে রাখবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা রুকু ও সাজদাগুলো যথাযথভাবে আদায় করবে। আল্লাহর শপথ! আমি আমার পিছন হতে বা রাবী বলেন, আমার পিঠের পিছন হতে তোমাদের দেখতে পাই, যখন তোমরা রুকু ও সাজদাহ কর। *(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, তাওহীদ পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬০, হাদীস # ৭৪২)*

আলী ইবনে শায়বান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি ছিলেন প্রতিনিধি দলের সদস্য। তিনি বলেন, আমরা রওনা হয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এলাম, তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলাম এবং তাঁর পিছনে সলাত আদায় করলাম। তিনি এক ব্যক্তির দিকে হালকা দৃষ্টিতে তাকান যে রুকু ও সাজদায় তার পিঠ সমতল রাখেনি। নাবী ﷺ সলাত শেষ করে বললেন,

হে মুসলিম সমাজ! যে ব্যক্তি রুকু ও সাজদায় তার পিঠ সমতল করে না তাঁর সলাত আদায় হয় না। *(সুনান ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, আধুনিক প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯৩, হাদীস # ৮৭১)*

মহিলাদের বৈঠক/জলসা

উম্মে দারদা (রা.) তাঁর সলাতে পুরুষের মতই বসতেন। আর তিনি একজন ফীকাহবিদ ছিলেন। (আত-তারীখুস স্বাগীর, সহীহ বুখারী ৯৫ পৃঃ সহীহ বুখারী ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ২/৩৫৫)

মহিলাদের সলাতে পর্দার নিয়ম

মহিলাদের সলাত আদায় করার সময় হাতের কব্জি থেকে আঙ্গুল এবং মুখমণ্ডল ব্যতীত সবই ঢাকা থাকতে হবে। এমন পাতলা কাপড় পরা যাবে না যা দিয়ে শরীর দেখা যায়। এমন আঁটসাঁট পোশাকও না পরা যাতে সতরযোগ্য অঙ্গসমূহ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। মনে রাখতে হবে পা অবশ্যই ঢাকা থাকতে হবে। সলাতে পা ঢাকার জন্য মোজা পড়া যেতে পারে অথবা একটা লং স্কার্ট বা ম্যাক্সি ব্যবহার করা যেতে পারে যেটা মাটি থেকে আরো কিছুটা লম্বা হবে। ইউরোপ এবং নর্থ-আমেরিকার অনেক মসজিদেই মহিলাদের সেক্শনে এই ধরনের কাপড়ের ব্যবস্থা থাকে যা সলাতের সময় মহিলারা পরিধেয় কাপড়ের উপর দিয়ে পড়ে নিতে পারেন।

চিত্র ঃ সলাতে মহিলাদের জন্য এই ধরনের ড্রেস উত্তম

দলিল ১ ঃ আল-কানাবী .... মুহাম্মাদ ইবনে কুনফুয হতে তাঁর মাতার সনদে বর্ণিত। তিনি উম্মে সালামা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে প্রশ্ন করেন যে, নারীরা কী কী কাপড় পরে সলাত আদায় করবে? তিনি বলেন, ওড়না এবং জামা পরে, যদ্দারা পায়ের পাতাও ঢেকে যায়। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

দলিল ২ ঃ মুজাহিদ ইবনে মূসা ... উম্মে সালামা (রাদিআল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেন যে, নারীরা পাজামা পরা ছাড়া শুধু ওড়না ও চাদর পরে সলাত আদায় করতে পারে কি? তিনি বলেন, যখন চাদর বা জামা এতটা লম্বা হবে, যাতে পায়ের পাতা ঢেকে যায় – এরূপ কাপড় পরে সলাত আদায় করতে পারবে। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, এ হাদীসটি ইমাম মালেক আনাস, বকর ইবনে মুদার, হাফস ইবনে গিয়াছ, ইসমাঈল ইবনে জাফর, ইবনে আবূ যের ও ইবনে ইসহাক (রহ.) মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদের সনদে, তিনি তাঁর মায়ের সনদে এবং তিনি উম্মে সালামা (রাদিআল্লাহু আনহা)-এর সনদে বর্ণনা করেছেন (আবূ দাউদ)

দলিল ৩ ঃ রসূল ﷺ বলেন ঃ কোন প্রাপ্তবয়স্কা নারীর সলাত চাদর ব্যতীত কবুল হয় না। (আবু দাউদ, ইরওয়াউল গালীল হাদীস # ১৯৬)

অতএব সলাত আদায়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের পরিহিত সাধারণ পোশাকে যদি পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে যায়, তাহলে তার মাথা ঢাকার জন্য এমন একটি চাদর ব্যবহার করতে হবে যাতে তার মাথা এমনভাবে ঢেকে যায় যে কপালের সমস্ত চুল, কান ইত্যাদি আবৃত হয় ও শুধু মুখমন্ডল বের হয়ে থাকে।

দলিল ৪ ঃ আয়িশা (রা.) বলেন, রসূল ﷺ ফজরের সলাত আদায় করতেন আর আমি তাঁর সাথে অনেক মুমিনা মহিলাকে চাদর দিয়ে গা ঢেকে সলাতের জামা'আতে শরীক হতে দেখেছি। সলাত আদায় শেষে তারা নিজ নিজ বাড়ী ফিরে যেত। তাদেরকে কেউ চিনতে পারত না। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৩৭২)

সতর্কতা ১ ঃ মহিলারা রফ'উল ইয়াদায়েন করার সময় অর্থাৎ তাকবীর দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত দুই হাত উঠাতে গিয়ে যেন বুক বা অন্য অঙ্গ দেখা না যায় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

সতর্কতা ২ ঃ আজকাল হাইস্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির অনেক মেয়েরাই টাইট জিন্স প্যান্ট এবং সার্ট বা ফোতুয়া পরে এবং পর্দার অংশ

হিসেবে মাথায় একটি স্কার্ফ পরে। সর্বপ্রথমে বলতে হবে ইসলামের নিয়ম অনুসারে এই জাতিও ড্রেসে কোনভাবেই পর্দা হয় না। টাইট প্যান্ট-সার্ট-গেঞ্জি পরে মাথায় শুধু একটি স্কার্ফ বাধলে অবশ্যই পর্দার শর্ত পূরণ হবে না। আরো দুঃখজনক যে এই জাতিও ড্রেস পরে (সার্ট খাটো হওয়ার কারণে) মেয়েরা যখন রুকু এবং সাজদাহ দেয় তখন তাদের পিছনের দিকটা উন্মুক্ত হয়ে পরে।

এবার আসি এই ড্রেসে সলাত হবে কিনা? রসূল ﷺ এর কথা অনুযায়ী টাইট কাপড়-চোপড় পরে সলাত আদায় হবে না। কারণ সলাতে পর্দা করা ফরয। যদি কারো কাপড় না থাকে তা ভিন্ন কথা।

শুধু শাড়ি পরে সলাত হবে কি? উপরের হাদীসগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম যে সলাতে মহিলারা হাতের আঙ্গুল এবং মুখমন্ডল ব্যতিত কিছুই দেখাতে পারবেন না। তাই শাড়ি পড়লে পেট দেখা যায়, এছাড়া শাড়ির আঁচল দিয়ে মাথা ঢাকলেও চুল বেরিয়ে পরে, আবার অনেক সময় শাড়িতে পিঠ এবং কোমর দেখা যায়। তাই শুধু শাড়ি পরে সলাত আদায় হবে না। শাড়ির উপর দিয়ে অন্য কিছু পরতে হবে।

সালাওয়ার-কামিজ পরে সলাত হবে কি? সালওয়ার-কামিজ পরে সলাত আদায় হতে পারে তবে ওড়না যথেষ্ট বড় হতে হবে যেন তা দিয়ে মাথা পুরোপুরি ঢাকা যায় যেন কোন ভাবেই একটা চুল বেরিয়ে না পরে। তার পর ঐ ওড়না এতোটাই পুরু এবং বড় হতে হবে যে বুকের উপর যথেষ্ট পরিমানে থাকে যেন কামিজের উপর দিয়ে বুক বোঝা না যায়। মনে রাখতে হবে সালওয়ার পড়লেও যেন পায়ের পাতা ও গোড়ালি দেখা যেন না যায়।

মহিলাদের পাক-পবিত্রতা

হায়িযের সময়সীমা ঃ হায়িয হচ্ছে মেয়েদের Menstruation Period. হায়িযের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দিন নির্দিষ্ট বলে কিছু নেই।

“আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে হায়িয সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অপবিত্র। কাজেই তোমরা হায়িয অবস্থায় স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না; যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়।” (সূরা বাকারা ঃ ২২২)

কিন্তু নারীর স্রাব যদি চলতেই থাকে বন্ধ না হয়, অথবা সামান্য সময়ের জন্য বন্ধ হয়, যেমন মাসে একদিন বা দু'দিন তবে তা ইস্তিহাযার স্রাব (বা অসুস্থতা) বলে গণ্য হবে।

মাসিক সম্পর্কিত অজ্ঞতার কারণে সলাত আদায় না করা ঃ মহিলারা মাসিক সম্পর্কিত মাসলা না জানার কারণে সলাতের ক্ষেত্রে অনেক ভুল করে থাকেন। কেউ যদি শেষ ওয়াক্তে পবিত্র হয়, তার উপর ঐ ওয়াক্তের সলাত আদায় করা ফরয হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ 'কেউ যদি সূর্যাস্তের পূর্বে ১ রাক'আত আসরের সলাত পায় সে পুরো আসর পেয়ে গেল।' (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

অর্থাৎ তাকে বাকি রাক'আতগুলো পড়া অব্যহত রাখতে হবে। তখন সূর্যাস্ত হলেও অসুবিধে নেই। আর যদি সূর্যোদয়ের আগে ১ রাক'আত সলাত পরিমাণ সময় আগে পবিত্র হয়, তাকে ফজর পড়তে হবে। সলাতের শেষ সময়ে পাক হওয়া সত্ত্বেও গোসল করতে গড়িমসি করায় সলাতের সময় চলে গেলে কবীরা গুনাহ হবে। মাতা-পিতা ও স্বামীর কর্তব্য হলো মেয়েলোকদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা ও তাকিদ দেয়া। নচেৎ তারাও সলাত লঙ্ঘনের কারণে গুনাহগার হবেন।

হায়িয অবস্থায় যেসকল কাজ করা নিষেধ ঃ রসূল ﷺ -এর ভাষ্য হতে যেসব কাজ নিষেধ বলে জানা যায় তা হচ্ছে- সলাত, সিয়াম, কাবা ঘরের তাওয়াফ ও স্ত্রীসহবাস ব্যতীত যাবতীয় কাজকর্ম করা জায়িয। তবে সিয়ামের কাযা পরে আদায় করে নিতে হবে। হায়িয ও নিফাসের নিয়ম একই। (সূরা বাকারা ঃ ২২২, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

নোট ঃ হায়িয ও নিফাসের সময় কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন করা যাবে (যদি শিক্ষার্থী/শিক্ষিকা হন)। আমাদের দেশে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে যে এই অবস্থায় অনেক কিছু করা যায় না, এগুলো ঠিক নয়। শুধু মাত্র উপরের হাদীসকে মানতে হবে।

নিফাসের সময়সীমা ঃ নিফাস হচ্ছে সন্তান প্রসবের পর যে রক্তস্রাব হয়। অনুরূপভাবে নিফাসেরও কোন নিম্ন সময়সীমা নেই। একদল স্কলার বলেন, চল্লিশ দিন পূর্ণ হলেই গোসল করে পবিত্র হয়ে যাবে এবং স্বাভাবিক নিয়মে সলাত-সিয়াম আদায় করবে। আর প্রবাহিত রক্ত ইস্তিহাযা বা অসুস্থতা গণ্য করবে।

আরেকদল স্কলার বলেন, যে অপেক্ষা করবে এবং ষাট দিন পূর্ণ করবে। কেননা ষাট দিন পর্যন্ত নিফাস হয়েছে, এমন অনেক নারীও পাওয়া গেছে। অতএব এই ভিত্তিতে ষাট দিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

পাক হওয়া সত্ত্বেও ৪০ দিন পর্যন্ত নিফাসের মেয়াদ পূরণ করা ঃ সন্তান প্রসবের পর যেদিন পাক হবে সেদিন থেকে সলাত-সিয়াম শুরু করতে হবে। ৪০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন দরকার নেই। আরো আগে পাক হওয়া সত্ত্বেও সলাত, সিয়াম পালন না করলে কবীরা গুনাহ হবে।

মহিলাদের জামা'আত ও ইমামতি

- মহিলাদের জামা'আতে মহিলারা নিম্নস্বরে ইকামাত দিবেন।
- মহিলা মহিলাদের ইমামতি করলে পুরুষদের মত সামনে না দাঁড়িয়ে কাতারের মাঝে দাঁড়াবেন।
- ফরয ও তারাবীর জামা'আতে তাদের ইমামতি করার স্পষ্ট দলিল রয়েছে। (আবু দাউদ, দারাকুৎনী, ইরওয়া, নায়ল)
- আয়িশা (রা.) ও উম্মে সালামা (রা.) প্রমুখ মহিলাদের জামা'আতে ইমামতি করতেন। (বায়হাকী)

মহিলাদের আরো কয়েকটি বিষয়

শিশু কোলে নিয়ে সলাত আদায় ঃ প্রয়োজনে শিশুকে কোলে নিয়ে সলাত আদায় করা যাবে। যখন সাজদায় যাবে তখন শিশুকে নামিয়ে রেখে সাজদায় যেতে হবে। অনেক সময় মা বা বাবা সাজদায় গেলে ছোট শিশুরা পিঠের উপর চড়ে বসে। এতে বিরক্ত হওয়া যাবে না। শিশুকে পিঠে নিয়েও সলাত আদায় হবে।

নেইল পলিশ ও লিপস্টিক ব্যবহার করে কি সলাত হবে? যেহেতু নেইল পলিশ ওযূর পানি নখে পৌঁছুতে দেয় না এবং লিপস্টিক গাঢ় হলে ঠোঁট ভিজে না এ কারণে নেইল পলিশ ও লিপস্টিক ব্যবহার করে ওযূ করা হলে ওযূ হবে না। ওযূ না হলে স্বাভাবিকভাবেই সলাত হবে না।

অনেক মহিলাদের ভুল ধারণা ঃ অনেক মহিলা আছে, যারা মসজিদে বা বাড়িতে পুরুষদের সলাত আদায় না হলে নিজেরা সলাত আদায় করেন

না। এটা ভুল। আযান হলে বা সলাতের সময় হলে বা আওয়াল ওয়াক্তে সলাত আদায় করা মহিলাদেরও কর্তব্য। (মুখালাফাতু ত্বাহারাতি অসস্বালাহ, আব্দুল আযীয সাদহান ঃ ১৮৮-১৮৯ পৃঃ)

মহিলাদের ঈদের সলাতে যাওয়া উচিত ঃ রসূল ﷺ মহিলাদেরকে ঈদের সলাতে নিয়ে যেতে বলেছেন। যদিও তারা ঐ সময়ে পিরিয়ড অবস্থায় থাকে তাও ঈদের মাঠে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। তবে অবশ্যই পর্দা রক্ষা করে যেতে হবে। সাজগোজ করে বেপর্দা হয়ে ঈদের মাঠে গিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করা যাবে না। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

সলাতে মহিলা-পুরুষে ভিন্নতা কোথায়?

পক্ষান্তরে দলিলের ভিত্তিতেই সলাতের কিছু ব্যাপারে মহিলারা পুরুষদের থেকে ভিন্নরূপ আমল করে থাকেন। যেমন ঃ

১. বেগানা পুরুষ আশেপাশে থাকলে (জেহরী সলাতে) মহিলা সশব্দে কুরআন পড়বে না। (আলমুমতে', শারহে ফিক্হ, ইবনে উষাইমীন ৩/৩০৪)

২. যেমন সে পূর্ণাঙ্গ পর্দার সাথে সলাত আদায় করবে। তাছাড়া একাকিনী হলেও তার লেবাসে বিভিন্ন পার্থক্য আছে।

৩. ইমামের ভুল ধরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে মহিলা পুরুষের মত 'সুবহা-নাল্লাহ' না বলে হাতের উপর হাত রেখে শব্দ করবে।

৪. মহিলা মাথার চুল বেঁধে সলাত আদায় করতে পারে, কিন্তু (লম্বা চুল হলে) পুরুষ তা পারে না।

৫. সলাতের মধ্যে মহিলাদের পায়ের গোড়ালী ঢেকে রাখতে হবে। কিন্তু পুরুষদের কাপড় থাকবে টাখনুর উপর পর্যন্ত। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা ওযূ, গোসল, তায়াম্মুম এবং সলাতের প্রতিটি স্টেপ বিস্তারিত সহীহ হাদীসের আলোকে দেখবো যা মহিলা ও পুরুষদের জন্য একই।

২য় অধ্যায়
ওযূ, তায়াম্মুম
ও গোসল

ওযূর নিয়মাবলী

১) প্রথমে মনে মনে অর্থাৎ অন্তরে সলাতের জন্য ওযূ করছি এই নিয়ত করতে হবে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) মুখে উচ্চারণ করে নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া .... ইত্যাদি বলে কোন নিয়ত নেই।

২) অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে ওযূ শুরু করতে হবে। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

৩) ডান হাতে পানি নিয়ে (আবূদাউদ) দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুতে হবে (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, নাসাঈ) এবং আঙ্গুলসমূহ খিলাল করতে হবে। (নাসাঈ, আবূদাউদ, তিরমিযী)

৪) ডান হাতে পানি নিয়ে ভালভাবে কুলি করতে হবে ও প্রয়োজনে নতুন পানি নিয়ে নাকে দিয়ে বাম হাতে ভালভাবে নাক ঝাড়তে হবে। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)
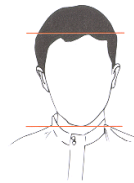
৫) তারপর কপালের গোড়া থেকে দুই কানের লতী হয়ে থুৎনীর নীচ পর্যন্ত পুরা মুখমণ্ডল ধুতে হবে (বুখারী, মুসলিম) ও দাড়ি খিলাল করতে হবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

৬) প্রথমে ডান ও পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধুতে হবে। (সহীহ বুখারী)

৭) পানি নিয়ে (তিরমিযী) দু'হাতের ভিজা আঙ্গুলগুলি মাথার সম্মুখ হতে পিছনে ও পিছন হতে সম্মুখে বুলিয়ে একবার পুরা মাথা মাসাহ করতে হবে। (বুখারী, মুসলিম) একই সাথে ভিজা শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কানের ভিতর অংশে ও বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা পিছন অংশে মাসাহ করতে হবে। (নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আবূদাউদ, তিরমিযী)
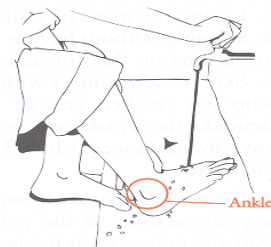
৮) ডান ও বাম পায়ের টাখনু পর্যন্ত ভালভাবে ধুতে হবে (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ও বাম হাতের আঙ্গুল দ্বারা (আবূদাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) পায়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করতে হবে।

ওযূ শেষে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করা

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহূ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রসূলুহু। আল্লা-হুম্মাজ্‌আলনী মিনাত তাউয়াবীনা ওয়াজ্'আলনী মিনাল মুতাত্বহ্‌হিরীন।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল (সহীহ মুসলিম)। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (তিরমিযী)

নোট ঃ ওযূর অঙ্গগুলির মধ্যে সামান্যতম জায়গা শুকনা থাকলে ওযূ হবে না (সহীহ বুখারী ১ম খন্ড হাদীস # ১৩৫ বাংলা)

ওযূ ভঙ্গের কারণসমূহ

১) পেশাব ও পায়খানার দ্বার হতে কিছু বের হলে ওযূ নষ্ট হয়ে যায়। তদনুরূপ দেহের অন্যান্য অঙ্গ থেকে অপবিত্র কিছু বের হলেও অযু নষ্ট হয়ে যাবে। (আলমুমতে', শারহে ফিক্‌হ, ইবনে উষাইমীন)

২) যাতে গোসল ওয়াজিব হয়, তাতেও ওযূ নষ্ট হয়।

৩) কোন প্রকার বেহুশ বা জ্ঞানশুন্য হলে ওযূ নষ্ট হয়।

৪) শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে ওযূ নষ্ট হয়। (বসে ঘুম বা তন্দ্রা এলে ওযূ নষ্ট হয় না।) (আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)

৫) পেশাব অথবা পায়খানার দ্বার (গুপ্তাঙ্গ) সরাসরি হাত দিয়ে স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হয়। (কাপড়ের উপর দিয়ে হাত দিলে ওযূ নষ্ট হয় না।) (সিলসিলাহ সহীহাহ)

৬) উটের গোস্ত খেলে ওযূ নষ্ট হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম)

ওযূ ভঙ্গের ভ্রান্ত ধারণা

১) হাটুর উপর কাপড় উঠলে ওযূ নষ্ট হয়।

২) মেয়েদের মাথার কাপড় পরে গেলে ওযূ নষ্ট হয় ।
৩) স্ত্রীকে চুমু দিলে ওযূ নষ্ট হয় ।
৪) পরনের কাপড় পরিবর্তন করলে ওযূ নষ্ট হয় ।
৫) ওযূতে ঘাড় মাসেহ না করলে ওযূ হয় না ।
৬) আকাশের দিকে তাকালে ওযূ নষ্ট হয় ।
৭) বাচ্চাকে দুধ পান করালে ওযূ নষ্ট হয় ।
৮) ছোট বাচ্চাকে সৌচ কাজ করিয়ে দিলে ওযূ নষ্ট হয় ।
৯) কুকুরের গায়ের সঙ্গে কাপড় লেগে গেলে ওযূ নষ্ট হয় ।
১০) সলাতের মধ্যে অট্টহাসি দিলে ওযূ নষ্ট হয় ।

ওযূর মাসায়েল (রুলিং)

- ওযূর অঙ্গগুলি এক, দুই বা তিনবার করে ধোয়া যাবে । রসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার করেই বেশী ধুতেন । (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

- ওযূ করার নিয়ম আল কুরআনে এসেছে, সেখানে ঘাড় মাসেহ করার কোন নিয়ম নেই । তাই অযুতে ঘাড় মাসেহ করা যাবে না । করলে এটা হবে বিদ'আত । ওযূ হবে না । (হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সলাতের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হও তখন (সলাতের পূর্বে) তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলোকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, আর মাথা মাসেহ কর এবং পাগুলোকে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল.. । [সূরা মায়িদা ঃ ৬])

- নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সন্দেহের কারণে ওযূ করতে হয় না ঃ 'আব্বাদ ইবনু তামীম (রহ.)-এর চাচা হতে বর্ণিত । একদা আল্লাহর রসূল ﷺ -এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হল যে, তার মনে হয়েছিল যেন সলাতের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছিল । তিনি বললেন ঃ সে যেন ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা দুর্গন্ধ পায় । (সহীহ বুখারী # ১৩৭ ও সহীহ মুসলিম)

- পাগড়ী ও মোজার উপর মাস্হ করা ঃ উমাইয়াহ (রা.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন ঃ 'আমি নাবী ﷺ -কে তাঁর পাগড়ীর উপর এবং উভয় মোজার উপর মাস্হ করতে দেখেছি ।' মা'মার (রহ.) 'আমর (রহ.)

হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন ঃ 'আমি নাবী ﷺ -কে তা করতে দেখেছি।' (সহীহ বুখারী # ২০৫)

- এই হাদীস থেকে আমরা জানলাম মোজা, পাগড়ী ও মহিলাদের মাথার হিযাবের উপর দিয়ে মাসেহ করা যাবে। মুসাফির হলে তিনদিন পর্যন্ত এবং গৃহবাসী হলে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত। মোজা চামড়ার হতে হবে এমন কোন কথা নেই, যে কোন ধরনের সুতির মোজার উপর দিয়েই মাসেহ করা যাবে। তবে পা যেন না দেখা যায়। (সহীহ মুসলিম)
- দুধ পান করলে কুলি করা উত্তম ঃ ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। একদা আল্লাহর রসূল ﷺ দুধ পান করলেন। অতঃপর কুলি করলেন এবং বললেন ঃ 'এতে রয়েছে তৈলাক্ত বস্তু' (কাজেই কুলি করা উত্তম)। (সহীহ বুখারী # ২১১ ও সহীহ মুসলিম)
- ব্যন্ডেজ থাকলে ঃ ওযূর অঙ্গে ব্যন্ডেজ থাকলে এবং তাতে পানি লাগলে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে তাহলে তার উপর ভিজা হাতে মাসেহ করা যায়। (বুলূগুল মারাম হাদীস # ১১৪ তায়াম্মুম অধ্যায়)

তায়াম্মুমের নিয়মাবলী

তায়াম্মুম অর্থ 'সংকল্প করা'। পানি না পাওয়া গেলে ওযূ বা গোসলের পরিবর্তে পাক মাটি (ধুলা-বালি) দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের ইসলামী পদ্ধতিকে 'তায়াম্মুম' বলে।

কিসে তায়াম্মুম হবে?

পবিত্র মাটি এবং তার শ্রেণীভুক্ত সকল বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা যাবে। (যেমন ঃ ধুলা, বালি, পাথর, কাঁকর, দেয়াল, সিমেন্ট। এছাড়া যেসব জায়গায় ধুলা থাকে যেমন গাড়ির ড্যাশবোর্ড ইত্যাদি)

তায়াম্মুম করার পদ্ধতি ঃ

মনে মনে নিয়ত থাকার পর বিসমিল্লাহ বলে দুই হাতের তালু সম্পূর্ণরূপে মাটির উপর বিছিয়ে রাখতে হবে। তারপর ফুঁ দিয়ে ধুলা ঝেড়ে উভয় হাত দ্বারা মুখমন্ডল মাসেহ করতে হবে। এরপর বাম হাত দ্বারা ডান হাতের

কব্জি পর্যন্ত এবং ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করা। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু আব্‌যা তার পিতা ('আবদুর রহমান) হতে বর্ণনা করেন যে, 'আম্মার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন ঃ নাবী ﷺ মাটিতে হাত মারলেন এবং তাঁর চেহারা ও হস্তদ্বয় মাস্‌হ করলেন। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৩৪৩)

কখন তায়াম্মুম করা যাবে?

১) যদি পাক পানি পাওয়া না যায় (এবং পানি সংগ্রহ করতে গেলে সলাত কাযা হওয়ার আশংকা থাকে)। (সূরা মায়িদাহ ঃ ৬)
২) পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে এবং জীবনের ঝুকি থাকলে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)
৩) উপরোক্ত কারণ সমূহের প্রেক্ষিতে ওযূ বা গোসলের পরিবর্তে প্রয়োজনে দীর্ঘদিন হলেও তায়াম্মুম করা যাবে। (আবু দাউদ)

নোট ঃ তায়াম্মুম করে সলাত আদায় করার পর উক্ত সলাতের সময়ের মধ্যে পানি পাওয়া গেলেও পুনরায় ঐ সলাত আদায় করতে হবে না। তবে করলে কোন দোষ নেই। (আবু দাউদ)

যদি মাটি পানি কিছুই পাওয়া না যায় তাহলে বিনা ওযূতেই সলাত আদায় করতে হবে। (সহীহ বুখারী ১ম খন্ড হাদীস # ৩৩৬)

তায়াম্মুম কিসে নষ্ট হয়?

যে যে কারণে ওযূ নষ্ট হয়, ঠিক সেই একই কারণে তায়াম্মুম নষ্ট হয়। কারণ তায়াম্মুম হলো ওযূর বিকল্প। এছাড়া যে অসুবিধার কারণে তায়াম্মুম করা হয়েছিল, সেই অসুবিধা দূর হয়ে গেলেই তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়। যেমন পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করলে পানি পাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম শেষ হয়ে যায়। আবার অসুখের কারণে তায়াম্মুম করলে, অসুখ দূর হয়ে যাওয়ার পর পরই আর তায়াম্মুম থাকে না। (ফিকহুস সুন্নাহ)

গোসলের নিয়মাবলী

গোসল আরবী শব্দ এর অর্থ ধৌত করা। শারঈ পরিভাষায় গোসল অর্থ ঃ পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে ওযূ করে সর্বাঙ্গ ধৌত। গোসল দু'প্রকার ঃ ফরয ও মুস্তাহাব।

ফরয ঃ ঐ গোসলকে বলা হয়, যা করা অপরিহার্য। বালেগ বয়সে নাপাক হলে গোসল ফরয হয়। যেমন- আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা নাপাক হয়ে থাক, তবে গোসল কর' (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

মুস্তাহাব ঃ ঐ গোসলকে বলা হয়, যা অপরিহার্য নয়। কিন্তু করলে নেকী আছে। যেমন- জুম'আর দিনে বা দুই ঈদের দিনে গোসল করা। সাধারণ গোসলের পূর্বে ওযূ করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। সাইয়িদ সাবিক্ব একে 'মানদূব' (পছন্দনীয়) বলেছেন।

গোসলের পদ্ধতি ঃ ফরয গোসলের জন্য অন্তরে নিয়ত থাকতে হবে। প্রথমে দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুবে ও পরে নাপাকী পরিষ্কার করবে। অতঃপর 'বিসমিল্লাহ' বলে সলাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করবে। অতঃপর প্রথমে মাথায় তিনবার পানি ঢেলে চুলের গোড়ায় খিলাল করে ভালভাবে পানি পৌঁছাবে। তারপর সারা দেহে পানি ঢালবে ও গোসল সম্পন্ন করবে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

ফরয গোসলের পূর্বে ওযূ করা ঃ মাইমূনাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ সলাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করলেন, পা দুটো ব্যতীত এবং তাঁর লজ্জাস্থান ও যে যে স্থানে নোংরা লেগেছে তা ধুয়ে নিলেন। অতঃপর নিজের উপর পানি ঢেলে দেন। অতঃপর সেখান হতে সরে গিয়ে পা দু'টো ধুয়ে নেন। (সহীহ বুখারী হাদীস # ২৪৯ ও সহীহ মুসলিম)

১) গোসলের সময় মেয়েদের মাথার খোপা খোলার দরকার নেই। কেবল চুলের গোড়ায় তিনবার তিন চুল্লু পানি পৌঁছাতে হবে। অতঃপর সারা দেহে পানি ঢালবে। (সহীহ মুসলিম)

২) রসূল ﷺ এক মুদ্দ (৬২৫ গ্রাম) পানি দিয়ে ওযূ এবং অনধিক পাঁচ মুদ্দ (৩১২৫ গ্রাম) বা প্রায় সোয়া তিন কেজি পানি দিয়ে

গোসল করতেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপচয় করা ঠিক নয়।

৩) নারী হোক পুরুষ হোক সকলকে রসূলুল্লাহ ﷺ পর্দার মধ্যে গোসল করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (আবুদাউদ, নাসাঈ)

৪) বাথরুমে বা পর্দার মধ্যে বা দূরে লোকচক্ষুর অন্তরালে নগ্নাবস্থায় গোসল করায় কোন দোষ নেই। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

৫) ওযূ সহ গোসল করার পর ওযূ ভঙ্গ না হলে পুনরায় ওযূর প্রয়োজন নেই। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

৬) ফরয গোসলের পূর্বে নাপাক অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। তবে মুখে কুরআন পাঠ এবং মাসজিদে প্রবেশ করা জায়িয আছে। (ফিকহুস সুন্নাহ) ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা, তিলাওয়াত করা ও তাফসীর পড়া জায়িয।

মুস্তাহাব (উত্তম) গোসলসমূহ

১. জুম'আর সলাতের পূর্বে গোসল করা। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)
২. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানকারীর জন্য গোসল করা। (ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, আবুদাউদ)
৩. ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা। (তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ)
৪. হাজ্জ বা উমরাহর জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা। (দারাকুৎনী, হাকেম)
৫. দুই ঈদের দিন সকালে গোসল করা। (বায়হাকী)

ফরয গোসল কী কী কারণে করতে হবে?

১) স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের পর ফরয গোসল করতে হবে।
২) স্বপ্নদোষ হলে ফরয গোসল করতে হবে।
৩) মহিলাদের Menstrual Period শেষ হলে ফরয গোসল করতে হবে।
৪) বাচ্চা প্রসবের পর নির্দিষ্ট দিন পার হলে ফরয গোসল করতে হবে।

সতর ও পোশাক সম্পর্কে ইসলামের চারটি মূলনীতি

১. পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্য থাকবে দেহকে আবৃত করা। যেন পোশাক পরা সত্ত্বেও লজ্জাস্থানসমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে।

২. ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হতে হবে। এজন্য ঢিলাঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করতে হবে। হাদীসে সাদা পোশাক পরিধানের নির্দেশ এসেছে।
৩. পোশাক যেন অমুসলিমদের সাদৃশ্য না হয়।
৪. পোশাকে যেন অহংকার প্রকাশ না পায়। এজন্য পুরুষ যেন সোনা ও রেশম পরিধান না করে।

নোট ঃ

- সলাতের মধ্যে মহিলাদের পায়ের গোড়ালী ঢেকে রাখতে হবে। কিন্তু পুরুষদের কাপড় থাকবে টাখনুর উপরে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)
- সলাতের পোশাক পবিত্র হওয়া আবশ্যক। যদি কারো পবিত্র পোশাক না থাকে তাহলে ঐ পোশাকেই সলাত আদায় করতে হবে। একেবারেই কারো পোশাক না থাকলে পোশাক বিহীন অবস্থায়ই সলাত আদায় করতে হবে। সলাতের কাযা পড়ার কোন নিয়ম নেই।
- অনেক সময় কুকুরের গায়ের সাথে আমাদের স্পর্শ লেগে যেতে পারে। যদি কুকুরের শরীর শুকনো থাকে তাহলে ঐ কাপড়ে আমরা সলাত আদায় করতে পারবো, কাপড় অপবিত্র হবে না। যদি কুকুরের মুখের লালা কাপড়ে লাগে তাহলে কাপড় পরিবর্তন করতে হবে বা ঐ অংশটুকু ধুয়ে নিতে হবে।
- টুপি/পাগড়ী ঃ টুপি পরে সলাত আদায় করতেই হবে এটা বাধ্যতামূলক নয়, কারণ টুপি বা পাগড়ী সলাতে পোশাকের অংশ নয়।

সলাতের স্থান কেমন হবে?

সলাত আদায় করতে হলে জায়নামায বিছিয়ে পড়তে হবে এমন কোন কথা নেই তবে সলাতের স্থান অবশ্যই পাক-পবিত্র হতে হবে। শারীয়া মতে যে কোন শুকনো জায়গায় সলাত আদায় করা যায়, যেমন ঃ মাঠে-পার্কে ঘাসের উপর, অফিস-আদালতে কার্পেটের উপর, খালি ফ্লোরের উপর, রাস্তার পাশে মাটিতে ইত্যাদি। এছাড়া জুতা পরেও সলাত আদায় করা যায়।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত রসূল ﷺ বলেন ঃ সমগ্র পৃথিবীই সাজদার স্থান, কেবল কবরস্থান ও বাথরুম ব্যতীত। (আবু দাউদ)

৩য় অধ্যায়
রসূল ﷺ-এর সলাত
আদায়ের পদ্ধতি

তাকবীর

Takbeer

اللّٰهُ أَكبَر

‘আল্লাহু আকবার’
(আল্লাহ মহান)

সলাতের জন্য ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো (ক্বিয়াম)
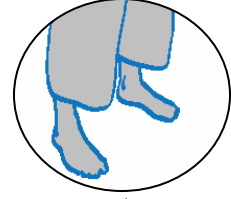
তাকবীরে তাহরীমা

রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের জন্যে দাঁড়িয়েই

اللهُ أَكبَر

'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ মহান) উচ্চারণ করতেন।

বিশেষ নোট ঃ তিনি এই তাকবীর উচ্চারণের পূর্বে অন্য কিছুই পড়তেন না বা বলতেন না, এমনকি নিয়তও উচ্চারণ করতেন না। (নিয়ত তো হলো মনস্থির করা বা ইচ্ছা করার নাম।) এ ধরণের কিছুও বলতেন না যে, ক্বিবলামুখী হয়ে অমুক ওয়াক্তের এত রাক'আত ফরয সলাত ইমাম হিসেবে বা এই ইমামের পেছনে মুক্তাদী হিসেবে পড়ছি। কিংবা আদায় করছি, বা কাযা পড়ছি। এ ধরনের কথা তিনি ফরয সলাতেও বলতেন না, সুন্নাত এবং নফল সলাতেও বলতেন না।

রফ’উল ইয়াদাঈন [প্রথমবার]

রফ‘উ অর্থ = উপরে উঠানো ।
ইয়াদুন অর্থ = এক হাত ।
ইয়াদানি অর্থ = দুই হাত ।
রফ’উল ইয়াদাঈন অর্থ =
দুই হাত উপরে উঠানো ।

নাবী ﷺ কোন সময় তাকবীর বলার সাথে হাত উত্তোলন করতেন। আবার কখনো বা তাকবীরের পরে (বুখারী, নাসাঈ) আবার কখনো বা তাকবীরের পূর্বে (বুখারী ও আবু দাউদ) হাত উত্তোলন করতেন। তিনি অঙ্গুলিসমূহ প্রসারিত অবস্থায় দু’হাত উত্তোলন করতেন। তবে আঙ্গুলসমূহের মাঝে ফাঁক করতেন না এবং একেবারে মিলাতেনও না। (আবু দাউদ, ইবনু খুযাইমাহ) হাত দু’টিকে কাঁধ বরাবর উঠাতেন। (বুখারী ও নাসাঈ) আবার কখনো বা কানের লতি বরাবর উঠাতেন। (বুখারী ও আবু দাউদ)
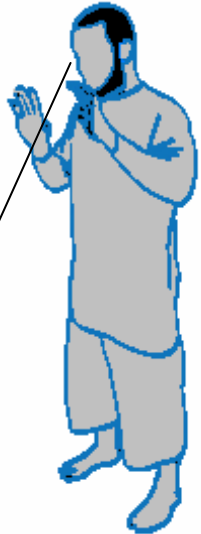
রসূল ﷺ তাকবীরে তাহরীমার পর কী পড়তেন?

তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণের সময় হাত উঠাবার পর হাত নামিয়ে ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর রাখতেন এবং বুকের উপর রাখতেন। (সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ)। মহিলারাও পুরুষদের মতোই বুকের উপর হাত রাখবেন।
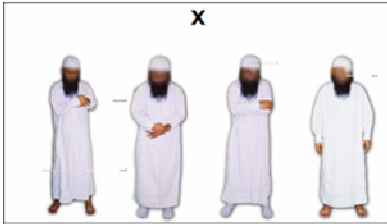
নাবী ﷺ বাম হাতের পিঠ, কব্জি বা বাহুর উপর ডান হাত রাখতেন। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

তিনি কখনো ডান হাত দ্বারা বাম হাত আঁকড়ে ধরতেন। (নাসাঈ, দারাকুত্বনী)

তিনি হাত দু'টিকে বুকের উপর রাখতেন। (আবু দাউদ, ইবনু খুযাইমাহ)।

তারপর সূরা ফাতিহা শুরু করার পূর্বে নিম্নের বিভিন্ন রকম দু'আ করতেন। নাবী ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় তাঁর সাজদার স্থানে দৃষ্টি রাখতেন। [বায়হাকী]

বিশেষ নোট ঃ নাভীর উপর বা নীচে হাত বাঁধার কোন সহীহ্ হাদীস নেই। তাই নাভীর উপর হাত না বেঁধে বুকের উপর বাঁধতে হবে। দলিলের অধ্যায়ে বিস্তারিত দেয়া হয়েছে।

সাজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা ও একাগ্রতা

নাবী ﷺ সলাত অবস্থায় মাথা নীচু করে যমীনের দিকে দৃষ্টি রাখতেন। তিনি যখন কাবা ঘরে প্রবেশ করেন তখন থেকে রেরিয়ে আসা পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি সাজদার স্থানচ্যুত হয়নি। (বাইহাক্বী, হাকিম)

তিনি বলেন, ঘরে এমন কোন বস্তু থাকা উচিত নয় যা মুসাল্লীকে (সলাতে) অন্যমনস্ক করতে পারে। (আবু দাউদ, আহমাদ)

তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠাতে নিষেধ করতেন। (বুখারী, আবু দাউদ) এমনকি এ বিষয়ে জোর দিয়ে বলেছেন- যারা সলাতাবস্থায় আকাশের দিকে তাকায় তারা যেন এথেকে বিরত হয় অন্যথায় তাদের চক্ষু ফিরে পাবে না। অপর বর্ণনানুযায়ী তাদের চক্ষু কেড়ে নেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

তোমরা যখন সলাত আদায় করবে তখন এদিক সেদিক তাকাবে না, কেননা বান্দাহ যতক্ষণ পর্যন্ত এদিক সেদিক না তাকায় ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর চেহারাকে বান্দার চেহারার প্রতি নিবদ্ধ রাখেন। (তিরমিযী, হাকিম) তিনি এদিক সেদিক তাকানো সম্পর্কে বলেন ঃ এ হচ্ছে বান্দাহর সলাতে শয়তানের ছিনতাই। (বুখারী ও আবু দাউদ)

আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাহর সলাতাবস্থায় তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ সে এদিক-ওদিক না তাকায়। তাই যখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন আল্লাহও তার থেকে বিমুখ হয়ে যান। (আবু দাউদ)

সানা ঃ নিম্নের যে কোন সানা পড়ে সলাত শুরু করতেন ।

"اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ".

(ক) *আল্লা-হুম্মা বা-'ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খত্ব-ইয়া-ইয়া কামা-বা'আদতা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিব, আল্লা-হুম্মা নাক্বক্বিনী-মিন খত্ব-ইয়া-ইয়া, কামা ইয়ুনাক্বক্বাছ ছাউবুল আবইয়াদু মিনাদ দানাস। আল্লা-হুম্মাগসিলনী মিন খত্ব-ইয়া-ইয়া, বিছছালজি ওয়াল মা-ই ওয়াল বারদ।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার গুনাহ খাতাসমূহের মধ্যে এমন ব্যবধান সৃষ্টি করো যেরূপ ব্যবধান সৃষ্টি করেছো পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে । হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পাপ মুক্ত করে এমন পরিষ্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ধৌত করলে পরিষ্কার হয় । হে আল্লাহ তুমি আমার পাপসমূহ শিশির, পানি ও বরফ দ্বারা ধৌত করে দাও । (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

অথবা

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّموَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

(খ) *ওয়াজ্-জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারস্সামা ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব হানিফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশ্‌রিকীন। ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়ামাহ ইয়াইয়া ওয়ামামা-তী লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন। লা-শারীকা লাহু ওয়াবিযা-লিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন।*

অর্থ ঃ আমি একনিষ্ঠভাবে মহাবিশ্ব ও এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার দিকে আমার মুখ ফিরালাম। তাঁর সাথে যারা শিরক করে, আমি তাদের অন্তর্ভূক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার সলাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু মহান আল্লাহর জন্যে যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের প্রভু, প্রতিপালক। কেউ তাঁর অংশীদার নেই, আর এ জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। [সহীহ মুসলিম]

বিশেষ নোট ঃ উপরের সানাটি আমাদের দেশে জায়নামাযের দু'আ বলে পরিচিত। ইসলামে জায়নামাযের দু'আ বলতে কিছু নেই। জায়নামাযে দাঁড়িয়ে দু'আ পড়া বিদ'আত।

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ"

(গ) *সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা-রকাস্মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গইরুক।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, যাবতীয় প্রশংসা তোমারই জন্য। তোমার নাম মহিমান্বিত, তোমার সত্তা সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠিত এবং তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই। [আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, নাসাঈ]

সূরা ফাতিহা পাঠ করার পূর্বে

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

مِنْ هَمْزِهِ، وَ نَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ

উপরে বর্ণিত সানা/দু'আ পড়ার পর রসূলুল্লাহ ﷺ 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতনির রজীম মিন হামযিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফসিহি' পড়তেন। (আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, দারাকুত্বনী)।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তানের পাগলামী, অহঙ্কারী ও কু-কাব্যের প্ররোচনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, দারাকুত্বনী)।

অতঃপর নীরবে বিসমিল্লাহ... **(বাসমালা)** পড়তেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ)

সূরা ফাতিহা পাঠ

সূরা ফাতিহা তিনি কখনো শব্দ করে পড়তেন, আবার কখনো নিঃশব্দে পড়তেন। প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন সলাত পড়ল যাতে সূরা ফাতিহা পড়ে নাই, সে সলাত ত্রুটিপূর্ণ তথা অসম্পূর্ণ। ঐ সলাত যথেষ্ট নয় যাতে মুসল্লী ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে নাই। যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার সলাত হবে না। [সহীহ বুখারী]

উবাদাহ বিন ছামিত (রা.) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তির সলাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করে না। [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম]

জ্ঞাতব্য ঃ প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার আগে আউযুবিল্লাহ... (ইস্তিআযাহ) এবং বিসমিল্লাহ.. (বাসমালা) পাঠ করতেন।

বিশেষ নোট ঃ যোহর এবং আসর সলাতে সূরা ফাতিহা তো পড়তে হবেই এছাড়া ফজর, মাগরিব ও 'ইশার সলাতে জামা'আতে ইমাম সাহেব উচ্চস্বরে সূরা ফাতিহা পড়ার পরও মুক্তাদীদের অবশ্যই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

১. পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।
২. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।
৩. যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

৪. যিনি বিচার দিনের মালিক।
৫. আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।
৬. হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত কর তাদের পথে যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ।
৭. পক্ষান্তরে যাদের প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট এবং যারা বিপথগামী, তাদের পথে আমাদের পরিচালিত করো না।

الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ
مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ
اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَاِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ
اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ
صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ
غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ

শব্দ করে আমীন উচ্চারণ

সূরা ফাতিহা শব্দ করে পড়লে ‘আমীন’-ও সশব্দে উচ্চারণ করতেন এবং তাঁর সাথে মুক্তাদীরাও সশব্দে ‘আমীন’ উচ্চারণ করতেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন ইমাম ‘আমীন’ বলে কিংবা ‘ওয়ালাদ দল্লীন’ পাঠ শেষ করে, তখন তোমরা সকলে ‘আমীন’ বল। কেননা যার ‘আমীন’ আসমানে ফিরিশতাদের ‘আমীন’-এর সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করা হবে। [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম]

ক্ষণিক চুপ থাকা

রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতে কিছুক্ষণের জন্যে দু’বার চুপ থাকতেন। একবার চুপ থাকতেন তাকবীরে তাহরীমার পর (নাসাঈ, বুখারী, মুসলিম), এবং দ্বিতীয়বার গইরিল মাগ্‌দুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দললীন পড়ার পর।

ক্বিরাত (সলাতে কুরআন পাঠ) পদ্ধতি

রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সলাতে কুরআন পাঠ ছিল টানা টানা। প্রতিটি আয়াত পাঠ করে থামতেন। (দারাকুৎনী, তিরমিযী) আয়াত শেষ করার সময় একটু টানা আওয়াযে শেষ করতেন। সূরা ফাতিহা শেষ করে তিনি অন্য যে কোন একটি সূরা তিলাওয়াত করতেন। যেমন সূরা ইখলাস ঃ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ () ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ () لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ () وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ()

অর্থ ঃ পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।
বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।

- **জামা'আতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এবং পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে।**
- **বুকে হাত বাঁধতে হবে। (মহিলারাও বুকের উপর এভাবে হাত বাঁধবেন)**
- **দৃষ্টি সাজদার স্থানে থাকবে।**

Bowing

اللهُ أكبَر

‘আল্লাহু আকবার’
(আল্লাহ মহান)

রুকূ করার পদ্ধতি [দ্বিতীয় ‘রফ’উল ইয়াদাঈন’]

রসূলুল্লাহ ﷺ ক্বিরাত শেষ করে নিঃশ্বাস নিয়ে প্রশান্তি অর্জনের জন্যে খানিকটা সময় নীরব থাকতেন। তারপর তাকবীরে তাহরীমার সময়কার মত ‘রফ’উল ইয়াদাঈন’ করতেন এবং ‘আল্লাহু আকবার’ বলে রুকুতে চলে যেতেন। (সহীহ বুখারী)

রুকুতে গিয়ে জড়িয়ে ধরার মত দু’হাত হাঁটুতে রাখতেন। দু’বাহু পাঁজর থেকে আলগা করে ফাঁকা করে রাখতেন। পিঠ সোজাসুজি লম্বা করে বিছিয়ে রাখতেন। মাথা পিঠের বরাবর রাখতেন, উঁচু বা নিচু করে রাখতেন না। (বায়হাকী)

তিনি রুকুতে গিয়ে এই ভাষায় তাসবীহ উচ্চারণ করতেন

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ

সুবহা-না রব্বিয়াল ’আযীম

অর্থ ঃ আমার মহান প্রভু সকল ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত, পবিত্র, মহীয়ান। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)
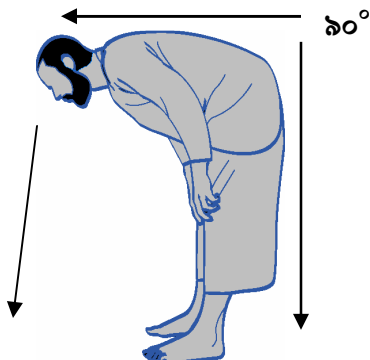
রুকুতে পিঠ সোজা থাকতে হবে। রুকু অবস্থায় দৃষ্টি থাকবে সাজদার স্থানে, পায়ের দিকে নয়।
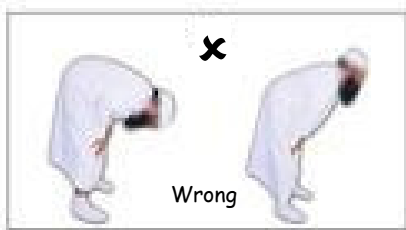
রুকুতে রসূল ﷺ নিম্নের দু'আগুলো পড়তেন।

سُبُّوحٌ، قُدُوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

সুব্বুহুন্ কুদ্দুছুন রব্বুল মাল-ইকাতি ওয়াররুহ।

অর্থ ঃ সকল ফিরিশতা ও জিবরাঈল (আ.) এর প্রভু অতি বরকতময় পবিত্র। (সহীহ মুসলিম)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

সুবহা-নাকাল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়াবিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরলী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু! তোমার পূত পবিত্রতা ঘোষণা করি তোমার প্রশংসাসহ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও।

তিনি কুরআনের উপর আমল করতঃ রুকু ও সাজদাতে এ দু'আটি বেশী বেশী করে পড়তেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي، وَمَا اسْتَقَلَّ بِهِ قَدَمِي

আল্লা-হুম্মা লাকা রকা'তু, ওয়া বিকা আ-মানতু, ওয়া লাকা আসলামতু খসায়া লাকা সাম'ঈ, ওয়া বাসারী, ওয়া মুখখী, ওয়া'আযমী, ওয়া'আসাবী, ওয়ামাসতাক্বল্লা বিহি ক্বদামী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকু (মাথা অবনত) করেছি, একমাত্র তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, একমাত্র তোমারই কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, আমার কান, আমার চোখ, আমার মস্তিষ্ক, আমার হাড়, আমার স্নায়ু, আমার সমগ্র সত্ত্বা তোমার ভয়ে শ্রদ্ধায় বিনয়াবনত। (সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ

সুবহানা যিল জাবারূতি, ওয়াল মালাকূ-তি ওয়াল কিবরিয়া-ই ওয়াল 'আযামাতি।

অর্থ ঃ পূত পবিত্র সেই মহান আল্লাহ, যিনি বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গৌরব, গরিমা এবং অতুল্য মহত্বের অধিকারী। (আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমাদ)

রুকূ থেকে দাঁড়ানো

অতঃপর তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। রুকূ থেকে মাথা উঠাবার সময় তিনি ঃ
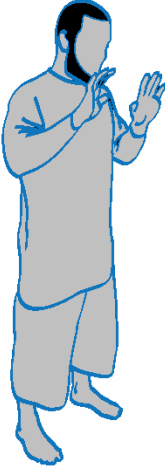
১)
রফ'উল ইয়াদাঈন করতেন [তৃতীয় বার] এবং রুকু হতে উঠে তাকবীর বলে দু'হাত কানের লতি অথবা কাঁধ পর্যন্ত উঠানো এবং চোখের দৃষ্টি সাজদার স্থানে থাকবে।

রুকু হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে যতক্ষণ না শরীরের বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগ স্বস্ব স্থানে ফিরে আসে।

২)
রুকু থেকে উঠার সময় নিম্নোক্ত তাসবীহ পাঠ করতেন ঃ

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

সামি আল্লা-হু লিমান হামিদাহ।

অর্থ ঃ আল্লাহ শুনেছেন তাঁর বান্দা কার প্রশংসা করেছে। (সহীহ বুখারী)

এ সময় এবং উপরে বর্ণিত দু'বারসহ তিনি মোট তিন সময় রফ'উল ইয়াদাঈন করতেন। সে সম্পর্কে প্রায় ৩০ জন সাহাবা একথা বর্ণনা করেছেন। এর বিপরীত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মৃত্যু পর্যন্ত সারাজীবন তিনি এ নিয়মেই সলাত আদায় করেছেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তির সলাত যথার্থ হবে না, যতক্ষণ না সে রুকু ও সাজদাতে তার পিঠ সোজা রাখে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

The *rukoo'* (The bowing)
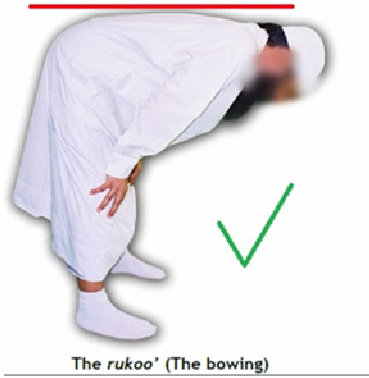
শুদ্ধ
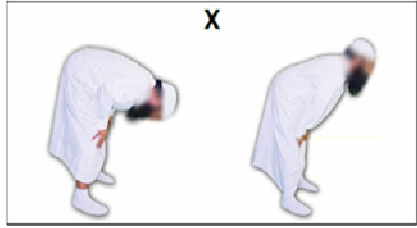
অশুদ্ধ

সলাতে চোখ কোথায় থাকবে? অনেকে চোখ বন্ধ করে সলাত আদায় করেন, এটা সুন্নাহর পরিপন্থী। তাই চোখ বন্ধ করে সলাত আদায় করা যাবে না। দাঁড়ানো এবং রুকু অবস্থায় দৃষ্টি থাকবে সাজদার স্থানে (বাইহাকী ও হাকিম সহীহ) এবং বসা অবস্থায় দৃষ্টি থাকবে মধ্যমা আংগুলের দিকে। (সহীহ মুসলিম, আবু উওয়ানা ও ইবনু খাযাইমা)

রসূল ﷺ রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে কী বলতেন?

তিনি যখন রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, তখন বলতেন ঃ

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

রব্বানা লাকাল হাম্‌দ; কখনো বলতেন ঃ *রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ*, আবার কখনো বলতেন ঃ *আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দ*।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। (সহীহ বুখারী)

এই তিনটি বাক্যই সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নাবী ﷺ রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে কখনো কখনো এই দু'আটিও পড়তেন ঃ

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ،

حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى

রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ
হামদান কাসীরন ত্বয়্যিবান মুবা-রকান ফীহ, মুবা-রকান 'আলাইহি কামা ইয়ূহ্বিবু রব্বুনা ওয়া ইয়ারদ্ব।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব [প্রতিপালক]! তোমার জন্য সব প্রশংসা। অত্যধিক পবিত্র প্রশংসা যার মধ্যে ও উপরে বরকত [কল্যাণ] নিহিত। [ঠিক ঐভাবে যেভাবে আমাদের প্রতিপালক ভালবাসেন ও সন্তুষ্ট হন।] (সহীহ বুখারী, আবু দাউদ)

রুকুর আগে ও পর রফ'উল ইয়াদাঈন করতেন।
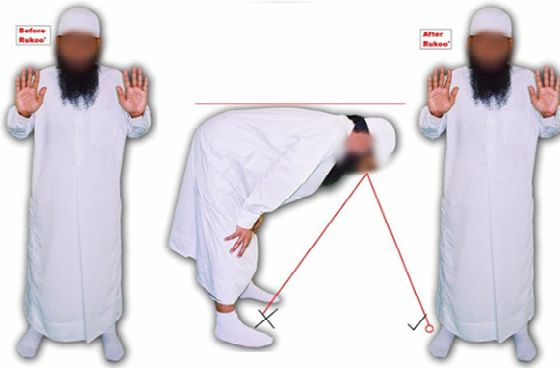
এ দু'আটি নাবী ﷺ -এর পিছনে সলাত আদায়কারী এক ব্যক্তি ঐ সময় বলেছিল যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠান এবং সামি... বলেন। সলাত শেষে রসূল ﷺ বললেন ঃ এক্ষণি (সলাতে) কে কথা বলেছ? লোকটি বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল আমি বলেছি! রসূল ﷺ বললেন ঃ আমি তেত্রিশের উর্ধ্বে ফিরিশতাকে এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করতে দেখলাম যে, তাদের কে কার পূর্বে তা লিপিবদ্ধ করবে। (বুখারী, আবু দাউদ)

সাজদাহ

Prostration

اللهُ أَكبَر

'আল্লাহু আকবার'
(আল্লাহ মহান)

সাজদায় যাওয়ার পদ্ধতি

এভাবে প্রশান্তির সাথে (রুকূর পরবর্তী) কিয়াম শেষ করে রসূলুল্লাহ ﷺ *"আল্লাহু আকবার"* বলে সাজদায় লুটিয়ে পড়তেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)। এ সময় তিনি রফ'উল ইয়াদাঈন করতেন না।
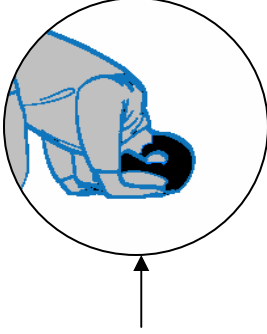
জমিনের উপর হাত দুটো কানের নীচে রাখতে হবে, কনুইকে জমিনের উপর রাখা যাবে না।
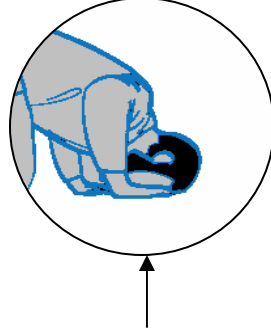
কপালের সাথে নাকও জমিনকে স্পর্শ করবে।

সাজদায় যাওয়ার সময় হাত আগে না হাঁটু আগে?

নাবী ﷺ মাটিতে হাঁটু রাখার আগে হাত রাখতেন। (ইবনু খুযাইমাহ)। কেননা এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সাজদায় যাবে তখন উটের মত করে বসবে না, বরং (জমিনে) হাঁটু স্থাপনের আগে দুই হাত রাখবে। (আবূ দাউদ)
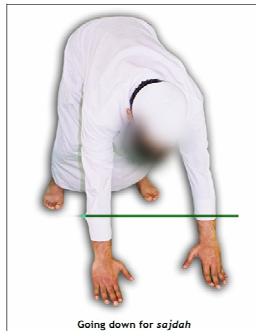
Going down for *sajdah*

রসূল ﷺ কিভাবে সাজদাহ করতেন?

রসূলুল্লাহ ﷺ বেশির ভাগ সময়ই যমীনের উপর সাজদাহ করতেন। তিনি কপাল ও নাক যমীনে স্থাপন করে সাজদাহ করতেন। তিনি খালি কপালে সাজদাহ করতেন, পাগড়িতে ঢাকা কপালে নয়। তিনি যখন সাজদাহ করতেন তখন কপাল ও নাক যমীনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেন। দুই বাহু দূরে সরিয়ে রেখে বগল ফাঁকা করে রাখতেন। বগল এতটা ফাঁকা করতেন যে, বগলের শুভ্রতা দেখা যেতো। ইচ্ছে করলে দুই বাহুর এই ফাঁক দিয়ে ছোট ছাগল ছানা দৌঁড়ে যেতে পারতো। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

তিনি সাজদায় দুই হাতের তালু কখনো ঘাড় আবার কখনো কান বরাবর রাখতেন। তিনি [সাহাবী] বারা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছিলেন ঃ তুমি যখন সাজদাহ করবে হাতের তালু দু'টি যমীনে স্থাপন করবে এবং দুই কনুই উপরে উঠিয়ে রাখবে। (সহীহ মুসলিম)

তোমরা সাজদাহ অবস্থায় বাহুদ্বয় কুকুরের মত বিছিয়ে রাখবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

নাবী ﷺ বলেছেন ঐ ব্যক্তির সলাত বিশুদ্ধ হয় না যে কপালের মত করে নাক মাটিতে ঠেকায় না।

নাবী ﷺ এই সাতটি অংগের উপর সাজদাহ করতেন। দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু, দুই পা, কপাল ও নাক [কপাল ও নাককে একটি অংগ ধরা হয়েছে] (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

সাজদায় সাতটি অঙ্গ জমিনকে স্পর্শ করবে।

১) কপাল ও নাক
২, ৩) দু'হাত
৪, ৫) দু'হাটু
৬, ৭) উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি, ক্বিবলামুখী রাখতে হবে।
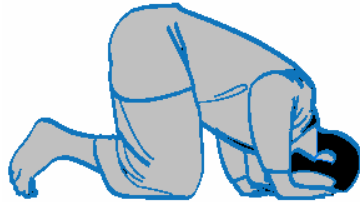
তিনি সাজদায় গিয়ে পিঠ সোজা রাখতেন। দুই পায়ের আংগুলের মাথাগুলো (বাঁকিয়ে) ক্বিবলামুখী করে রাখতেন। হাতের তালু ও আঙ্গুল বিছিয়ে রাখতেন, তবে একেবারে মিলিয়ে রাখতেন না, আবার বেশি ফাঁকাও রাখতেন না। যখন রুকূ করতেন, তখন হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা রাখতেন, আর যখন সাজদাহ করতেন, তখন মিলিয়ে রাখতেন। এভাবে তিনি হাঁটু, হাতের তালু, পায়ের পাতার সম্মুখভাগ এবং কপাল ও নাক প্রশান্তির সাথে যমীনে স্থাপন করে পিঠ সোজা করে সাজদায় অবস্থান করতেন।

যে ব্যক্তি রুকু ও সাজদায় স্বীয় মেরুদন্ড সোজা করে না, তিনি (রসূলুল্লাহ) সেই সলাতকে বাতিল বলে ফায়সালা দিতেন কারণ সেই ব্যক্তি হচ্ছে একজন সলাত চোর। (আহমাদ)

এই ভাবে সাজদা করার পদ্ধতি ভুল। নিম্নের চিত্রগুলোই সাজদার সঠিক পদ্ধতি।
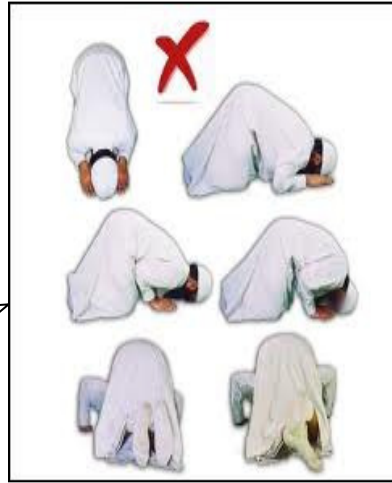
ক্বিয়াম (দাঁড়ানো), রুকু, সাজদা, জলসায় মহিলা-পুরুষের জন্য একই নিয়ম।

মহিলাদের সলাতের সময় তাদের পা ঢেকে রাখতে হবে।
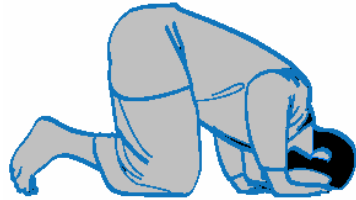
মহিলা-পুরুষ-এর সাজদার নিয়ম একই

মহিলা-পুরুষের জন্য সাজদার নিয়ম একই। আমাদের দেশে মহিলারা যে নিয়মে সাজদাহ করেন তা রসূল ﷺ এর দেখানো নিয়ম নয়।

অনেক মহিলা সাজদায় গিয়ে মাটিতে নিতম্ব রাখেন। এই মর্মে 'মারাসীলে আবূ দাউদে' বর্ণিত হাদীসটি নিতান্তই 'যঈফ'। এর ফলে সাজদার সুন্নাতী তরীকা বিনষ্ট হয়। সাজদাহ হল সলাতের অন্যতম প্রধান 'রুকন'। সাজদাহ নষ্ট হলে সলাত বিনষ্ট হবে। সাজদাহ হল দু'আ কবুলের সর্বোত্তম সময়।

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'বান্দা স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটে পৌঁছে যায়, যখন সে সাজদায় রত হয়। অতএব তোমরা ঐ সময় বেশী বেশী প্রার্থনা কর'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তোমরা প্রার্থনায় সাধ্যমত চেষ্টা কর। আশা করা যায়, তোমাদের দু'আ কবুল করা হবে'। (সহীহ মুসলিম)

রসূল ﷺ সাজদায় কী বলতেন?

রসূলুল্লাহ ﷺ সাজদায় গিয়ে বিভিন্ন তাসবীহ উচ্চারণ করতেন এবং দু'আও করতেন। সহীহ সূত্রে জানা যায়, তিনি বিভিন্নরূপ তাসবীহ ও দু'আ করতেন।

তাসবীহ ঃ তিনবার অথবা কখনো অধিকবারও পড়তেন।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

১) *সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা।* অর্থ ঃ আমার মহান প্রভু পবিত্র, ত্রুটিমুক্ত। (আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

অথবা/এবং

২) *সুবহা-নাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়াবিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরলি।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু! তোমার প্রশংসাসহ তুমি পবিত্র, ত্রুটিমুক্ত। হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

৩) আল্লা-হুম্মা লাকা সাজাদতু ওয়া বিকা আ-মানতু ওয়া লাকা আসলামতু সাজাদা ওয়াজ হিয়া লিল্লাযী খলাক্বহু ওয়াসউওয়ারহু, ওয়া শাক্বক্ব মাস'আহু ওয়া বাসারহু, তাবা-রকাল্লা-হু আহসানুল খ-লিক্বীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য সাজদাহ করেছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছি, আমার মুখমন্ডল (আমার সমগ্র দেহ) সাজদায় অবনমিত সেই মহান সত্ত্বার জন্য যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সমন্বিত আকৃতি দিয়েছেন এবং এর কর্ণ ও এর চক্ষু উদ্ভিন্ন করেছেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ সর্বোত্তম স্রষ্টা। (সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

৪) আল্লা-হুম্মাগফিরলী যামবী কুল্লাহু, দিক্বক্বাহু ওয়া জিল্লাহু, ওয়া আউওয়ালাহু ওয়া 'আ-খিরহু ওয়া 'আলা-নিয়্যাতাহু ওয়া সিররহ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ মার্জনা করে দাও, ছোট গুনাহ, বড় গুনাহ, আগের গুনাহ, পরের গুনাহ, প্রকাশ্য এবং গোপন গুনাহসমূহ। (সহীহ মুসলিম)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

৫) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিরিদ্বকা মিন সাখত্বিকা, ওয়া বি মু'আ-ফা-তিকা মিন 'উক্বাবাতিকা ওয়া আউ'যুবিকা মিন্‌কা, লা উহসি ছানা-'আন-আলাইকা আন্‌তা কামা আছনাইতা 'আলা নাফসিক।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে, আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তোমার গযব হতে, তোমার প্রশংসা গুণে শেষ করা যায় না; তুমি সেই প্রশংসার যোগ্য, যেরূপ নিজের প্রশংসা তুমি নিজে করেছ। (সহীহ মুসলিম)

নোট ঃ রুকু ও সাজদায় কুরআন পড়া নিষেধ।
(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

রসূল ﷺ সাজদা থেকে উঠার সময় মাটির উপরে (দু'হাতে) ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। (সহীহ বুখারী)

তিনি সলাতের ভিতর (বসা থেকে) দাঁড়ানোর সময় আটা মন্থনের মতো করে দু'হাতের উপর ভর দিতেন। (সহীহ সনদে বাইহাকী)
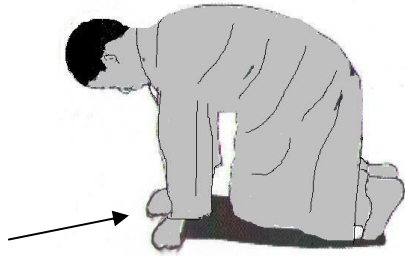
সাজদাহ থেকে উঠে বসা

তিনি *'আল্লাহু আকবার'* বলে সাজদাহ থেকে মাথা উঠাতেন। এসময়ে তিনি রফ'উল ইয়াদাঈন করতেন না। সাজদাহ থেকে উঠার সময় তিনি হাতের আগে মাথা উঠাতেন।

তারপর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর প্রশান্তির সাথে বসতেন। ডান পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে রাখতেন। এছাড়া রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আর কোন প্রকার পদ্ধতির কথা জানা যায় না।

দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে যে দু'আ পড়তেন

রসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে সাজদাহ থেকে মাথা উঠিয়ে প্রশান্তির সাথে বসতেন এবং এই দু'আ পড়তেন ঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَاجْبُرْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي، وَارْفَعْنِي

আল্লা-হুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়াজ্‌বুরনী, ওয়'আফিনী, ওয়ারযুকনী, ওয়ারফানী ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি রহম কর, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত কর, আমার যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দাও, আমাকে নিরাপত্তা দান কর, এবং আমাকে রিযিক দান কর ও আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও । (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আবূ দাউদ)
আবার কখনো এই দু'আও পড়তেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي

রব্বিগফিরলি রব্বিগফিরলি ।

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর । হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর । (ইবনু মাজাহ, নাসাঈ)

রসূলুল্লাহ ﷺ দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠক সাজদার সমান লম্বা করতেন । এটাই সুন্নাহ । সাহাবীদের যুগের পরে অধিকাংশ লোকই এ সুন্নাত ত্যাগ করেছে । বারাআ (রা.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, সলাতে দাঁড়ানো ও বসা অবস্থা ছাড়া নাবী ﷺ এর রুকু, সাজদাহ এবং দু'সাজদার মধ্যবর্তী সময়

এবং রুকু হতে উঠে দাঁড়ানো, এগুলো প্রায় সমপরিমাণ ছিল। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, আহমাদ)

Sitting between two *sajdahs* and *jalsa al-istira'hah*

দ্বিতীয় সাজদাহ থেকে উঠে দাঁড়ানো

দু'আ করার পর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে দ্বিতীয় সাজদায় যেতেন। দ্বিতীয় সাজদায়ও প্রথম সাজদার অনুরূপ করতেন। দ্বিতীয় সাজদাহ শেষ করে 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠে দাঁড়াতেন।

নাবী ﷺ উঠবার সময় দু'হাতে মাটির উপর ভর দিতেন, এবং দ্বিতীয় রাক'আতের জন্যে উঠতেন। (সহীহ বুখারী) তিনি সলাতের ভিতর (বসা থেকে) দাঁড়ানোর সময় আটা মন্থনের মত করে দু' হাতের উপর ভর দিতেন। (বাইহাকী)
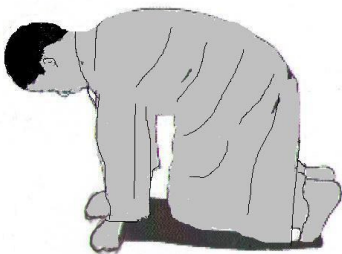
দ্বিতীয় সাজদার পর সাজদা থেকে সরাসরি দাঁড়িয়ে যেতেন না। একটু বসে তারপর দাড়াতেন।

সলাতে রুকু ও সাজদাগুলো পূর্ণ না করা সলাতে চুরি করার শামিল, এরকম করলে সলাত সম্পূর্ণ হয় না। [ইবনু আবী শাইবাহ]

রসূল ﷺ দ্বিতীয় রাক'আত কিভাবে পড়তেন?

তিনি প্রথম রাক'আতের সাজদাহ থেকে উঠে দাঁড়িয়েই বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা পাঠ করা শুরু করতেন। তারপর অন্য একটি সূরা তিলাওয়াত করতেন। যেমন ঃ

সূরা আল কাউসার

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

অর্থ ঃ পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।

إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ

১. নিশ্চয় আমি তোমাকে আল-কাউসার দান করেছি।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ

২. অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই সলাত পড় এবং কুরবানী কর।

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ

৩. নিশ্চয় তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীই নির্বংশ।

তিনি দ্বিতীয় রাক'আত প্রথম রাক'আতের মতোই পড়তেন তবে দ্বিতীয় রাক'আত প্রথম রাক'আতের চেয়ে কম দীর্ঘ হতো।

দ্বিতীয় রাক'আতে প্রথম রাক'আতের ন্যায় কার্যক্রম পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

১. তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলা
২. রুকুতে যাওয়া
৩. রুক থেকে উঠার সময় ক্বওমা (রফ'উল ইয়াদাঈন) করা
৪. সাজদায় যাওয়া (১ম বার)
৫. বৈঠক (দুই সাজদার মাঝে বসা)
৬. সাজদায় যাওয়া (২য় বার)
৭. জলসা বা বৈঠক

শেষ বৈঠকে নিতম্বের উপর আরাম করে বসা।
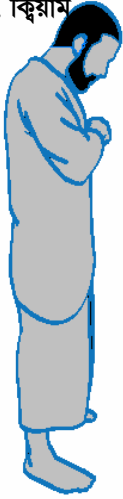
১. ক্বিয়াম
৩. ক্বওমা
(ক্বওমা হলো সাজদায় যাওয়ার আগে রুকু থেকে দাঁড়ানোর অবস্থা)
২. রুকু
৪. সাজদা (১ম)
৫. জলসা (দুই সাজদার মাঝে বসা)
৬. সাজদা (২য়)
৭. জলসা (তাশাহহুদ এবং শেষ বৈঠকের জন্য বসা)
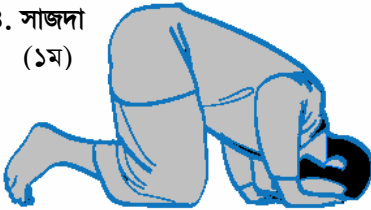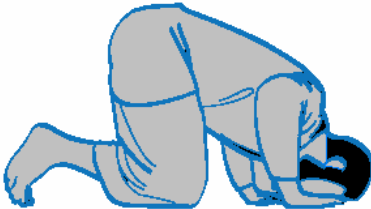
জলসা

Sitting

তাশাহহুদের বৈঠক

প্রথম তাশাহহুদের বৈঠক ও প্রাসঙ্গিক কর্মপদ্ধতি

দ্বিতীয় রাক'আতের উভয় সাজদাহ শেষ করে রসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাশাহহুদের জন্যে বসতেন, তখন বাম ঊরুর উপর বাম হাত এবং ডান ঊরুর উপর ডান হাত রাখতেন। ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ক্বিবলার দিকে ইংগিত করতে থাকতেন। এসময় আঙ্গুলটি পুরোপুরি দাঁড় করাতেন না, আবার নিচু করেও রাখতেন না, বরং উপরের দিকে ঈষৎ উঠিয়ে রাখতেন এবং নাড়াতে থাকতেন। বুড়ো আঙ্গুল মধ্যমার উপর রেখে একটা বৃত্তের মতো বানাতেন, আর শাহাদাত আঙ্গুল (তর্জনি) উঁচিয়ে দু'আ করতে থাকতেন এবং সেটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখতেন। এসময় বাম ঊরুর উপর বাম হাত বিছিয়ে রাখতেন।

দুই সাজদার মাঝখানে তিনি যেভাবে বসতেন, তাশাহহুদের বৈঠকেও (প্রথম বৈঠকে) সেভাবে বসতেন। বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার উপর বসতেন। ডান পায়ের পাতা খাড়া করে রাখতেন এবং আঙ্গুলগুলো ক্বিবলামুখী করে দিতেন। এ বৈঠকে এর ব্যতিক্রম বসতে কেউ তাঁকে দেখেনি।
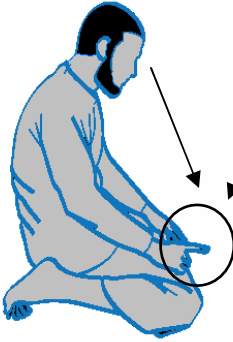
মধ্যমা অঙ্গুলিটিকে বৃদ্ধাঙ্গুলির সাথে বৃত্তাকার বানিয়ে শাহাদাত অঙ্গুলিটিকে ক্বিবলামুখী করে নাড়াতে হয় দু'আ শেষ হওয়া পর্যন্ত। চোখের দৃষ্টি শাহাদাত অঙ্গুলির দিকে থাকবে। (সহীহ মুসলিম, আবু উওয়ানা, আবু দাউদ, নাসাঈ, অহমাদ)

ডান পায়ের আঙ্গুলগুলিকে ক্বিবলামুখী করে জমিনে রাখতে হবে।

বিশেষ নোট ঃ তাশাহহুদ পড়ার সময় 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লালাহা' বলার সময় মধ্যমা আঙ্গুল একবার উঠিয়ে আবার নামিয়ে ফেলা, এই ধরণের কোন সহীহ দলিল নেই। তাশাহহুদের সম্পূর্ণ বৈঠকেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আঙ্গুল উচু করে রাখতে হবে। [সহীহ বুখারী, আবূ দাউদ]

নাবী ﷺ প্রত্যেক দু'রাক'আতে আত্তাহিয়াতু পড়তেন। (সহীহ মুসলিম)

প্রথম দু'রাক'আতে যদি আত্তাহিয়াতু পড়তে ভুলে যেতেন তাহলে সাহু সাজদাহ দিতেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

যখন তোমরা প্রত্যেক দু'রাক'আতের মাঝে বসবে তখন তোমরা বলবে আত্তাহিয়াতু... শেষ পর্যন্ত। অতঃপর তোমাদের যে কেউ তার পছন্দমত ইচ্ছাধীন দু'আ নির্বাচন করে তার দ্বারা মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। (নাসাঈ, আহমাদ, ত্বাবারানী)

নাবী ﷺ সাহাবাদেরকে এমনভাবে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন যেমনভাবে তিনি তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

রসূল ﷺ প্রথম তাশাহহুদে কী পড়তেন?

চার বা তিন রাক'আতের সলাতে রসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাক'আত পড়ে বসতেন। এটাকেই প্রথম তাশাহহুদের বৈঠক বলা হয়। এ বৈঠকে তিনি সবসময় তাশাহহুদ পড়তেন।

ইবনু মাসউদ (রা.) এর বর্ণিত তাশাহহুদ-

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ والطَّيِّبَاتُ ،

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ

الصَّالِحِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

তাশাহহুদ ঃ *আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস-সলাওয়া-তু ওয়াত্-ত্বইয়্যিবাতু আস-সালামু 'আলাইকা আইয়্যুহান-নাবীইয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু -- আস্সালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবা-দিল্লা-হিস স-লিহীন -- আশ্হাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রসূলুহু।*

অর্থ ঃ যাবতীয় ইবাদত ও অর্চনা মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্তই আল্লাহর জন্যে। হে নাবী! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক, আমাদের উপর এবং নেক বান্দাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ [সত্য উপাস্য] নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন ঃ আমরা উক্ত শব্দে অর্থাৎ 'আইয়্যুহান নাবিয়্যু' হে নাবী! সম্বোধন সূচক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তাশাহহুদ পাঠ করতাম যখন তিনি আমাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন তখন আমরা 'আইয়্যুহান নাবিয়্যু' এর পরিবর্তে 'আলান নাবিয়্যু' অর্থাৎ নাবীর উপর বলতাম। (বুখারী, মুসলিম)

ইবনু মাসউদ (রা.) এর উক্তি ঃ আমরা আসসালামু আলান নাবী বলতাম।

অর্থাৎ যখন নাবী ﷺ জীবিত ছিলেন তখন সাহাবাগণ তাশাহহুদে 'আসসালামু 'আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু' আপনার প্রতি সালাম হে আমাদের নাবী বলতেন কিন্তু যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন তখন তারা তা বলা থেকে বিরত হয়ে 'আসসালামু আলান্নাবী' বলতেন। তারা অবশ্যই এমনটি করে থাকবেন নাবী ﷺ কর্তৃক এ সম্পর্কে অবগত করানোর ফলে। এ মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় আয়িশা (রা.) থেকেও। তিনিও লোকদেরকে সলাতের যে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন তাতে 'আসসালামু আলান্নাবী' রয়েছে। (মুসনাদ, বাইহাকী)

তাশাহহুদ নিঃশব্দে পড়া সুন্নাহ। (আবূ দাউদ)
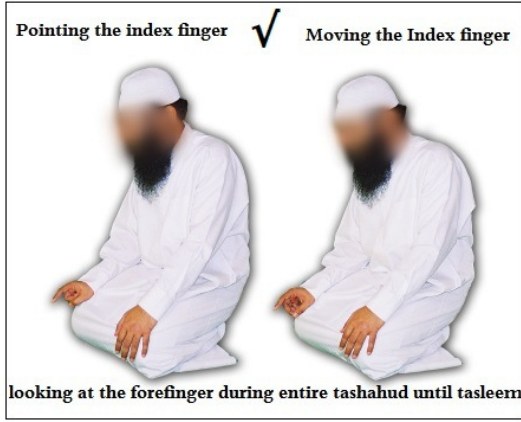
নাবী ﷺ -এর প্রতি সলাত (দুরূদ) পাঠ এবং তার স্থান

নাবী ﷺ নিজের উপর সলাত [দুরূদ] পাঠ করতেন প্রথম তাশাহহুদ ও শেষ তাশাহহুদে। (বাইহাকী)

আর উম্মাতের জন্য এটা পাঠ করা বিধিবদ্ধ করেছেন, তিনি তাদেরকে তার প্রতি সালাম প্রদানের পরে সলাত পাঠ করারও নির্দেশ দিয়েছেন। (সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন- হে আল্লাহর রসূল আমরা তো জেনেছি কিভাবে আপনার উপর সালাম প্রদান করবো (তাশাহহুদের ভিতর) কিন্তু কিভাবে আপনার উপর সলাত পাঠ করবো? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "তোমরা বল আল্লাহুম্মা সল্লিআলা মুহাম্মাদ.." হাদীসের শেষ পর্যন্ত। নাবী ﷺ কোন তাশাহহুদকে কোন তাশাহহুদ ব্যতীত সলাত বা দুরূদের জন্য বিশিষ্ট করেননি। এর ভিতরেই প্রমাণ নিহিত রয়েছে প্রথম তাশাহহুদেও সলাত বা দুরূদ পাঠ শরীয়ত সম্মত হওয়ার বিষয়টি।)

প্রথম তাশাহহুদের বৈঠক থেকে উঠে দাঁড়ানো

তাশাহহুদ শেষ করে রসূলুল্লাহ ﷺ *'আল্লাহু আকবার'* বলে উঠে দাঁড়াতেন। তিনি পায়ের পাতার বুক এবং হাঁটু যমীনে ঠেকিয়ে দুই ঊরুতে

ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। এসময় তিনি রফ'উল ইয়াদাঈন করতেন। [চতুর্থবার] তারপর রুকু করতেন। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

দ্বিতীয় রাক'আতের নিয়মগুলোও প্রথম রাক'আতের মতই করতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতের তাশাহহুদ শেষ করে যখন দাঁড়াতেন তখন রফ'উল ইয়াদাঈন করতেন। রফে' ইয়াদাইনে হাতগুলো কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন, যেমনটি করতেন সলাতের শুরুতে। অতঃপর বাকি সলাত একই পদ্ধতিতে পড়তেন। সহীহ মুসলিম ও তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে যে রসূলুল্লাহ ﷺ এসব স্থানে রফ'উল ইয়াদাঈন করতেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে রসূল ﷺ কী পড়তেন?

১) তিন রাক'আত বিশিষ্ট ফরয সলাত (যথা মাগরিবের ফরয সলাত) ঃ দ্বিতীয় রাক'আতের তাশাহহুদের বৈঠক (জল্‌সা) থেকে উঠে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে রফ'উল ইয়াদাঈন করে বুকের উপর যথারীতি দু'হাত বেঁধে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে হবে (সংগে অন্য কোন সূরা পড়তে হবে না)। তারপর যথারীতি তাসবীহ পাঠ করে রুকু-কাউমা-সাজদাহ সেরে আগের মতোই বসে তাশাহহুদ পাঠ করে নিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি দুরূদ পাঠ করতে হবে। তারপর অন্যান্য বর্ণিত দু'আ পাঠ শেষ করে যথারীতি ডানে ও বামে সালাম ফিরাতে হবে।

২) চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয সলাত (যথা যোহর, আসর ও 'ইশার ফরয সলাত) ঃ

উপরে বর্ণিত তিন রাক'আত বিশিষ্ট সলাতে তৃতীয় রাক'আত শেষে বৈঠকে না গিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়িয়ে যেতে হবে, তবে রফ'উল ইয়াদাঈন করতে হবে না। তারপর আবার বুকের উপর দু'হাত বেঁধে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে (সংগে অন্য কোন সূরা পড়তে হবে না) যথারীতি তাসবীহ পাঠ করে রুকু-কাউমা-সাজদাহ সেরে তৃতীয় রাক'আতের শেষের মতোই বসে তাশাহহুদ ও দুরূদ পাঠ

করতে হবে। তারপর অন্যান্য বর্ণিত দু'আ পাঠ শেষ করে যথারীতি ডানে ও বামে সালাম ফিরাতে হবে।

৩) চার রাক'আত বিশিষ্ট সুন্নাত সলাত (যথা যোহরের ফরযের আগে ২+২ = ৪ রাক'আত সুন্নাত)

৪) উপরে আইটেম ১ ও ২ এ বর্ণিত তিন ও চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয সলাতের সব পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে সুন্নত সলাতের ক্ষেত্রেও তবে তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর প্রত্যেক রাক'আতেই একটি করে আলাদা সূরা অথবা কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করতে হবে। মাত্র এটুকুই বেশকম চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয ও সুন্নত সলাতের মাঝে, অন্য কোন তারতম্য নেই।

বিশেষ নোট ঃ ইরান থেকে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান হয়ে অনেক ফার্সী শব্দ আমাদের দেশে চলে এসেছে যা ইসলামী পরিভাষা নয়। আমরা আমাদের প্রকাশিত বইগুলোতে এই সকল ফার্সী শব্দগুলো পরিহার করে হাদীসের ভাষাগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। যেমন ঃ নামায = সলাত; রোযা = সিয়াম; দুরূদ = সলাত; বেহেস্ত = জান্নাত; দোযখ = জাহান্নাম, শবে ক্বদর = লাইলাতুল ক্বদর।

এছাড়া আমাদের দেশে অনেক আরবী শব্দের সঠিক উচ্চারণ পরিবর্তন হয়ে ভিন্ন উচ্চারণ প্রচলিত হয়ে আসছে সেগুলোকেও পরিহার করে আমরা সঠিক উচ্চারণ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি, যেমন ঃ সলাত, সাজদাহ, নাবী, রসূল, রব্বী, রব্বানা, সদাকা।

শেষ তাশাহহুদের বৈঠক

রসূলুল্লাহ ﷺ যখন শেষ তাশাহহুদের জন্যে বসতেন, তখন (বাম) নিতম্ব যমীনে রেখে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসতেন এবং দুই পা একদিকে (ডান দিকে) বের করে দিতেন। যে কোন সলাতের সালামের বৈঠকে নারী-পুরুষ সকলকে এভাবেই বাম নিতম্বের উপর বসতে হয়। একে 'তাওয়ারুক' বলা হয়। (সহীহ্ বুখারী, আবূ দাউদ)
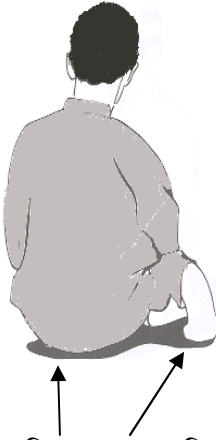
প্রশান্তির সাথে বাম নিতম্বের উপর বসতে হবে। ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো ক্বিবলামুখী থাকবে।
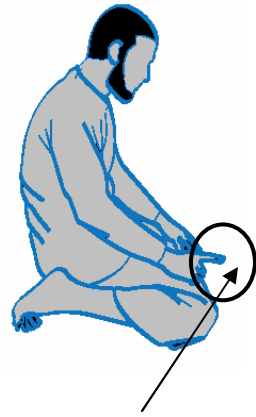
প্রথম থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত আঙ্গুল খাড়া করে রাখতে হবে অথবা নাড়াতে হবে।

রসূল ﷺ আঙ্গুল ক্বিবলামুখী রাখতেন

প্রত্যেক বৈঠকে তাশাহহুদ পড়তেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাশাহহুদের সময় হাতের আঙ্গুল ক্বিবলামুখী করে রাখতেন। এ ছাড়াও রফ'উল ইয়াদাঈন এবং রুকু ও সাজদার সময় তিনি হাতের আঙ্গুল ক্বিবলামুখী রাখতেন। তিনি সাজদার সময় দুই পায়ের আঙ্গুলও ক্বিবলামুখী করে রাখতেন। (সহীহ্ বুখারী, আবূ দাউদ)

রসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি সলাত [দুরূদ]

দুরূদ হাদীসের পরিভাষা নয় এবং আরবী শব্দ নয়, দুরূদ ফার্সি শব্দ। হাদীসের পরিভাষা হচ্ছে সলাত পড়া, অর্থাৎ নাবীর প্রতি সলাত।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

<u>দুরূদে ইব্রাহিমা</u> ঃ *আল্লা-হুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা 'আলা ইব্রাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ -- আল্লা-হুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাক্তা 'আলা ইব্রাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো, তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করো। তাঁর অনুসারী বংশধরদের প্রতিও অনুরূপ করো, যেমনটি করেছিলে তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের বরকত (কল্যাণ) দান করো, যেমন বরকত দান করেছিলে ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

<u>"দুরূদ-এর ফযীলত</u> ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপরে দশটি রহমত নাযিল করেন। তার আমলনামা হ'তে দশটি গুনাহ ঝরে পড়ে ও তার সম্মানের স্তর আল্লাহর নিকটে দশগুণ বৃদ্ধি পায়।" (নাসাঈ)

<u>সতর্কতা</u> ঃ সলাতে আমরা যে দুরূদটি পড়ে থাকি এটি সহীহ। এছাড়া বাজারে মানুষের বানানো অনেক দুরূদ পাওয়া যায় যা সহীহ নয় এবং এগুলো পড়া বিদ'আত। যেমন ঃ দুরূদে হাজারী, দুরূদে লাখী, দুরূদে তাজ, দুরূদে তুনাজ্জিনা, দুরূদে শিফা ইত্যাদি।

দুরূদ (সলাত) পাঠ-এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

অনেক বিদ'আতপন্থী নাবী ﷺ -এর প্রতি সলাত (দুরূদ) পাঠের নির্দেশ ও ফযীলতমূলক দলীলগুলো দিয়ে প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠান বা মিলাদ মাহফিল সাব্যস্ত করে। এটা মহা অন্যায়, এতে কোন সন্দেহ নেই। কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত দুরূদ ও মিলাদের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। প্রচলিত মিলাদ মাহফিল জঘন্যতম বিদ'আত ও পাপের কাজ এবং কুরআন হাদীসে উল্লিখিত দুরূদ ইবাদত ও পুণ্যের কাজ। আর দুরূদ তখনই ইবাদত ও পুণ্যের কাজ হবে যখন নাবী ﷺ -এর শিখানো ভাষা-ভঙ্গি ও পদ্ধতি অনুযায়ী হবে, অন্যথায় তা জঘন্যতম বিদ'আতে পরিণত হবে। এই আশঙ্কার জন্যই তো সাহাবাগণ রসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ আপনার প্রতি কিভাবে দুরূদ পাঠ করবো? তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ তোমরা বলবে আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদ...(দুরূদে ইব্রাহীমের শেষ পর্যন্ত)। পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল অথচ তার উত্তরে তিনি শুধু দুরূদে ইব্রাহীম বলার নির্দেশ দিয়েছেন। কাউকেও তিনি নিজের নির্বাচিত বা বানানো ভাষায় দুরূদ পড়ার অধিকার দেননি। আর মুখে সরল সোজাভাবে বলা ছাড়া কোন বাড়তি পদ্ধতি যেমন দলবদ্ধভাবে, সমস্বরে, সুরে সুরে আনুষ্ঠানিকতার ভিতর দিয়ে বা দুরূদের আগে পিছে বিভিন্ন আরবী, ফার্সী, উর্দু, বাংলায় নাবীর শানে অতিরঞ্জিত প্রশংসামূলক কবিতা ও কাহিনী আবৃত্তি করার মোটেও অধিকার দেননি।

সলাতের শেষ বৈঠকে দু'আর আগে ৪টি বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়া ওয়াজিব

রসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, তোমাদের কেউ যখন শেষ তাশাহহুদ থেকে অবসর হবে, তখন সে যেন ৪টি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়। তারপর সে যেন নিজের জন্য যা ইচ্ছা দু'আ করে। তিনি সাহাবাদেরকে এই দু'আটি এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যেমন করে তিনি তাদের কুরআন শিক্ষা দিতেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

আল্লা-হুম্মা ইন্নি আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বি জাহান্নাম, ওয়া মিন আযাবিল ক্বর, ওয়া মিন ফিৎনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামা-তি, ওয়া মিন শাররি ফিৎনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের 'আযাব থেকে, কবরের 'আযাব থেকে, জীবন-মরণের বিপর্যয় থেকে এবং মাসীহিদ-দাজ্জালের ফিৎনার অনিষ্ট থেকে। (সহীহ মুসলিম, নাসাঈ, আবূ দাউদ)

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَا بًا يَّسِيْرًا

সালামের পূর্বে আরো একটি দু'আ ঃ *আল্লাহুম্মা হাসিব্‌নি হিসাবাইঁ ইয়াসিরা*। অর্থ ঃ হে আল্লাহ! অতি সহজভাবে আমার হিসাব নিও। (আহমাদ)

দু'আয়ে মাসূরাহ

হাদীসে উল্লেখিত যে কোন সহীহ দু'আকেই দু'আয়ে মাসুরাহ বলে।

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي

مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

আল্লা-হুম্মা ইন্‌নি যলাম্‌তু নাফসি যুল্‌মান্ কাসীরাওঁ ওয়ালা ইয়াগ্‌ফিরুয যুনুবা ইল্লা আন্‌তা ফাগ্‌ফিরলি মাগফিরাতাম মিন 'ইন্দিকা, ওয়ারহামনি ইন্নাকা আন্‌তাল গফূরুর রহীম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপর অনেক যুলুম করেছি, তুমি ছাড়া আর কেউ তা মাফ করতে পারে না। তুমি আমাকে তোমার কাছ থেকে ক্ষমা দান করো এবং রহমত করো। নিশ্চয়ই তুমি অত্যধিক ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

* সহীহ বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখ হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর (রা.)-কে সলাতে এই দু'আ করতে বলেছিলেন।

দু'আয়ে মাসূরা পড়ার পর জানা মত অন্যান্য দু'আ পড়া যাবে। এই সময়ে কুরআনী দু'আসহ সহীহ হাদীস ভিত্তিক সকল প্রকারের দু'আ করা যাবে।

তিনি সলাতের মধ্যে দু'আ করতেন এবং সাহাবাদেরকেও দু'আ করতে বলেছেন।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী মা ক্বদ্দামতু, ওয়ামা-আখখরতু, ওয়ামা আসররতু, ওয়ামা আ'লানতু ওয়ামা আসরফতু, ওয়ামা আন্‌তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্‌তাল মুকাদ্দিমু, ওয়া আন্‌তাল মু'আখখিরু লা-ইলা-হা ইল্লা আন্‌ত।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি যেসব গুনাহ অতীতে করেছি এবং যা পরে করেছি তার সমস্তই তুমি ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও সেই গুনাহগুলোও যা আমি গোপনে করেছি আর যা প্রকাশ্যে করেছি, ক্ষমা করো আমার সীমালঙ্ঘনজনিত গুনাহসমূহ এবং সেসব গুনাহ যেসব গুনাহ সম্বন্ধে তুমি আমার অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত, তুমি যা চাও আগে কর এবং তুমি যা চাও পশ্চাতে কর। আর তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। (সহীহ মুসলিম)

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

আল্লা-হুম্মা আ'ইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা, ওয়াহুসনি 'ইবা-দাতিক।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার যিকর, তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার এবং তোমার ইবাদত সঠিক ও সুন্দরভাবে সমাধা করার কাজে আমাকে সহায়তা দান কর।' (আবু দাউদ, নাসাঈ)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল বুখলি, ওয়া আউ'যুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আউ'যুবিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল 'উমুর, ওয়া আউ'যুবিকা মিন ফিতনাতিদ দুনইয়া ও আযা-বিল ক্বর।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি কার্পণ্য হতে এবং আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরুষতা হতে, আর আশ্রয় চাচ্ছি বার্ধক্যের চরম দুঃখ-কষ্ট থেকে, দুনিয়াতে ফিৎনা-ফাসাদ ও কবরের আযাব হতে।' (সহীহ বুখারী)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকাল জান্নাতা ওয়া আউ'যুবিকা মিনান্নার।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাতের প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাচ্ছি।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

দু'আ (সলাতে দু'আর স্থানসমূহ)

১. তাকবীরে তাহরীমার পর, সানা বা দু'আতে ইস্তিফতা-হ, যা 'আল্লা-হুম্মা বা-'ইদ বায়নী' দিয়ে শুরু হয়।

২. শ্রেষ্ঠ দু'আ হল সূরায়ে ফাতিহার মধ্যে 'আলহামদুলিল্লাহ' ও 'ইহদিনাছ ছিরা-ত্বল মুস্তাকীম'।

৩. রুকুতে 'সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা...'।

৪. রুকু হতে উঠার পর ক্বওমার দু'আ 'রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ হাম্‌দান কাছীরন'... বা অন্য দু'আসমূহ।

৫. সাজদায়। সাজদায় বেশি দু'আ করা।

৬. দুই সাজদার মাঝে বসে 'আল্লা-হুম্মাগফিরলী..' বলে ৬টি বিষয়ের প্রার্থনা।

৭. শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর ও সালাম ফিরানোর পূর্বে বিভিন্ন দু'আর মাধ্যমে।

৮. ক্বওমাতে দাঁড়িয়ে দু'আয়ে কুনূতের মাধ্যমে দীর্ঘ দু'আ করার সুযোগ।

সালাম ফিরানোর পদ্ধতি

দু'আ শেষ করে তিনি প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরাতেন, বলতেন

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

অর্থ ঃ তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক; এবং তৎপর বাম দিকে মুখ ফিরাতেন এবং আগের মতই বলতেন *'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ'*।

নাবী ﷺ তাঁর ডানে সালাম প্রদান করতেন এ বলে "আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ" (এ পরিমাণ মাথা ঘুরাতেন যে) তাঁর ডান গালের শুভ্রতা দেখা যেত, বাম দিকেও সালাম প্রদান করতেন "আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ" (এ পরিমাণ মাথা ঘুরাতেন যে) তাঁর বাম গালের শুভ্রতা দেখা যেত। (মুসলিম,আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

তোমাদের যে কারো জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তার উরুর উপর হাত রাখবে এবং ডানে বামে অবস্থিত তার ভাইকে সালাম প্রদান করবে। (মুসলিম)

প্রথমে ডানদিকে এবং তারপর
বামদিকে সালাম ফিরাতে হবে।
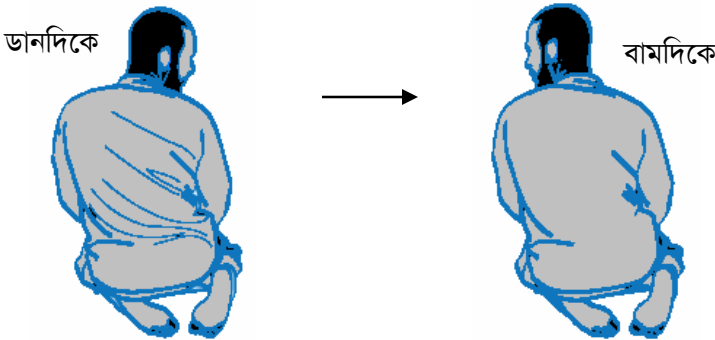
পরবর্তী পৃষ্ঠাতে সলাতের অশুদ্ধ ভঙ্গিগুলো দেখানো হয়েছে

অশুদ্ধ ক্বিয়াম
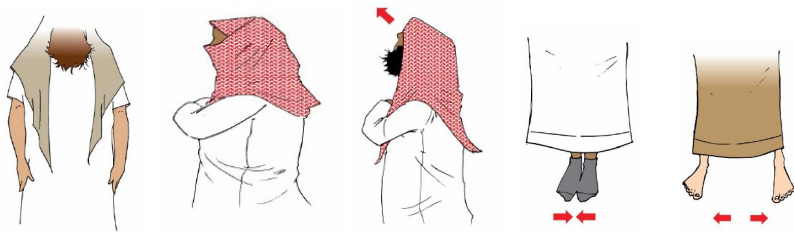
অশুদ্ধ হাত বাঁধা

অশুদ্ধ রফ'উল ইয়াদাঈন
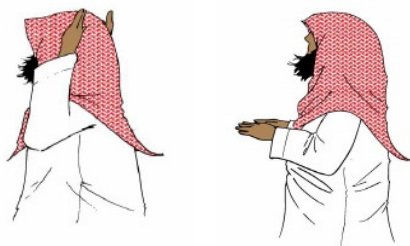
অশুদ্ধ রুকু

অশুদ্ধ সাজদাহ
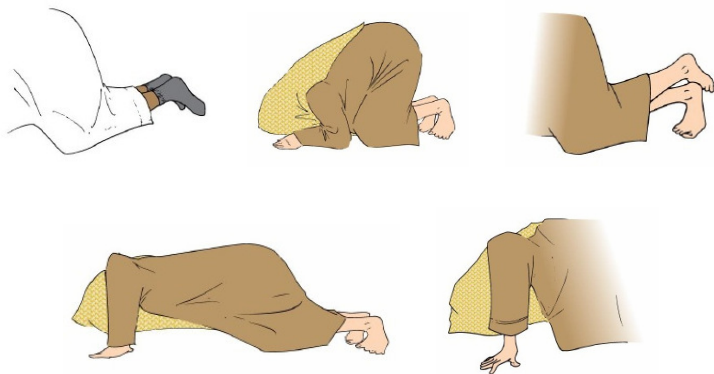
অশুদ্ধ বৈঠক/জলসা
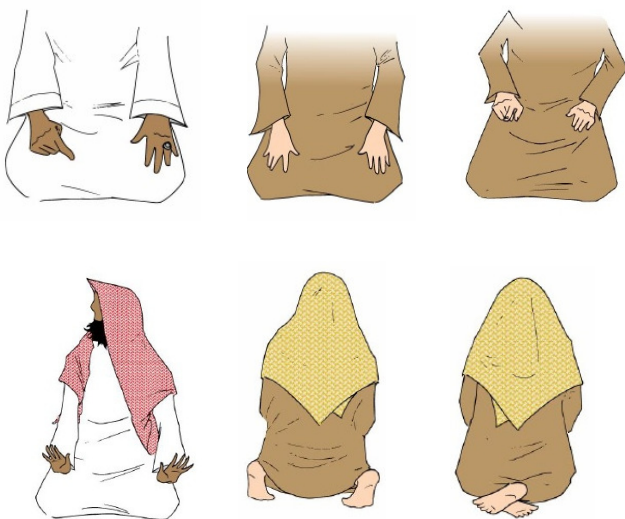
সালাম ফিরিয়ে মুক্তাদীদের নিয়ে মুনাজাত করা ঠিক নয়

সালাম ফিরানোর পর ক্বিবলার দিকে ফিরে কিংবা মুক্তাদীদের দিকে ফিরে হাত উঠিয়ে দু'আ বা মুনাজাত করার যে প্রথা চালু রয়েছে তার কোন প্রমাণ রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পাওয়া যায় না। সহীহ বা হাসান হাদীস কোন সূত্রেই পাওয়া যায় না।

হাদীসে সলাত সংক্রান্ত যতো দু'আর কথা উল্লেখ হয়েছে, সবই রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের ভিতরে করেছেন এবং সলাতের ভিতরে করার জন্যেই নির্দেশ দিয়েছেন।

বিশেষ নোট ঃ বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া-পাকিস্তানি অনেক ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পরপরই হাত তুলে মুনাজাত শুরু করার কারণে রসূল ﷺ -এর দেয়া তাসবিহগুলো মুক্তাদি পড়ার সুযোগ পান না। এতে রসূল ﷺ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে আর সেই জায়গায় একটি বিদ'আত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সালাম ফিরিয়ে রসূল ﷺ কী করতেন? কী পড়তেন?

রসূল ﷺ ফরয সলাতের পর মুনাজাত করতেন না। এবং সাথে সাথে দাঁড়িয়ে সুন্নাহও পড়তেন না। তিনি ধীরে সুস্থে নিম্নের কাজগুলো করতেন ঃ

১) একবার اللهُ أَكْبَرُ

আল্লাহু আকবার (সরবে)। অর্থ ঃ আল্লাহ মহান। (সহীহ বুখারী)

তিনবার أَسْتَغْفِرُ اللهَ

আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ। অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (সহীহ মুসলিম)

২) একবার اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালামু ওয়া মিন্কাস সালামু তাবা-রক্তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইক্রা-ম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমিই শন্তির উৎস, তোমার থেকেই আসে শান্তি। তুমি বড়ই বরকতময়। হে অতি মহান! মহা মর্যাদার অধিকারী অতিশয় কল্যাণময় তুমি। (সহীহ মুসলিম)

৩) একবার لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। আল্লা-হুম্মা লা-মা-নি'আ লিমা আ'ত্বইতা ওয়ালা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফা'উ যাল্ জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (হুকুমকর্তা) নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক (অংশীদার) নেই। মহাবিশ্বের কর্তৃত্ব কেবল তাঁর। সমস্ত প্রশংসা তাঁর। সর্বশক্তিমান তিনি। হে আল্লাহ! তুমি কিছু দিতে চাইলে তা রোধ করার সাধ্য কারো নেই। আর তুমি কিছু দিতে না চাইলে তা দেবার সাধ্য কারো নেই। কোন সম্পদশালীর সম্পদ, কোন মর্যাদাবানের মর্যাদা তোমার মোকাবেলায় সম্পূর্ণ নিষ্ফল, একেবারেই অকার্যকর। (সহীহ বুখারী)

৪) তেত্রিশবার করে

سُبْحَانَ اللّٰهِ *সুবহা-নাল্লাহ*	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *আলহামদুলিল্লাহ*	اللّٰهُ أَكْبَرُ *আল্লাহু আকবার*
মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি	সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য	আল্লাহ মহান

একবার لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (হুকুমকর্তা) নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক (অংশীদার) নেই। মহাবিশ্বের কর্তৃত্ব কেবল তাঁর। সমস্ত প্রশংসা তাঁর। সর্বশক্তিমান তিনি। (তিরমিযী)

৫) একবার আয়াতুল কুরসী ঃ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

আল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা, হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়্যুম, লা তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা নাউম লাহু মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল্ আরদ্ব, মান্ যাল্লাযী ইয়াশ্ফাউ 'ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহী, ইয়া'লামুমা-বাইনা আইদিহীম ওয়ামা খলফাহুম ওয়ালা ইয়ুহীতুনা বিশাইইম মিন্ 'ইলমিহী ইল্লা বিমা-শা-আ, ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদ্ব, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফ্যুহুমা, ওয়া হুয়াল 'আলিয়্যুল 'আযীম।

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর নিকট তাঁর অনুমতি ছাড়া? সামনের এবং পিছের সবকিছুই

তিনি অবগত আছেন। তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারেন না, কিন্তু যতোটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন গোটা বিশ্বজগৎ পরিবেষ্টিত করে আছে। আর এ দু'টোর হিফাজত করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, তিনি সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৫; সহীহ বুখারী, নাসাঈ)

৬) একবার করে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস। (ফজর ও মাগরিবের সলাতের পর তিনবার করে।)

সলাত শেষে নিজের মা-বাবার জন্যে দু'আ

প্রত্যেক ফরয সলাত শেষে সালাম ফিরানোর আগে মা-বাবার জন্যে অবশ্যই দু'আ করা উচিত।

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

রব্বির হামহুমা-কামা-রব্বাইয়া-নী সগী-রা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তাদের দু'জনের প্রতি রহম করুন যেমনিভাবে তারা আমাকে ছোট কালে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বণী ইসরাঈল ঃ ২৪)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

রব্বানাগ্‌ফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইইয়া ওয়ালিলমু'মিনী-না ইয়াওমা ইয়াকু-মুল হিসা-ব।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার পিতা-মাতা ও সকল মু'মিন মুসলিমকে কিয়ামতের দিবসে ক্ষমা কর। (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪১)

বিতর সলাতের নিয়ম

বিতর সলাত

বিতরের সলাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। (নাসাঈ) যা ইশার ফরয সলাতের পর হতে ফজর পর্যন্ত সুন্নাত ও নফল সলাতসমূহের শেষে আদায় করতে হয়। (ফিকহুস সুন্নাহ) বিতর সলাত খুবই ফযীলতপূর্ণ। রসূলুল্লাহ ﷺ বাড়ীতে বা সফরে কোন অবস্থায় বিতর ও ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত পরিত্যাগ করতেন না।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ 'রাতের নফল সলাত [তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ সলাত] দুই দুই' [অর্থাৎ দুই দুই রাক'আত করে], অতঃপর যখন তোমাদের কেউ ফজর হয়ে যাবার আশংকা করে তখন সে যেন এক রাক'আত পড়ে নেয় যা পূর্বেকার সকল নফল সলাতকে বিতরে পরিণত করবে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) অন্য হাদীসে তিনি বলেন ঃ 'বিতর রাত্রির শেষে এক রাক'আত মাত্র'। (সহীহ মুসলিম) আয়িশা (রা.) বলেন, "রসূলুল্লাহ ﷺ এক রাক'আত দ্বারা বিতর করতেন"। (ইবনে মাজাহ)

বিতর সহ রাতের নফল সলাত **১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১** ও **১৩** রাক'আত পর্যন্ত পড়া যায় এবং তা প্রথম রাত্রি, মধ্য রাত্রি, ও শেষ রাত্রি সকল সময় পড়া চলে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, নাসাঈ, আবূ দাউদ) তিন রাক'আত বিতর একটানা ও এক সালামে পড়াই উত্তম। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা মাগরিবের সলাতের ন্যায় (মাঝখানে বৈঠক করে) বিতর আদায় করো না'। (দারাকুৎনী; সনদ সহীহ)।

কুনূত বা যেকোন দু'আ শেষে কেবল দু'হাত উঁচু করতে হয়। মুখে হাত বুলানোর কোন সহীহ হাদীস নেই। বিতর শেষে তিনবার সরবে 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' শেষদিকে দীর্ঘ টানে বলতে হয়। (নাসাঈ, দারাকুৎনী)

নোট ঃ আমাদের দেশে সাধারণত যে দু'আ কুনূতটি পড়া হয় সেটি সহীহ হাদীস ভিত্তিক নয়।

উল্লেখ্য যে ‘আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা’ ..... বলে বিতরে যে কুনূত পড়া হয় সেটার হাদীস ‘মুরসাল’ বা যঈফ। অতএব বিতরের কুনূতের জন্য হাসান বিন আলী (রা.) বর্ণিত দু’আটিই সর্বোত্তম।”

রাতের (তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফল) সলাতে রুকুতে রসূলুল্লাহ ﷺ পড়তেন – “সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুল মালায়িকাতি ওয়াররূহ” (অর্থ ঃ সকল দুর্বলতা, ত্রুটি ও অক্ষমতা থেকে মুক্ত অতিশয় পাক-পবিত্র তুমি সকল ফিরিশতা ও জিব্রীলের প্রভু।)

সহীহ দু’আ কুনূত

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، [وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ]، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

আল্লা-হুম্মাহদিনী ফীমান হাদায়তা, ওয়া ’আ-ফিনী ফীমান আফায়তা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা, ওয়া বারিক্লী ফীমা আ’ত্বয়তা, ওয়াক্বিনী শার্‌রা মা-ক্বদায়তা, ফাইন্নাকা তাকদী ওয়ালা-ইউক্বদা ’আলায়কা, ইন্নাহু লা-ইয়াযিললু মান ওয়ালায়তা, ওয়া লা-ইয়া ’ইযযু মান ’আদায়তা, তাবারকতা রব্বানা ওয়া তা’আ-লায়ত।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছো, আমাকেও সঠিক পথ দেখিয়ে তাদের অন্তর্ভূক্ত করো। যাদের তুমি ক্ষমা ও সুস্থতা দান করেছো, আমাকেও ক্ষমা এবং সুস্থতা দান করে তাদের অন্তর্ভূক্ত করো। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছো, আমাকেও তাদের অন্তর্ভূক্ত করো। তুমি যা কিছু প্রদান করেছো, আমার জন্যে তাতে বরকত/প্রাচুর্য দান করো। তোমার মন্দ সিদ্ধান্ত থেকে আমাকে রক্ষা করো। তুমিই প্রকৃত সিদ্ধান্তকারী, আর তোমার উপর অন্য কারো সিদ্ধান্ত চলে না। তুমি যার অভিভাকত্ব গ্রহণ করেছো, তাকে কেউ অপদস্থ করতে পারে না। যে তোমার শত্রু হয়েছে, তাকে ইয্‌যত দান করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের প্রভু, বিরাট প্রাচুর্যশীল, অতিশয় মহান তুমি।

দু'আ কুনূত কখন পড়বো?

ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসূলুল্লাহ ﷺ মূলতঃ রুকূর পরে কুনূত পড়তেন, পূর্বে নয়।

কখনো কখনো নাবী ﷺ বিতর অর্থাৎ বিজোড় রাক'আত বিশিষ্ট সলাতে কুনূত করতেন। আর তা করতেন রুকুর পূর্বে। (আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমাদ, ত্বাবারানী, বাইহাকী)

নোট ঃ নাবী ﷺ যখন কুনূতে অন্যের জন্য দু'আ বা বদ'দু'আ করতেন তখন সাধারণত রুকুর পরে করতেন আর যখন শুধু দু'আ কুনূত পড়তেন তখন রুকুর আগে পড়তেন।

বিতর এক রাক'আত পড়লে রুকু থেকে উঠে সাজদায় যাওয়ার আগে দাঁড়িয়ে মুনাজাতের মতো হাত তুলে দু'আ কুনুত পড়তে হয়। একই ভাবে তিন রাক'আত পড়লে তৃতীয় রাক'আতে রুকু থেকে উঠে সাজদায় যাওয়ার আগে দাঁড়িয়ে মুনাজাতের মতো হাত তুলে দু'আ কুনূত পড়তে হয়।

মাঝে মাঝে দু'আ কুনূত না পড়েও বিতর পড়া যেতে পারে। দু'আ কুনূত সহ এবং দু'আ কুনূত ছাড়া দুইভাবেই বিতর পড়া যেতে পারে।

এছাড়া আমাদের দেশে যেভাবে তিন রাক'আত বিতর সলাত পড়া হয় তাও সহীহ হাদীস ভিত্তিক নয়।

- বিতর সলাত তিন রাক'আত পড়লে তা অবশ্যই মাগরিবের মতো করে পড়া যাবে না। তিন রাক'আত কোন বৈঠক ছাড়া একবারে পড়ে ফেলতে হবে এবং তৃতীয় রাক'আতে দু'আ কুনূত পড়তে হবে।
- অথবা দুই রাক'আত সম্পূর্ণ পড়ে দুই দিকেই সালাম ফিরিয়ে সলাত শেষ করে দাঁড়িয়ে যেতে হবে এবং তাকবীর দিয়ে আবার নতুন করে এক রাক'আত সলাত আদায় করতে হবে। এভাবে ২+১ = ৩ রাক'আত বিতর হবে। এই নিয়মই সহীহ হাদীস ভিত্তিক।

৪র্থ অধ্যায়
সলাতের দলিলসমূহ

ইমাম ও মুক্তাদী উভয়কে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, দলিল

ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য সকল প্রকার সলাতে প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরয। প্রধান দলিলসমূহ ঃ

১. 'উবাদাহ ইবনু সমিত (রা.) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সলাতে সূরা আল ফাতিহা পড়ল না তার সলাত হলো না। সহীহ বুখারী হাদীস # ৭৫৬ ও সহীহ মুসলিম)

২. সলাতে ভুলকারী জনৈক ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'অতঃপর তুমি 'উম্মুল কুরআন' অর্থাৎ সূরায়ে ফাতিহা পড়বে এবং যেটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করেন কুরআন থেকে পাঠ করবে'...। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

৩. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, 'আমরা আদিষ্ট হয়েছিলাম যেন আমরা সূরায়ে ফাতিহা পড়ি এবং (কুরআন থেকে) যা সহজ মনে হয় (তা পড়ি)'। (আবূ দাউদ)

৪. আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, 'রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ দেন যেন আমি এই কথা ঘোষণা করে দেই যে, সলাত সিদ্ধ নয় সূরায়ে ফাতিহা ব্যতীত। অতঃপর অতিরিক্ত কিছু' (আবূ দাউদ) এখানে প্রথমে সূরায়ে ফাতিহা, অতঃপর কুরআন থেকে যা সহজ মনে হয়, সেখান থেকে অতিরিক্ত কিছু পড়তে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৫. আল্লাহ বলেন, 'যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর ও চুপ থাক'..(সূরা আরাফ ৭ ঃ ২০৪)

   আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা কি ইমামের ক্বিরাআত অবস্থায় পিছনে কিছু পাঠ করে থাক? এটা করবে না। বরং কেবলমাত্র সূরায়ে ফাতিহা চুপে চুপে পাঠ করবে'। (সহীহ বুখারী)

৬. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত 'রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি সলাত আদায় করল, যার মধ্যে 'কুরআনের সারবস্তু' অর্থাৎ সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করল না, তার ঐ সলাত বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ'...। রাবী আবূ হুরায়রা (রা.)-কে বলা হ'ল, আমরা

যখন ইমামের পিছনে থাকি, তখন কিভাবে পড়ব? তিনি বললেন, ‘তুমি ওটা চুপে চুপে পড়’। তাছাড়া উক্ত হাদীসে সূরা ফাতিহাকে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে অর্ধেক করে দু’ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ‘আর আমার বান্দা যা চাইবে, তাই পাবে’। (সহীহ মুসলিম) ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েই আল্লাহর বান্দা। অতএব উভয়ে সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে ‘সিরাতে মুস্তাকীম’-এর সর্বোত্তম হিদায়াত প্রার্থনা করবে। রসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ আমাদেরকে যেদিকে পথনির্দেশ দান করেছেন।

৭. ওবাদাহ বিন সামিত (রা.) বলেন, আমরা একদা ফজরের জামা’আতে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে সলাতরত ছিলাম। এমন সময় মুক্তাদীদের কেউ সরবে কিছু পাঠ করলে রসূল ﷺ -এর জন্য ক্বিরাআত কঠিন হয়ে পড়ে। তখন সালাম ফিরানোর পরে তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিছু পড়ে থাকবে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। জবাবে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘এরূপ করো না কেবল সূরায়ে ফাতিহা ব্যতীত। কেননা সলাত সিদ্ধ হয় না যে ব্যক্তি ওটা পাঠ করে না।’ (তিরমিযী, আহমাদ)

সলাতে সূরা ফাতিহা না পড়লে সলাত হবে না, সে সলাত উচ্চৈঃস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে হোক না কেন। ইমামের পিছনে মুক্তাদীরূপে সূরা ফাতিহা না পড়লে সলাত হবে এমন প্রমাণ নেই। আরো কিছু দলিল ঃ

৮. সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৯৯-১০০ পৃঃ
৯. সহীহ মুসলিম ১৬৯ পৃঃ
১০. আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ১৩২ পৃঃ
১১. তিরমিযী ১ম খণ্ড ৩৪ পৃঃ
১২. নাসাঈ ১৪৫-১৪৬ পৃঃ
১৩. ইবনু মাজাহ ৬০-৬১ পৃঃ
১৪. ইবনু খুজায়মা ১ম খণ্ড ২৪৬-২৪৮ পৃঃ
১৫. মুসতাদরেকে হাকেম ১ম খণ্ড ২০৯ পৃঃ
১৬. দারাকুতনী ১২২ পৃঃ
১৭. তাহাবী ১২১ পৃঃ
১৮. আবূ আওয়ানাহ ২য় খণ্ড ১২৮ পৃঃ

রফ’উল ইয়াদাঈনের দলিল

‘রফ’উল ইয়াদাঈন ঃ অর্থ- দু’হাত উঁচু করা। এটি আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণের অন্যতম নিদর্শন। রুকু থেকে উঠে ক্বওমাতে দাঁড়িয়ে দু’হাত ক্বিবলামুখী স্বাভাবিকভাবে কাঁধ বা কান বরাবর উঁচু করে তিন বা চার রাক’আত বিশিষ্ট সলাতে মোট চারস্থানে ‘রফ’উল ইয়াদাঈন’ করতে হয়। ১) তাকবীরে তাহরীমার সময় ২) রুকুতে যাওয়ার সময় ৩) রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় এবং ৪) ৩য় রাক’আতে দাঁড়িয়ে বুকে হাত বাঁধার সময়। এমনিভাবে প্রতি তাশাহহুদের বৈঠকের পর উঠে দাঁড়াবার সময় রফ’উল ইয়াদাঈন করতে হয়।

রুকুতে যাওয়া ও রুকু হতে ওঠার সময় ‘রফ’উল ইয়াদাঈন’ করা সম্পর্কে চার খলিফা সহ প্রায় ২৫ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসসমূহ রয়েছে। একটি হিসাব মতে ‘রফ’উল ইয়াদাঈন’-এর হাদীসের রাবী সংখ্যা ‘আশারায়ে মুবাশশারাহ’ সহ অন্যূন ৫০ জন সাহাবী এবং সর্বমোট সহীহ হাদীস ও আছারের সংখ্যা অন্যূন চার শত। ইমাম সুয়ূত্বী ও আলবানী প্রমুখ বিদ্বানগণ ‘রফ’উল ইয়াদাঈন’-এর হাদীসকে ‘মুতাওয়াতির’ পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, কোন সাহাবী রফ’উল ইয়াদাঈন তরক করেছেন বলে প্রমাণিত হয়নি। তিনি আরও বলেন ‘রফ’উল ইয়াদাঈন’-এর হাদীস সমূহের সনদের চেয়ে বিশুদ্ধতম সনদ আর নেই।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের শুরুতে, রুকুতে যাওয়াকালীন ও রুকু হতে ওঠাকালীন সময়ে ... এবং ২য় রাক’আত থেকে উঠে দাঁড়াবার সময় ‘রফ’উল ইয়াদাঈন’ করতেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন সলাতের জন্য ‘তাকবীরে তাহরীমা’ দিতেন, তখন হাত দু’টি স্বীয় দুই কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। অতঃপর রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু হতে ওঠার সময় তিনি অনুরূপ করতেন এবং *‘সামি’আল্লাহু লিমান হামিদাহ’* বলতেন। (সহীহ মুসলিম)

ইবনু ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন সলাত আরম্ভ করতেন তখন হস্তদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন এবং যখন রুকুর জন্য তাকবীর দিতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও উক্তভাবে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত

উঠাতেন। এই রকম সলাত রসূল ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত আদায় করেছেন। (বায়হাকী ২য় খণ্ড ৭৫ পৃঃ তালখিসুল হাবীর ১ম খণ্ড ৮১ পৃঃ, দিরাসাতুল লবীব ১৭০ পৃঃ) রফ'উল ইয়াদাঈনের আরো কিছু দলিল ঃ

১. সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৯৭-৯৮ পৃঃ
২. সহীহ মুসলিম ১৬৮ পৃঃ
৩. তিরমিযী ১ম খণ্ড ৩৪ পৃঃ
৪. আবূ দাউদ ৬২ পৃঃ
৫. ইবনু মাজাহ ৬২ পৃঃ
৬. নাসায়ী ১৬১ পৃঃ
৭. দারাকুতনী ১০৯ পৃঃ
৮. বায়হাকী ২য় খণ্ড ৯৪ পৃঃ
৯. ইবনু খুজায়মা ১ম খণ্ড ২৩৩, ২৯৪-২৯৬ পৃঃ
১০. সহীহ বুখারী হাদীস নম্বর ৬৯১, ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫ (আধুনিক প্রকাশনী)

রফ'উল ইয়াদাঈনের ফযীলত

রফ'উল ইয়াদাঈন হ'ল আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের অন্যতম নিদর্শন। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বলেন, রফ'উল ইয়াদাঈন হ'ল সলাতের সৌন্দর্য।' রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু হতে ওঠার সময় কেউ রফ'উল ইয়াদাঈন না করলে তিনি তাকে ছোট পাথর ছুঁড়ে মারতেন। (ফাৎহুল বারী ২/২৫৭) উক্ববাহ বিন 'আমের (রা.) বলেন, প্রত্যেক রফ'উল ইয়াদাঈন-এ ১০টি করে নেকী আছে। (নায়লুল আওত্বার ৩/১২; সিফাত ১০৯)

রফ'উল ইয়াদাঈন এর বিপক্ষে হাদীস

উল্লেখ্য যে, অসংখ্য সহীহ হাদীসের বিপরীতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত বাকী সময়ে রফ'উল ইয়াদাঈন না করার পক্ষে প্রধানতঃ যে চারটি হাদীস পেশ করা হয়ে থাকে, তার সবগুলিই 'যঈফ'।

রফ'উল ইয়াদাঈন নিয়ে ভ্রান্ত গল্প

রফ'উল ইয়াদাঈন নিয়ে সমাজে একটি ভ্রান্ত গল্প প্রচলিত আছে। আর তা হচ্ছে, তৎকালিন সময়ে সাহাবীরা নাকি মূর্তি পূজা ছাড়তে পারেননি এবং তারা সলাত আদায় করার সময় ছোট ছোট মূর্তি তাদের বোগলের নিচে রেখে সলাত আদায় করতেন। আল্লাহর রসূল ﷺ এটা পছন্দ করতেন না

বিধায় তিনি ইমামতি করার সময় তাদের মূর্তি যেন বোগলের নিচ হতে পরে যায় সেজন্য তিনি ট্রিক্স করে সলাতের মধ্যে বারে বারে রফ'উল ইয়াদাঈন করতেন। (নাউযুবিল্লাহ) এখন প্রশ্ন ঃ যেমন চার রাক'আত সলাতে তো রফ'উল ইয়াদাঈন করতে হয় ১০ বার। প্রথম রাক'আতের রফ'উল ইয়াদাইনের সময়তো মূর্তি বোগল থেকে পড়ে গেল তারপরও কেন আরো ৯বার রফ'উল ইয়াদাঈন করার প্রয়োজন হলো? তাহলে কি পড়ে যাওয়া মূর্তি সিজদার সময় আবার তুলে নিয়ে বোগলে রাখতেন? এছাড়া বোগল থেকে মূর্তি পড়ে গিয়ে তো ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়ার কথা!

এই ধরণের গল্প কে যে বানিয়েছে আল্লাহই ভাল জানেন! ইসলামের ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ বা দলিল নেই যে, কোন সাহাবী ঈমান আনার পর মূর্তি পূজা করেছেন বা মূর্তি নিয়ে ঘুরাঘুরি করেছেন বা মূর্তি বোগলের নিচে নিয়ে সলাত আদায় করেছেন। আল্লাহর রসূল ﷺ -এর প্রতি সাহাবাদের এমন আনুগত্য ছিল যে, তিনি বললে তারা যে কোন সময় তাদের প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতেন। আর তাদের বোগলের নিচের মূর্তি অপসারণ করার জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ -কে সাহাবাদের সাথে ট্রিক্স করতে হবে কেন?

আমরা যদি ইসলামের ইতিহাস দেখি, রসূল ﷺ -এবং সাহাবাদের জীবনী দেখি তাহলে দেখতে পাই যে নবুয়ত পাওয়ার পর ইসলামের প্রথম ১৩ বছর কেটেছে মক্কায় এবং হাতে গোনা কয়েকজন সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের সবাইকেই আমরা চিনি, যেমন ঃ খাদিজা, আবুবকর, আলী, ফাতিমা, হামযা, ওমর, ওসমান, জায়িদ, সুমাইয়া, ইয়াসির, আম্মার, বিলাল প্রমুখ (রাদিআল্লাহু আনহুম)। প্রথম দিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের জীবন ছিল সারাক্ষণ হুমকির মুখে, মুশরিকদের (মূর্তি পূজারীদের) ভয়ে তারা প্রকাশ্যে রসূল ﷺ -এর সাথে দেখা পর্যন্ত করতে পারতো না, এই ১৩টি বছর ছিল নির্যাতনের বছর, ইসলাম গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে তিন বছরের জন্য বয়কট করা হয়েছিল এবং তারা তখন গাছের পাতা খেয়ে জীবনধারণ করেছিলেন, নির্যাতনের চরম শিকারে কয়েকজনের জীবনও চলে গিয়েছিল, কিছু সাহাবী মূর্তি পূজারীদের ভয়ে হিযরত করে আবিসিনিয়ায় চলে যান এবং কিছু সাহাবী মদীনায় চলে যান, মূর্তি পূজারীরা যখন রসূল ﷺ-কে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয় তখন আল্লাহর রসূল ﷺ আবুবকর (রা.)-কে নিয়ে মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যান।

রসূল ﷺ -মিরাজের যাওয়ার পর ইসলামের পথম দিকেই পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয হয় এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা মক্কার কাফিরদের ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সলাত আদায় করতো। প্রকাশ্যে জামাতে সলাত আদায়ের প্রশ্নই উঠে না। যারা ইসলামের জন্য, সলাত প্রতিষ্ঠার জন্য এতো নির্যাতন সহ্য করছিলেন তারা কেন মূর্তি বগলে নিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে ফাঁকি দিবেন? আল্লাহকে কেন ফাঁকি দিবেন? যারা ইসলামের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের ঈমান এতোই মজবুত ছিল যে তাদের মতো সাহাবী এখন পর্যন্ত জন্ম নেয়নি।

এবার আসি মদীনার কথা। মদীনায় দুই ধরণের সাহাবী ছিল, আনসার ও মুহাজীর। মুহাজীররা তো মক্কা থেকে বাড়ী-ঘর, পরিবার-পরিজন সর্বস্ব ত্যাগ করে মদীনায় হিযরত করে চলে এসেছিলেন। আর আনসাররা মুহাজীরদের জন্য তাদের সম্পদের অর্ধেক দিয়ে দিয়েছিলেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যতোগুলো যুদ্ধ হয়েছিল তা হয়েছিল মদীনার ১০ বছর সময়কালে আর এই যুদ্ধে জীবনবাজী রেখে অংশগ্রহণ করতেন আনসার ও মুহাজীরগণ। মদীনায় মূর্তিপূজারী ছিল না, সেখানে ছিল ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়। ইহুদীদের একটি গ্রুপ ছিল মুনাফিক যারা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু অন্তরে করেনি। তারা আল্লাহর রসূল ﷺ এর পিছনে সলাত আদায় করতো ঠিকই কিন্তু তারা সাধারণত ফযর ও 'ইশার সলাতে অন্ধকারে আসতো না। তবে তারা কেউ মূর্তি পূজা করতো না, তারা তাওরাত ধর্মগ্রন্থের অনুসারী ছিল। আল্লাহ তাদের একটি লিষ্ট তার রসূলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এদের মধ্যে কেউ মূর্তি বোগলে নিয়ে সলাত আদায় করতেন না।

বুকের উপর হাত বাঁধার দলিল

ওয়ায়েল বিন হুজর (রা.) বলেন, 'আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সলাত আদায় করলাম। এমতাবস্থায় দেখলাম যে, তিনি বাম হাতের উপরে ডান হাত স্বীয় বুকের উপরে রাখলেন'। (আবু দাউদ)

ত্বাউস (রা.) বলেন, রসূল ﷺ সলাতের মধ্যে তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন এবং উভয় হাত বুকের উপর শক্ত করে ধরে রাখতেন। (আবু দাউদ)

জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ ভারতীয় ছাপা আবু দাউদে হাত বাঁধা সংক্রান্ত একটি হাদীসও উল্লেখিত হয়নি। এর কারণ সম্পূর্ণ অজানা। তবে ইমাম আবু দাউদ নাভীর নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে বর্ণিত বর্ণনাগুলোকে যঈফ বলেছেন। আর বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে পেশ করতে চেয়েছেন। কারণ উক্ত হাদীস সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। সে জন্যই হয়ত কোন হাদীসই উল্লেখ করা হয়নি। (আবু দাউদ)

ওয়াইল ইবনু হুজর (রা.) বলেন, আমি রসূল ﷺ -এর সাথে সলাত আদায় করেছি। তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে বুকের উপর রাখতেন। (সহীহ ইবনে খুযায়মাহ)

ক্বাবীসাহ বিন হুলব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেছেন, আমি রসূল ﷺ -কে ডান ও বামে ফিরতে দেখেছি এবং হাতকে বুকের উপর রাখার কথা বলতে শুনেছি। অতঃপর ইয়াহইয়া ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখেন। (মুসনাদে আহমাদ)

সাহাবী সাহল বিন সা'দ (রা.) প্রমুখাৎ বর্ণিত যে, (রসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে) লোক সকল সলাতের মধ্যে ডান হাত বাম জেরার উপর রাখতে আদিষ্ট হতেন। (সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ১০২ পৃঃ)

আলকামা তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা ওয়ায়েল বিন হুজর বলেন– আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি যখনই তিনি সলাতের মাঝে দাঁড়াতেন, ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরতেন। (নাসাঈ ১৪১ পৃঃ)

ইমাম আহমদ (র.) স্বীয় মুসনাদে অয়িল বিন হুজর থেকে উল্লেখ করেছেন তিনি (অয়িল) বলেন, আমি রসূল ﷺ -কে দেখেছি, যখন তিনি সলাতের জন্য তাকবীর বলতেন তখন হস্তদ্বয় দুইকান বরাবর উঠাতেন, তারপর রুকু করতেন। আবার যখন সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ বলতেন হস্তদ্বয় উঠাতেন এবং তাঁকে তখন সলাতে লক্ষ্য করে দেখেছি ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে ধরে রাখতেন। (মুসনাদে আহমাদ ৪র্থ খণ্ড ৩১৮ পৃঃ)

বুকের উপর হাত বাঁধার আরো কিছু সহীহ দলিল ঃ

১. সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৯৮ পৃঃ মিশরী ছাপা ১৩৫৫ হিঃ।
২. ফতহুল বারী ২য় খণ্ড ১৫২ পৃঃ ১৩১৯ হিঃ।
৩. আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ১২১ পৃঃ মিশরী ছাপা ১৩৪৮ হিঃ।
৪. মুসনাদে আহমাদ ৫ম খণ্ড ২২৬-২২৭ পৃঃ।

৫. সহীহ ইবনু খুজায়মা ১ম খণ্ড ২৩৩ পৃঃ বৈরুত ছাপা ১৩৯০ হিঃ।
৬. শরহুস সুন্নাহ ৩য় খণ্ড ৩১ পৃঃ বৈরুত ছাপা।
৭. বুলুগুল মারাম ২০ পৃঃ।
৮. নব্বী শরহে মুসলিম ১৭৩ পৃঃ।
৯. তুহফাতুল আওয়াজী শরহে তিরমিযী ২১৫ পৃঃ।
১০. মিরআত শরহে মিশকাত ১ম খণ্ড ৫৫৬ পৃঃ।
১১. মা আলিমুৎ তানজীল ৯৯৭ পৃঃ।

নাভির উপর হাত রেখে সলাত আদায় নিষেধ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোমরে হাত রেখে সলাত আদায় করতে লোকেদের নিষেধ করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী হাদীস # ১২২০)

দলিল- ইমাম আবূ দাউদ নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীস সহীহ নয় বলে মন্তব্য করেছেন- (আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ১২১ পৃঃ মিশরী ছাপা ১৩৪৮ হিঃ)। এই হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন ইসহাক আবূ শায়বা আল ওয়াসিতী রিজাল শাস্ত্রবিদদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে হাদীস গ্রহণের অযোগ্য ব্যক্তি।

উপরোক্ত সহীহ হাদীস সমূহে 'বুকের উপরে হাত বাঁধা' সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে। ইমাম শাওকানী বলেন, 'হাত বাঁধা বিষয়ে সহীহ ইবনু খুযায়মাতে ওয়ায়েল বিন হুজর (রা.) বর্ণিত হাদীসের চাইতে বিশুদ্ধতম কোন হাদীস আর নেই। উল্লেখ্য যে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখা সম্পর্কে ১৮ জন সাহাবী ও ২ জন তাবেঈ থেকে মোট ২০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এর বিপরীত কিছুই বর্ণিত হয়নি এবং এটাই জমহূর সাহাবা ও তাবেঈনের অনুসৃত পদ্ধতি।

'নাভির নীচে হাত বাঁধা' সম্পর্কে আহমাদ, আবূ দাউদ, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে চারজন সাহাবী ও দু'জন তাবেঈ থেকে যে ৪টি হাদীস ও ২টি 'আছার' বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে মুহাদ্দেছীনের বক্তব্য হল যঈফ হওয়ার কারণে এগুলির একটিও দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়'।

তাশাহহুদে আঙ্গুল নাড়ানোর দলিল

রসূল ﷺ বাম হাতের তালু বাম হাঁটুর উপর বিছিয়ে দিতেন, আর ডান হাতের সবগুলো আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে তর্জনী দ্বারা ক্বিবলার দিকে ইঙ্গিত

করতেন এবং এর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। (সহীহ মুসলিম, আবু উওয়ানা, ইবনু খুযাইমা)

আবার রসূল ﷺ কখনও উক্ত আঙ্গুল দু'টি দ্বারা গোলাকৃতি করতেন এবং আঙ্গুল উঠিয়ে নাড়ানো পূর্বক দু'আ করতেন এবং বলতেন এটি (অর্থাৎ তর্জনী) শয়তানের বিরুদ্ধে লোহা অপেক্ষা কঠিন। রসূল ﷺ -এর সাহাবাগণ (এটা পরিত্যাগের উপরে) একে অপরকে জবাবাদিহি করতেন অর্থাৎ দু'আতে আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করার বেলায় তারা এমনটি করতেন। তিনি ﷺ উভয় তাশাহহুদেই এই আমল করতেন। তিনি এক ব্যক্তিকে দুই আঙ্গুল দ্বারা দু'আ করতে দেখে বললেন ঃ একটি দিয়ে কর, একটি দিয়ে কর এবং তর্জনী দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। এই বিষয়ে আরো কিছু দলিল ঃ

১) সহীহ মুসলিম ২) আবু উওয়ানা ৩) আবু দাউদ ৪) নাসাঈ
৫) ইবনুল জারুদ ৬) ইবনু খুযাইমাহ ৭) আহমাদ ৮) বাইহাকী
৯) ইবনু আবী শাইবাহ।

ইবনুল মুলাক্কিন একে সহীহ বলেছেন (২৮/২) আঙ্গুল নাড়ানোর হাদীসের পক্ষে ইবনু আদীতে সাক্ষ্যমূলক বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে (২৮৭/১)।

তাশাহহুদে আঙ্গুল নাড়ানো নাবী ﷺ থেকে সুসাব্যস্ত সুন্নাহ। যার উপর আহমাদ ও অন্যান্য হাদীসের ইমামগণ আমল করেছেন। অতএব যেসব লোকেরা এ ধারণা পোষণ করেন যে, এটি সলাতের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ অনর্থক কাজ এবং একারণে সাব্যস্ত সুন্নাহ জানা সত্ত্বেও আঙ্গুল নাড়ায় না - উপরন্তু আরবী বাকভঙ্গির বিপরীত ব্যাখ্যার অপচেষ্টা চালায় যা ইমামদের বুঝের বিপরীত। এই সুন্নাহকে কটাক্ষ করা মানে রসূল ﷺ -কেই কটাক্ষ করার নামান্তর।

আঙ্গুল উঠিয়ে আবার নামিয়ে ফেলার কোন দলিল নেই ঃ তাশাহহুদে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লালাহা' বলার সময় মধ্যমা আঙ্গুল একবার উঠিয়ে আবার নামিয়ে ফেলা, এই ধরণের কোন সহীহ হাদীসের দলিল নেই। বরং এই ধরণের কাজ হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী হাদীস বিরোধী কাজ। এমনিভাবে যে হাদীসে আছে যে, তিনি আঙ্গুল নাড়াতেন না, এ হাদীস সনদের দিক থেকে সাব্যস্ত নয়। যেমন যঈফ আবু দাউদে (১৭৫) তদন্ত সাপেক্ষে সাব্যস্ত হয়েছে।

জামা'আতে পায়ে পা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর দলিল

জামা'আতে সলাত আদায় করাকালীন প্রত্যেক মুক্তাদীকে পরস্পরের পায়ে পা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে। দুইজন মুক্তাদীর মাঝে কিঞ্চিত ফাঁক থাকলে সেখানে শয়তান প্রবেশ করে মুসল্লীকে অসওয়াসা (প্ররোচনা) দিয়ে অন্য মনস্ক করার প্রয়াস পায়। দু'জনের মাঝে ফাঁক রাখার কোন দলিল নেই। কাতারের মাঝে ফাঁক থাকলে, রসূল ﷺ বলেছেন, "আমি দেখতে পাই শয়তান এ ফাঁক দিয়ে ছুটাছুটি করছে"। দলিল ঃ

১) সহীহ বুখারী- ১ম খণ্ড ৯৬ পৃঃ মিশরী ছাপা ১৩৫৫ হিঃ।
২) আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ১০৭ পৃঃ মিশরী ছাপা ১৩৪৮ হিঃ।
৩) সহীহ বুখারী - হাদীস নম্বর ৬৮১ (আধুনিক প্রকাশনী)
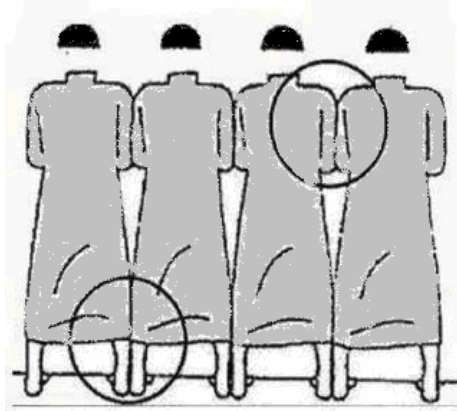
কাতারে কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানো ঃ আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে নিও। কেননা, আমি আমার পিছন হতেও তোমাদের দেখতে পাই। আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাতাম। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৭২৫)

জামা'আতে কাতার সোজা করা তা না হলে নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হবে ঃ নু'মান ইবনু বশীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই কাতার সোজা করে নিবে, তা না

হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি করে দিবেন। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৭১৭ ও সহীহ মুসলিম)

নোট ঃ তবে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে যে কাতারের মাঝে ফাঁক বন্ধ করার জন্য পায়ে পা মিলাতে গিয়ে যেন আবার কাঁধে কাঁধে ফাঁক হয়ে না যায়, অর্থাৎ উপরে এবং নীচে উভয় দিকেই ফাঁক বন্ধ করতে হবে। অনেকে একা সলাত আদায় করতে গিয়ে পা এমন ফাঁক করে দাঁড়ান যে দেখতেই অস্বাভাবিক লাগে, মনে রাখতে হবে হাদীস অনুসারে পা এতো ফাঁক করে দাঁড়ানোর নিয়ম নেই।

জোরে আমীন বলার দলিল

ইমাম হিসেবে রসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চৈঃস্বরে (জেহরী) নামাযে নিজে জোরে আমীন বলেছেন এবং মুক্তাদিদেরও বলতে আদেশ করেছেন তার প্রমাণ ঃ

১. আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত (ইবনু আব্বাস (রা.) হতেও) তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ইহুদিগণ তোমাদের প্রতি এতটা হিংসা অন্য কোন বিষয়ে করে না যতটা করে সালাম দেয়াতে এবং জোরে আমীন বলাতে; অতএব তোমরা বেশী করে জোরে আমীন বল। (ইবনু মাজাহ ৬২ পৃঃ)
২. ফতহুল বারী (শহরে বুখারী) ২য় খণ্ড ২৬২-২৬৭ পৃঃ।
৩. সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড ১৭৬ পৃঃ নওল কিশোর ছাপা ১৩৪৩ হিঃ।
৪. আবূ দাউদ ১৪২ পৃঃ কানপুর ছাপা ১৩৫০ হিঃ।
৫. তিরমিযী ৩৪ পৃঃ নওল কিশোর ছাপা ১৩১০ হিঃ।
৬. নাসায়ী ১৪৭ পৃঃ দিল্লী ছাপা ১৩১৯ হিঃ।
৭. ইবনু খুজায়মা ৬২ পৃঃ বৈরুত ছাপা।
৮. সহীহ বুখারী - হাদীস নম্বর ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮ (আধুনিক প্রকাশনী)

জেহরী সলাতের জামাআতে আমীন কখন বলতে হবে?

দলিল ঃ আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- সলাতে ইমাম যখন আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা যার আমীন ফিরিশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। ইবনু শিহাব বর্ণনা করেছেন (নামাযে) রসূলুল্লাহ ﷺ আমীন বলতেন।

১. সহীহ্ বুখারী ১ম খণ্ড ১০৮ পৃঃ। (৩৩৮ পৃঃ বাংলা আধুনিক প্রকাশনী)
২. সহীহ্ মুসলিম ১ম খণ্ড ১৭৭ পৃঃ। (নাসায়ী ১ম খণ্ড ১৪৭ পৃঃ)
৩. তিরমিযী ১ম খণ্ড ৩৪ পৃঃ। (২৯২ পৃঃ বাংলা অনুবাদ)
৪. বায়হাকী ২য় খণ্ড ৫৯ পৃঃ। (ইবনু মাজাহ ১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ)
৫. মুয়াত্তা মালেক ১ম খণ্ড ৩০ পৃঃ।

নোটঃ সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পর অনেক ইমাম সাহেব নিজেও আমিন বলেন না এবং অন্যদেরকেও বলার সুযোগ না দিয়ে সাথে সাথে অন্য একটি সূরা তিলাওয়াত করা শুরু করে দেন। এটা ঠিক নয়।

পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের রাক'আত সংখ্যা

ওয়াক্ত	সুন্নাত	ফরয	সুন্নাত	বিতর
ফজর	২	২		
যোহর	২ + ২	৪	২	
আসর		৪		
মাগরিব		৩	২	
'ইশা		৪	২	১ অথবা ৩
মোট ফরয = ১৭ রাক'আত। মোট সুন্নাত = ১২ রাক'আত				

রেফারেন্স ঃ উম্মে হাবিবাহ থেকে আনবাসাহ ইবনে সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে দিনে এবং রাতে ১২ রাক'আত সলাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে। যেমন - যোহর সলাতের আগে ৪ রাক'আত এবং পরে ২ রাক'আত, মাগরিবের সলাতের পরে ২ রাক'আত, 'ইশার সলাতের পরে ২ রাক'আত এবং ফজর সলাতের আগে ২ রাক'আত। [আত-তিরমিযী, হাদীস নং ৩৮০]।

যোহরের সুন্নাত ঃ যোহরের ফরযের আগে চার রাক'আত সুন্নাত একত্রে না পড়ে ২+২ আলাদা আলাদা করে আদায় করা উত্তম। রসূল ﷺ কখনো কোন সুন্নাত এবং নফল সলাত একত্রে চার রাক'আত আদায় করেননি, সবসময় দুই রাক'আত করে আদায় করেছেন। (মুত্তাফাক্ব আলাইহ)

ফজরের সুন্নাত ঃ যখন জামা'আতের ইকামত হবে, তখন ঐ ফরয সলাত ব্যতীত আর কোন সলাত নেই। (সহীহ মুসলিম) অতএব ফজরের জামা'আতের ইকামতের পর সুন্নাত পড়া জায়িয নয়, যা প্রচলিত আছে।

বরং জামা’আত শেষ হওয়ার পরেই সুন্নাত পড়তে হবে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

জুম্মার সলাতের সুন্নাত ঃ আমাদের দেশে প্রচলিত জুম্মার সলাতের আগে ৪ রাক’আত কাবলাল জুম্মা এবং জুম্মার পরে ৪ রাক’আত বাদাল জুম্মা বলতে কোন সুন্নাত সলাত সহীহ হাদীসে নেই। তবে রসূল ﷺ জুম্মার পড়ার পরে কখনো ৪ রাক’আত সলাত মসজিদে আদায় করেছেন এবং কখনো বাসায় গিয়ে ২ রাক’আত আদায় করেছেন। (ইবনু খুযায়মা সলাত অধ্যায় অনুচ্ছেদ-২ এবং নাসাঈ সলাত অধ্যায়-৫ অনুচ্ছেদ-৩)

বিশেষ নোট ঃ ‘কাবলাল’ মানে আগে এবং ‘বাদাল’ মানে পরে। আমাদের দেশে খুৎবার মাঝ দিয়ে ইমাম সাহেব মুসল্লিদের ৪ রাক’আত কাবলাল জুম্মা পড়ার সময় দেন যা সহীহ হাদীস সম্মত নয়।

সুন্নাত থেকে বিরত রাখার জন্য মসজিদে লালবাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা রাখা ঠিক নয়। কেননা জুম্মার খুৎবা চলাকালীন সময়েও রসূল ﷺ সাহাবাদেরকে আদেশ করেছেন দুই রাক’আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ সলাত আদায় করে নিতে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

অন্যান্য সলাতে ইক্বামত হয়ে গেলেও সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামা’আতে যোগ দিলে ঐ ব্যক্তি পূর্ণ সলাতের নেকী পেয়ে যায়। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের দলিল

সলাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে আগে ঘুমিয়ে নেয়া ঃ আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী ﷺ বলেছেন, কেউ যদি সলাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, সে যেন ততক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়, যতক্ষণ না সে কী পড়ছে, তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। (সহীহ বুখারী হাদীস # ২১৩)

হায়েযের রক্ত ধৌত করা ঃ আসমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নাবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন ঃ (হে আল্লাহর রসূল!) বলুন, আমাদের কারো কাপড়ে হায়যের রক্ত লেগে গেলে সে কী করবে? তিনি বললেন ঃ সে তা ঘষে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে

রগড়াবে এবং ভাল করে ধুয়ে ফেলবে। অতঃপর সেই কাপড়ে সলাত আদায় করবে। (সহীহ্ বুখারী হাদীস # ২২৭ ও সহীহ্ মুসলিম)

পরিপূর্ণভাবে সাজদাহ না করা ঃ হুযাইফাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার রুকু-সাজদাহ পুরোপুরি আদায় করছিল না। সে যখন সলাত শেষ করলো তখন তাকে হুযাইফাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ তোমার সলাত ঠিক হয়নি। রাবী বলেন ঃ আমার মনে হয় তিনি (হুযাইফাহ) এ কথাও বলেছেন, (এ অবস্থায়) তোমার মৃত্যু হলে তা মুহাম্মাদ ﷺ -এর তরীকার বাইরে হবে। (সহীহ্ বুখারী হাদীস # ৩৮৯)

সুন্নাত সলাত ঘরে আদায় করা উত্তম ঃ ইবনু 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের ঘরেও কিছু সলাত আদায় করবে এবং ঘরকে তোমরা কবর বানিয়ে নিও না। (সহীহ্ বুখারী # ৪৩২)

মাসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাক'আত সলাত আদায় করা ঃ আবূ কাতাদাহ সালামী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সলাত আদায় করে নেয়। (সহীহ্ বুখারী হাদীস # ৪৪৪)

জুম্মার খুৎবা চলাকালীন সময়ও মসজিদে ঢুকে এই দুই রাক'আত সলাত আদায় করে নিয়ে তারপর বসে খুৎবা শুনতে হবে। এটা রসূল ﷺ -এর নির্দেশ।

সলাতে নিজের ঘাড়ে কোন ছোট বাচ্চাকে তুলে নেয়া ঃ আবূ কাতাদাহ আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর মেয়ে যয়নবের গর্ভজাত ও আবুল আস ইবনু রাবী'আহ ইবনু 'আবদ শামস (রহ.)-এর ঔরসজাত কন্যা উমামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে কাঁধে নিয়ে সলাত আদায় করতেন। তিনি যখন সাজদায় যেতেন তখন তাকে রেখে দিতেন আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে তুলে নিতেন। (সহীহ্ বুখারী হাদীস # ৫১৬ ও সহীহ্ মুসলিম)

পাঁচ ওয়াক্তের সলাত (গুনাহসমূহের) কাফ্ফারা ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, "বলতো যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোন ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তার দেহে কোনোরূপ ময়লা বাকী থাকবে

না। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন ঃ এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা (বান্দার) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৫২৮ ও সহীহ মুসলিম)

সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে আসর সলাত এবং সুর্য উদয়ের পূর্ব মুহূর্তে ফজরের সলাত আদায় ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার পুর্বে 'আসরের সলাতের এক সাজদাহ পায়, তাহলে সে যেন সলাত পূর্ণ করে নেয়। আর যদি সূর্য উদিত হবার পূর্বে ফজর সলাতের এক সাজদাহ পায়, তাহলে সে যেন সলাত পূর্ণ করে নেয়। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৫৫৬ ও সহীহ মুসলিম)

নোট ঃ শুধু অনিচ্ছাকৃত দেরী হয়ে যাওয়া ফরয সলাত আদায় করা যাবে।

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সলাত আদায়ের উদ্যোগ না নেয়া ঃ ইবনু 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সলাত আদায়ের উদ্যোগ না নেয়। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৫৮৫)

নোট ঃ শুধু অনিচ্ছাকৃত দেরী হয়ে যাওয়া ফরয সলাত আদায় করা যাবে।

ফজরের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত এবং 'আসরের পর সূর্য ডুবা পর্যন্ত সলাত নিষেধ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ দু' সময়ে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ফজরের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য ডুবা পর্যন্ত। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৫৮৮)

নোট ঃ শুধু অনিচ্ছাকৃত দেরী হয়ে যাওয়া ফরয সলাত আদায় করা যাবে।

'ইশার সলাতের পূর্বে ঘুমানো অপছন্দনীয় ঃ আবূ বারযাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ 'ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন। (সহীহ বুখারী # ৫৬৮)

সলাতের সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা দেয়া ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন ঃ যখন সলাতের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছেড়ে পলায়ন করে, যাতে সে আযানের শব্দ না শোনে। যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন সে

আবার ফিরে আসে। আবার যখন সলাতের জন্য ইক্বামাত বলা হয়, তখন আবার দূরে সরে যায়। ইক্বামাত শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে এসে লোকের মনে কুমন্ত্রণা দেয় এবং বলে এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর, বিস্মৃত বিষয়গুলো সে মনে করিয়ে দেয়। এভাবে লোকটি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সে কয় রাক'আত সলাত আদায় করেছে তা মনে করতে পারে না। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৬০৮ ও সহীহ মুসলিম)

ফজরের আযান ও ইক্বামাতের মাঝে দু'রাক'আত সলাত ঃ আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ ফজরের আযান ও ইক্বামাতের মাঝে দু'রাক'আত সলাত সংক্ষেপে আদায় করতেন। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৬৯১ ও সহীহ মুসলিম)

প্রত্যেক আযান ও ইক্বামাতের মাঝে সলাত রয়েছে ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্‌ফাল মুযানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক আযান ও ইক্বামাতের মাঝে সলাত রয়েছে। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৬২৪ ও সহীহ মুসলিম) - [দুই রাক'আত সুন্নাত]

জামা'আত ধরার জন্য দৌঁড়ে না আসা, বরং ধীরস্থিরভাবে আসা ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা ইক্বামাত শুনতে পাবে, তখন সলাতের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৬৩৬ ও সহীহ মুসলিম)

জামা'আতে সলাত আদায় করার মর্যাদা সাতাশ গুণ ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন ঃ জামা'আতে সলাতের ফাযীলত একাকী আদায়কৃত সলাত অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশী। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৬৪৫ ও সহীহ মুসলিম)

যে যত অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে সলাতে আসে, তার তত অধিক পুণ্য ঃ আবূ মূসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ (মসজিদ হতে) যে যত অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে সলাতে আসে, তার তত অধিক পুণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে সলাত আদায় করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তার পুণ্য সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক, যে

একাকী সলাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৬৫১ ও সহীহ মুসলিম)

খাবার উপস্থিত হবার পর যদি সলাতের ইক্বামাত হয় ঃ আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন রাতের খাবার উপস্থিত করা হয়, আর সে সময় সলাতের ইক্বামাত হয়ে যায়, তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নাও। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৬৭১ ও সহীহ মুসলিম)

জামা'আতে সলাতের সময় ইমামের পুর্বে মাথা উঠানো গুনাহ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তখন সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন, তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দেবেন। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৬৯১ ও সহীহ মুসলিম)

জামা'আতে সলাতে ইমামের ভুল-ত্রুটির দায় দায়িত্ব তার নিজের ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন ঃ তারা তোমাদের ইমামতি করে। যদি তারা সঠিকভাবে আদায় করে তাহলে তার সওয়াব তোমরা পাবে। আর যদি তারা ভুল করে, তাহলে তোমাদের জন্য সওয়াব আছে, আর ভুলত্রুটির দায়িত্ব তাদের (ইমামের) উপরই বর্তাবে। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৬৯৪)

একাকী সলাত আদায় করলে ইচ্ছানুযায়ী দীর্ঘায়িত করতে পারে ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করে, তখন যেন সে সংক্ষেপে করে। কেননা, তাদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ রয়েছে। আর যদি কেউ একাকী সলাত আদায় করে, তখন ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৭০৩ ও সহীহ মুসলিম)

সলাতে এদিক ওদিক তাকান নিষেধ ঃ আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ -কে সলাতে এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ এটা এক ধরনের ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার সলাত হতে অংশ বিশেষ ছিনিয়ে নেয়। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৭৫১)

ফজর ও মাগরিবে দু'আ কুনূত পড়া ঃ আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে] কুনূত ফজর ও মাগরিবের সলাতে পড়া হত। (সহীহ্ বুখারী হাদীস # ৭৯৮)

রুকু' থেকে উঠে এবং দু' সাজদার মাঝে যথেষ্ট সময় দেয়া ঃ বারাআ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ -এর রুকু' ও সাজদাহ এবং তিনি যখন রুকু' হতে মাথা উঠাতেন, এবং দু' সাজদার মধ্যবর্তী সময় সবই প্রায় সমান হত। (সহীহ্ বুখারী হাদীস # ৮০১)

কাঁচা রসুন, পিঁয়াজ ও দুর্গন্ধযুক্ত মসলা খেয়ে সলাতে না আসা ঃ ইবনু 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ খায়বারের যুদ্ধের সময় বলেন, যে ব্যক্তি এই জাতীয় বৃক্ষ হতে অর্থাৎ কাঁচা রসুন খায় সে যেন অবশ্যই আমাদের মাসজিদে না আসে। (সহীহ্ বুখারী হাদীস # ৮৫৪ ও সহীহ্ মুসলিম)

জুমু'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব (পুরুষদের জন্য) ঃ আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর দিন প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত (পুরুষদের) গোসল করা ওয়াজিব। (সহীহ্ বুখারী হাদীস # ৮৫৮ ও সহীহ্ মুসলিম)

'ঈদুল ফিত্‌রের দিন বের হবার আগে খাবার খাওয়া ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ 'ঈদুল ফিত্‌রের দিন কিছু খেজুর না খেয়ে বের হতেন না। অপর এক বর্ণনায় আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তা বিজোড় সংখ্যায় খেতেন। (সহীহ্ বুখারী হাদীস # ৯৫৩)

সফরে যুহর-'আসর ও মাগরিব-'ইশা একত্রে আদায় করা ঃ ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরে দ্রুত চলার সময় আল্লাহর রসূল ﷺ যুহর ও 'আসরের সলাত একত্রে আদায় করতেন আর মাগরিব 'ইশা একত্রে আদায় করতেন। (সহীহ্ বুখারী হাদীস # ১১০৭)

তাহাজ্জুদ ও বিতর সলাত ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! রাতের সলাতের পদ্ধতি কী? তিনি বললেন ঃ দু' দু' রাক'আত করে। আর ফজর হয়ে

যাওয়ার আশঙ্কা করলে এক রাক'আত মিলিয়ে বিতর করে নিবে। (সহীহ বুখারী হাদীস # ১১৩৭)

সুন্নাত সলাত ঃ ইবনু 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ -এর সঙ্গে যুহরের পূর্বে দু'রাক'আত, যুহরের পর দু'রাক'আত, মাগরিবের পর দু'রাক'আত, 'ইশার পর দু'রাক'আত এবং জুমু'আহর পর দু'রাক'আত সলাত আদায় করেছি। তবে মাগরিব ও 'ইশার পরের সলাত তিনি তাঁর ঘরে আদায় করতেন। (সহীহ বুখারী # ১১৭২)

আধুনিক প্রকাশনীর সহীহ আল বুখারী ১ম খণ্ড ৭ম সংস্করণে ছাপানো

- ওযূ করার নিয়ম। (গর্দান মাসেহ হাদীসে নেই, এটা বিদ'আত)- সহীহ বুখারী হাদীস # ১৬০, ১৮৬, ১৯৩
- মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাক'আত সলাত আদায় করার হুকুম - সহীহ বুখারী হাদীস # ৪২৫, ১০৮৯, ১০৯২
- ইকামতের বাক্যগুলো দু'বারের স্থলে একবার করে বলতে হবে - সহীহ বুখারী হাদীস # ৫৬৮, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২
- জুম্মার খুৎবার সময় মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগে তাহিয়্যাতুল মসজিদ সুন্নত আদায় করতে হবে- সহীহ বুখারী হাদীস # ৮৭৭, ৮৭৮, ১০৯২
- মাগরিবের আযান ও সলাতের মধ্যে সংক্ষেপে দু'রাক'আত আদায় করা- সহীহ বুখারী হাদীস # ৫৮৮, ৫৮৯, ১১০৮
- সালাম ফেরার পর ইমাম মুক্তাদীদের দিকে ঘুরে বসবেন - সহীহ বুখারী হাদীস # ৭৯৭ ও (অনুচ্ছেদ)

সম্মিলিত মুনাজাত না করার দলিল

'মুনাজাত' অর্থ 'পরস্পরে গোপনে কথা বলা' রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন সলাতে রত থাকে, তখন সে তার প্রভুর সাথে 'মুনাজাত' করে অর্থাৎ গোপনে কথা বলে'। [সহীহ বুখারী, আহমাদ]

তাই সলাত কোন ধ্যান (Meditation) নয়, বরং আল্লাহর কাছে বান্দার সরাসরি ক্ষমা চাওয়া ও প্রার্থনা নিবেদনের নাম। দুনিয়ার কাউকে যা বলা যায় না, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে বান্দা তাই-ই বলে। আল্লাহ স্বীয় বান্দার চোখের ভাষা বুঝেন ও হৃদয়ের কান্না শোনেন।

আল্লাহ বলেন, *'তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব'। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬০)*। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'দু'আ হ'ল ইবাদত'। (আহমাদ, আবূ দাউদ)। অতএব দু'আর পদ্ধতি সুন্নাত মোতাবেক হতে হবে। রসূলুল্লাহ ﷺ কোন পদ্ধতিতে দু'আ করেছেন, আমাদেরকে সেটা দেখতে হবে। তিনি যেভাবে প্রার্থনা করেছেন, আমাদেরকে সেভাবেই প্রার্থনা করতে হবে। তাঁর রেখে যাওয়া পদ্ধতি ছেড়ে অন্য পদ্ধতিতে দু'আ করলে তা কবুল হওয়ার বদলে গুনাহ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী থাকবে।

সূরা আরাফের ৫৫-৫৬ নং আয়াতে সম্মিলিত মুনাজাত না করা এবং দু'আর গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন তা আমরা কুরআনের তাফসীর দেখতে পারি।

রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের মধ্যেই দু'আ করেছেন। তাকবীরে তাহরীমার পর থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত সময়কাল হল সলাতের সময়কাল। সলাতের এই নিরিবিলি সময়ে বান্দা স্বীয় প্রভুর সাথে 'মুনাজাত' করে। 'সলাত' অর্থ দু'আ, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। 'সানা' হতে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত সলাতের সর্বত্র কেবল দু'আ আর দু'আ। অর্থ বুঝে পড়লে উক্ত দু'আগুলির বাইরে বান্দার আর তেমন কিছুই চাওয়ার থাকে না। তবুও সালাম ফিরানোর পরে একাকী দু'আ করার প্রশস্ত সুযোগ রয়েছে। তখন ইচ্ছামত যেকোন দু'আ করা যায়।

বিশেষ নোট ঃ তবে জামা'আতে ফরয সলাতের পর সালাম ফিরানোর পরপরই ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত এবং ইমাম সাহেবের সাথে সুর মিলিয়ে 'আমীন' 'আমীন' বলা এবং মুনাজাত করতেই হবে এটা জরুরী মনে করা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত। এই বিদ'আতটি প্রতিষ্ঠা হওয়ার কারণে রসূল ﷺ -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ মুসলিম সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আর তা হচ্ছে সালাম ফিরানোর পর রসূল ﷺ -এর দেয়া কিছু তাসবীহ পাঠ করা। সালাম ফিরানোর পরপরই ইমাম সাহেব মুসল্লীদের নিয়ে সম্মিলিত মুনাজাত করার কারণে অন্যেরাও ঐসকল তাসবীহ পাঠ করার সুযোগ পাচ্ছেন না।

কাযা সলাত এবং উমরী কাযা বলতে কিছু নেই

আমাদের সমাজে প্রচলিত কাযা বলতে বুঝায় সলাত ওয়াক্তের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না পড়ে অন্য সময়ে তা পড়ে নেয়া। আর উমরী কাযা বলতে বুঝায় বিগত জীবনে যেসকল সলাত পড়া হয়নি তা আদায় করা।

কুরআন ও সুন্নায় কাযা সলাত ও উমরী কাযা বলতে কিছু নেই। অর্থাৎ সলাতের কোন কাযা হয় না। রসূল ﷺ কোন দিন কাযা সলাত আদায় করেননি, যদি করতেন তাহলে তা অবশ্যই সহীহ হাদীসগুলোতে তার প্রমাণ পাওয়া যেতো। সলাত ছেড়ে দেয়ার তো কোন way-ই নেই তার উপর আবার কাযা কোথা থেকে আসবে? নিম্নের সহীহ হাদীস দু'টি দেখি ঃ

- মু'মিন ও কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত পরিত্যাগ করা। (সহীহ্ মুসলিম)
- আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মাঝে চুক্তি হচ্ছে সলাতের। অতএব যে ব্যক্তি সলাত ত্যাগ করল সে কুফরী করল। (আবূ দাউদ, আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

দলিল ঃ রসূল ﷺ -এর জীবনীতে দেখা যায় যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে যখন সলাতের ওয়াক্ত হয়েছে তখন সাহাবীদেরকে দুই গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে, একদল যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন এবং অপর দল জামা'আতে সলাত আদায় করেছেন। যদি কাযা সলাত পড়ার হুকুমই থাকতো তাহলে তারা ঐ যুদ্ধের ময়দানে সলাত না আদায় করে পরে এক সময় আদায় করে নিতে পারতেন। আবার দেখা গেছে যে রসূল ﷺ উটের পিঠে চড়ে কোথাও যাচ্ছেন পথিমধ্যে সলাতের ওয়াক্ত হয়েছে এবং উটের পিঠ থেকে নামার কোন উপায় নেই তখন তিনি ঐ অবস্থায়ই সলাত আদায় করে নিয়েছেন। যদি কাযা সলাতের হুকুম থাকতো তাহলে তিনি গন্তব্যে পৌঁছেই কাযা সলাত আদায় করে নিতে পারতেন, অতো কষ্ট করে উটের পিঠে সলাত আদায় করতেন না। আরো বিস্তারিত জানার জন্য সহীহ মুসলিম-এর সলাতের অধ্যায় দেখা যেতে পারে।

তাই কোন অবস্থায়ই সলাতের কোন প্রকার কাযা নেই। হয় আমাকে সময়ের মধ্যে সলাত আদায় করে নিতে হবে অথবা সলাত মাফ অর্থাৎ সলাত আদায় করতে হবে না। তিন অবস্থায় সলাত মাফ অর্থাৎ সলাত আদায় করতে হবে না এবং এর কোন কাফ্ফারাও নেই। ১) পাগল হয়ে

গেলে ২) অজ্ঞান অবস্থায় থাকলে এবং ৩) মহিলাদের Menstrual period চলাকালীন সময়ে। এর বাইরে প্রতিটি মুসলিমের সকল সময়ে সলাত আদায় করতে হবে যখন থেকে তার উপর সলাত ফরয হয়েছে।

অনিচ্ছাকৃত ভুল

আমরা জানলাম যে ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত ছাড়ার কোন উপায় নেই, এই বলে যে, এই সলাতটা পরে আদায় করে নিব, তা হবে না। যদি এমন হয় যে আমার অজান্তে কোন এক ওয়াক্ত সলাতের সময় পার হয়ে গেছে এবং আমি খেয়ালই করিনি যে কখন যে সময় চলে গেছে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে ছাড়িনি তখন আমি কী করবো? আমার এই ভুলের জন্য আমি অবশ্যই আল্লাহর কাছে স্পেশাল ক্ষমা চাইবো এবং যখনই মনে হবে যে আমার ওয়াক্ত পার হয়ে গেছে ঐ মুহূর্তেই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সলাতটা আদায় করে নিতে হবে। (সহীহ মুসলিম) যেমন আমি হঠাৎ একদিন ফজরে ঘুম থেকে উঠতে পারলাম না, জেগে দেখলাম সূর্য উঠে গেছে তখন সাথে সাথে ঐ মুহূর্তেই ওযূ করে ফজরের সলাত আদায় করে নিতে হবে এবং আল্লাহর কাছে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। তবে এই ধরণের ভুল মাঝে মধ্যেই করা যাবে না বা প্র্যাক্টিসে নিয়ে আসা যাবে না। এই ধরনের ভুল যেন আর না হয় সেদিকে সতর্ক হতে হবে। কারণ আমার অন্তরের নিয়ত কিন্তু মহান আল্লাহ জানেন।

দলিল ১ ঃ আমরা যদি সহীহ মুসলিমের সলাতের অধ্যায় দেখি তাহলে দেখতে পাব যে রসূল ﷺ -এর জীবনে একবার এরকম অনিচ্ছাকৃত ঘটনা ঘটেছিল। তিনি একদিন ফজরে উঠতে পারেননি এবং উঠে দেখেন সূর্য উঠে গেছে অর্থাৎ তিনি যাকে ফজরে ঘুম থেকে সবাইকে ডেকে তুলার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনিও হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং সময়মতো সবাইকে জাগাতে পারেননি। সূর্য উদয়ের পরে যখন রসূল ﷺ ঘুম থেকে জেগেছেন তখন তিনি ﷺ ২ রাক'আত সুন্নাহ এবং দুই রাক'আত ফরয সলাত আদায় করে নিয়েছিলেন। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

দলিল ২ ঃ রসূল ﷺ -এর সময়ে একবার যুদ্ধের মধ্যে এমন অবস্থা হয়েছিল যে কোনভাবেই কেউ সলাত আদায় করতে পারছিলেন না এবং ওয়াক্ত পার হয়ে গিয়েছিল। সহীহ হাদীসটি হচ্ছে ঃ খন্দকের যুদ্ধের দিন রসূল ﷺ ও সাহাবীগণ মাগরিবের পরে যোহর থেকে ইশা পর্যন্ত চার

ওয়াক্তের ক্বাযা সলাত এক আযান ও চারটি পৃথক ইকামতে পরপর জামা'আত সহকারে আদায় করেন। (নাসাঈ)

ভুল ধারণার অবসান

আমাদের দেশে একটা ভুল নিয়ম প্রচলিত আছে আর তা হচ্ছে উমরী কাযা। অর্থাৎ সারা জীবনে যে সকল সলাত আদায় করা হয়নি তা এক সাথে আদায় করে নেয়া বা মক্কা-মদীনায় গিয়ে আদায় করা। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। উমরী কাযা বলতে কুরআন ও সুন্নাহয় কিছু নেই। আমি আমার জীবনে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন সলাত না আদায় করে থাকি বা কোন কবিরাহ গুনাহ করে থাকি তাহলে তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। উমরী কাযা বলে কোন বিদ'আত তো চালু করতে পারি না অর্থাৎ একটা ভুল সংশোধন করতে গিয়ে আরেকটা নতুন ভুলের জন্ম দিতে পারি না। আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখতে পারি Youtube: Matiur Rahman Madani.

তাসবীহ ছড়ার ব্যবহার এবং আংগুলে তাসবীহ পাঠ

বাংলাদেশে নারীপুরুষ সকলেই আমরা সলাতের পর অথবা দিনেরাতে কোন নফল ইবাদত করার উদ্দেশ্যে নানা দু'আ বহুবার পড়ার সুবিধার জন্যে তাসবীহ ছড়া ব্যবহার করে থাকি, আমাদের আংগুলের সাহায্য নিই না। আল্লাহর যিকরের উদ্দেশ্যে তাসবীহ ছড়ার ব্যবহার আমাদের মাঝে এতোই ব্যাপক যে মনে হয় যেন এটা ইসলামের শরীয়তসম্মত একটা পদ্ধতি। অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে তিনি নিজে কখনো তাসবীহ ছড়া ব্যবহার করেননি, করতে নির্দেশও দেননি -- তিনি তাসবীহ পড়ার জন্যে নিজের হাতের আঙ্গুল ব্যবহার করতেন। তাই সওয়াবের উদ্দেশ্যে তাসবীহ ছড়া ব্যবহার করা বা সর্বদা সওয়াবের উদ্দেশ্যে হাতে তাসবীহ ছড়া রাখা বিদ'আত। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে এই তাসবীহ ছড়ার ব্যবহার এসেছে মূলত খ্রীষ্টানদের থেকে এবং তারাই এই তাসবীহ ছড়া ব্যবহার করে থাকে। উপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে খ্রীষ্টানদের ব্যবহারের তাসবীহ

ছড়া। তবে ক্যালকুলেটর হিসেবে (গণনা কাজের সুবিধার্থে) তাসবীহ ছড়া ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ করে বৃদ্ধরা বা অসুস্থরা হাতের আঙুলে যদি হিসাব রাখতে না পারেন তাহলে তাসবীহ ছড়া ব্যবহার দূষণীয় নয়।

রসূলুল্লাহ ﷺ তাসবীহ ও তাহলীল হাতের আঙ্গুল দ্বারা করার আদেশ দিয়ে বলেছেন, এগুলো দায়িত্বশীল ভাষা প্রকাশক। (আবু দাউদ)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত। নাবী কারীম ﷺ ডান হাতে তাসবীহ পাঠ করতেন। (আবু দাউদ)

তবে দু'হাতের আংগুলেও তাসবীহ পাঠ করা যায়। কিছু হাদীসে হাতের আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ পাঠের কথা উল্লেখ আছে। হাত বলতে দু'হাতকে বুঝানো হয়।

তাসবীহ ছড়া নিয়ে জাল ও দুর্বল হাদীস

তাসবীহর ছড়ার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো জাল ও দুর্বল। দাইলামী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ 'তাসবীহর ছড়া কতইনা উত্তম স্মরণকারী!' মোহাদ্দেসীনে কিরাম এটাকে জাল হাদীস বলেছেন।

'সফিয়াহ (রা.) বলেন, নাবী কারীম ﷺ আমার কাছে প্রবেশ করেন। তখন আমার সামনে ছিল ৪ হাজার দানা ...। (তিরমিযী) হাদীসের সনদ দুর্বল।

আযান ও ইকামাত

আযানের সাথে সাথে আমরা কী বলব?

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন ঃ মুয়াজ্জিন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বললে তোমাদের কোন ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে তার উত্তরে বলে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, মুয়াজ্জিন আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে তার উত্তরে সেও বলে, আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ; এরপর মুয়াজ্জিন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ বললে তার উত্তরে সে বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ; এরপর মুয়াজ্জিন হাইয়্যা আলাছ ছলাহ-বললে তার উত্তরে সে বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ; এরপর মুয়াজ্জিন হাইয়্যা আলাল ফালাহ বললে জবাবে সে বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা

বিল্লাহ; এরপর মুয়াজ্জিন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার-বললে জবাবে সে বলে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; এরপর মুয়াজ্জিন বলে, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-এর জবাবে সে বলে, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ আযানের এ প্রতিউত্তর দেয়ার কারণে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ মুসলিম)

আযানের দু'আ

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ

وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ

আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ-দা'ওয়াতিত তা-ম্মাতি ওয়াস সলা-তিল ক্ব-'ইমাতি 'আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা ওয়াব 'আসহু মাক্ব-মাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়া 'আদতাহ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও সলাতের প্রতিষ্ঠিত মালিক, মুহাম্মাদ ﷺ -কে ওয়াসীলা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন এবং তাঁকে সে মাকামে মাহমুদে পৌঁছিয়ে দিন যার অঙ্গীকার আপনি করেছেন। (সহীহ বুখারী)

ইকামাতের নিয়ম

আযানের মতো ইকামাতের শব্দগুলো দুই দুই বার করে বলা যাবে না। ইকামাতের শব্দগুলো একবার একবার করে বলতে হবে। শুধু 'কাদকামাতিস' সলাহ দুইবার করে বলতে হবে। (আবূ দাউদ) যেমন ঃ

আল্লাহু আকবার (১বার)
আল্লাহু আকবার (১বার)
আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (১বার)
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ (১বার)
হাইয়্যা আলাস সলাহ (১বার)
হাইয়্যা আলাল ফালাহ (১বার)
কাদকামাতিস সলাহ (২বার)
আল্লাহু আকবার (১বার)
আল্লাহু আকবার (১বার)
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (১বার)

আযানের জওয়াবে বাড়তি বিষয়সমূহ পরিত্যাজ্য

আযানের জওয়াবে কয়েকটি বিষয় বাড়তিভাবে চালু হয়েছে, যা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ কঠোরভাবে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যারোপ করল, সে জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল'। সাহাবী বারা বিন আযেব (রা.) রাতে শয়নকালে রসূল ﷺ -এর শিখানো একটি দু'আয়ে 'আ-মানতু বি নাবিইয়িকাল্লাযী আরসালতা'-এর স্থলে 'বি রসূলিকা' বলেছিলেন। তাতেই রসূল ﷺ রেগে ওঠেন ও তার বুকে ধাক্কা দিয়ে 'বি নাবিইয়িকা' বলার তাকীদ করেন। অথচ সেখানে অর্থের কোন তারতম্য ছিল না। প্রকাশ থাকে যে, আযান একটি ইবাদত। এতে কোনরূপ কমবেশী করা জায়িয নয়। তবুও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য যোগ হয়েছে। আযানের জওয়াবে প্রচলিত বাড়তি বিষয়গুলো অবশ্যই পরিত্যাজ্য, যা নিম্নরূপ ঃ

(১) বায়হাক্বীতে (১ম খণ্ড ৪১০ পৃ:) বর্ণিত আযানের দু'আর শুরুতে 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকা বি হাকক্বি হা-যিহিদ দাওয়াতি' (২) একই হাদীসের শেষে বর্ণিত 'ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আ-দ (৩) ইমাম ত্বাহাভীর 'শারহু মা'আনিল আছার'-য়ে বর্ণিত 'আ-তি সাইয়িদানা মুহাম্মাদান' (৪) ইবনুস সুন্নীর 'ফী 'আমালিল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ'তি 'ওয়াদ্দারাজাতার রাফী'আতা' (৫) রাফেঈ প্রণীত 'আল-মুহার্রির-য়ে আযানের দু'আর শেষে বর্ণিত 'ইয়া আরহামার রা-হিমীন। (৬) আযান বা ইক্বামতে 'আশহাদু আন্না সাইয়িদানা মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ' বলা। বর্তমানে রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে প্রচারিত আযানের দু'আয়ে 'ওয়ারঝুক্বনা শাফা'আতাহূ ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ' বাক্যটি যোগ করা হচ্ছে। যার কোন শারঈ ভিত্তি জানা যায় না। এছাড়া ওয়াল ফাযীলাতা-ও পরে ওয়াদ্দারাজাতার রাফী'আতা এবং শেষে ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আ-দ যোগ করা হয়, যা পরিত্যাজ্য।

আযানের সময় আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখ রগড়ানো বিদ'আত

আযান ও ইক্বামতের সময় 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' শুনে বিশেষ দু'আ সহ আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখ রগড়ানো, আযান শেষে দুই হাত তুলে আযানের দু'আ পড়া কিংবা উচ্চৈঃস্বরে তা পাঠ করা ও মুখে হাত মোছা ইত্যাদির শারঈ কোন ভিত্তি নেই। এই সবই সুস্পষ্ট বিদ'আত।

৫ম অধ্যায়
অন্যান্য সলাত

জুম'আর সলাত

১ম হিজরীতে মদীনায় হিজরতের সময় কূবা ও মদীনার মধ্যবর্তী বনু সালেম গোত্রে সর্বপ্রথম রসূল ﷺ জুম'আর সলাত আদায় করেন (মির'আদ ২/২৮৮)। শহরে হোক কিংবা গ্রামে হোক প্রত্যেক জ্ঞানবান বয়স্ক মুসলিমের উপর জুম'আর সলাত আদায় করা ফরয (জুম'আ ঃ ৯)। গোলাম, রোগী, মুসাফির, শিশু ও মহিলাদের উপর জুম'আ ফরয নয়। তবে মহিলাগণ জুম'আর সলাতে উপস্থিত হলে তাদেরকে বারণ করা যাবে না (সহীহ মুসলিম, সহীহ বুখারী, আবুদাউদ)।

জুম'আর ফযীলত

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, 'আমরা দুনিয়ায় আগমনের দিক দিয়ে সর্বশেষ। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে সবার পূর্বে। তবে তাদের কিতাব দেয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে এবং আমাদেরকে দেয়া হয়েছে তাদের পরে। অতঃপর এই দিন (শুক্রবার) সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে এই শুক্রবার সম্পর্কে হিদায়াত দান করেছেন। পরের দিন ইয়াহুদীদের, তার পরের দিন নাসারাদের' (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)। মহান আল্লাহ এই দিনে দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন এবং এই দিনে তিনি দুনিয়া ধ্বংস করবেন। এই দিনে আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। কুরআন এই দিনে অবতীর্ণ হয়। তাই এই দিনটি অতি সম্মানিত। এ দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যে সময়ে বান্দা তার প্রতিপালকের নিকট কিছু চাইলে তা ফিরিয়ে দেয়া হয় না। অর্থাৎ তা দান করেন। অতএব জুম'আর দিন দু'আ, দুরূদ, তাসবীহ, তিলাওয়াত ও ইবাদতে কাটিয়ে দেয়া উচিত। এ দিন খত্বীব স্বীয় খুৎবায় এবং ইমাম ও মুক্তাদীগণ সাজদায় ও শেষ বৈঠকে তাশাহুদ ও দুরূদের পর সালামের পূর্বে আল্লাহর নিকট প্রাণ খুলে দু'আ করবেন। কেননা, রসূল ﷺ এ সময় বেশী বেশী দু'আ করতেন (সহীহ মুসলিম)।

আবু বুরদা ইবনু আবু মূসা (রা.) বলেন, 'আমি আমার পিতা আবু মূসাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি শুনেছি রসূল ﷺ জুম'আর দিনের সেই সময়টা সম্পর্কে (যে সময় বান্দা তার প্রতিপালকের নিকট যা চাইবে তাই পাবে) বলেন, উহা ইমামের মিম্বরে বসা হতে সলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত (সহীহ মুসলিম)। জুম'আর দিন সুন্দরভাবে গোসল করে সাধ্যমত উত্তম

পোশাক পরে ও সুগন্ধি লাগিয়ে আগে আগে মসজিদে যাবে (সহীহ বুখারী)।

অন্য এক বর্ণনায় আছে রসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে গোসল করে সাধ্যনুযায়ী উত্তম পোশাক পরিধান করে, তেল মালিশ করে অথবা সুগন্ধি থাকলে তা লাগিয়ে মসজিদে যাবে এবং দুই ব্যক্তির মাঝে ফাঁকা রাখবে না। তারপর ইমাম যখন খুৎবা দিবেন তখন চুপ করে খুৎবা শুনবে, নিশ্চয়ই তার এক জুম'আ হতে অপর জুম'আ পর্যন্ত সমস্ত সগীরা গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়। (সহীহ বুখারী)

জুম'আর দিন যে যত আগে মসজিদে যাবে সে তত বেশী নেকীর অধিকারী হবে। রসূল ﷺ বলেন, 'যখন জুম'আর দিন আসে ফিরিশতাগণ মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়ায় এবং যে যত আগে আসে তার তত বেশী নেকী লিখতে থাকেন। এদিন যে সর্বপ্রথম মসজিদে আসে তার জন্য একটি উট কুরবানী করার সমপরিমাণ সওয়াব লিখা হয়। এরপর যে আসে তার জন্য একটি গরু কুরবানী করার সমপরিমাণ সওয়াব লিখা হয়। তারপর আগমনকারীর জন্য একটি দুম্বা, এরপর আগমনকারীর জন্য একটি মুরগী, তারপর আগমনকারীর জন্য একটি ডিম দান করার সওয়াব লিখা হয়। অনুরূপভাবে আগমনকারীরা ছায়া পেতে থাকেন। যখন ইমাম খুৎবার জন্য বের হন ফিরিশতাগণ তখন খাতা বন্ধ করেন এবং খুৎবা শুনতে থাকেন'। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

খুৎবা চলাকালীন সময়ে চুপ করে (খুৎবা) শোনা জরুরী এবং কথা বলা হারাম। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

এমনকি কেউ যদি কথা বলে তাকেও চুপ কর বলা ঠিক নয়। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

জুম'আর খুৎবা

জুম'আর জন্য দু'টি খুৎবা দেয়া সুন্নাত। দুই খুৎবার মাঝখানে (ইমামকে) বসতে হয় (আর-রওযা ১/৩৪৫ পৃঃ)। ইমাম মিম্বরে বসার সময় মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিবেন। আবুবকর ও ওমর (রা.) নিয়মিত এটি করতেন। খত্বীব সাহেব হাতে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিবেন। প্রথম খুৎবায় হামদ, সানা ও ক্বিরাআত ছাড়াও সকলকে নছীহত করবেন। অতঃপর বসবেন।

দ্বিতীয় খুৎবায় হামদ, দুরূদ সহ সকল মুসলিমের জন্য দু'আ করবেন। (ইবনু মাজাহ, আহমাদ, ত্বাবারানী)

ইমাম শাফিঈ (রহ.) হামদ, দুরূদ ও নছীহত এই তিনটি বিষয়কে খুৎবার জন্য ওয়াজিব বলেছেন। এতদ্ব্যতীত সূরা ক্বাফ-এর প্রথমাংশ বা অন্য কিছু আয়াত তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব (মির'আত ২/৩০৮, ৩১০ পৃঃ)। খুৎবা মুসল্লীদের বোধগম্য ভাষায় প্রদান করতে হবে। শ্রোতাগণকে জান্নাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করাই ছিল রসূল ﷺ -এর খুৎবার বিষয়। খুৎবার মূল উদ্দেশ্যও এটাই। আর এজন্যই খুৎবার প্রচলন করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, জুম'আর পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নাত সলাত নেই। মুসল্লী কেবল তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু'রাক'আত সলাত পড়ে বসে থাকবে। সময় পেলে খুৎবার পূর্ব পর্যন্ত যত খুশী নফল সলাত আদায় করতে পারে। জুম'আর সলাতের পরে মসজিদে ৪ রাক'আত অথবা বাড়িতে এসে ২ রাক'আত সলাত আদায় করতে হয়। মসজিদে কিংবা বাড়িতে ২-৪ মোট ৬ রাক'আত নফল সলাত আদায় করা যায়। (সহীহ মুসলিম)

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ সলাত একই

রাত্রির বিশেষ নফল তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ নামে পরিচিত। রমাদানে 'ইশার পর প্রথম রাতে পড়লে তাকে 'তারাবীহ' এবং রমাদান ও অন্যান্য সময়ে শেষরাতে পড়লে তাকে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, ক্বিয়ামে রমাদান, ক্বিয়ামুল লায়িল সবকিছুকে এক কথায় 'সলাতুল লায়িল' বা 'রাত্রির নফল সলাত' বলা হয়। রমাদানে রাতের প্রথমাংশে যখন জামা'আতসহ এই নফল সলাতের প্রচলন হয়, তখন প্রতি চার রাক'আত অন্তর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া হত। সেখান থেকে 'তারাবীহ' নামকরণ হয় (ফাৎহুল বারী, আল-ক্বামূসূল মুহীত্ব)। 'তারাবীহ' অর্থ বিশ্রাম। এই নামকরণের মধ্যেই তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, তারাবীহ প্রথম রাতে একাকী অথবা জামা'আতসহ এবং তাহাজ্জুদ শেষরাতে একাকী পড়তে হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ রমাদানের রাতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টিই পড়েছেন মর্মে সহীহ বা যঈফ সনদে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

রাত্রির সলাতের ফযীলত ঃ রাত্রির সলাত বা 'সলাতুল লায়িল' নফল হলেও তা খুবই ফযীলতপূর্ণ। যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'ফরয সলাতের পরে সর্বোত্তম সলাত হল রাত্রির (নফল) সলাত। (সহীহ মুসলিম) তিনি আরও বলেন, 'আমাদের পালনকর্তা মহান আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছ আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আছ আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব? কে আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব? এভাবে তিনি ফজর স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত আহ্বান করেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

রাক'আত সংখ্যা ঃ রমাদান বা রমদানের বাইরে রসূলুল্লাহ ﷺ হতে রাত্রির এই বিশেষ নফল সলাত তিন রাক'আত বিতরসহ **১১** রাক'আত সহীহ সূত্রসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন আয়িশা (রা.) বলেন, রমাদান বা রমাদানের বাইরে রসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রির সলাত এগার রাক'আতের বেশী আদায় করেননি। তিনি প্রথমে (২+২) (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিন রাক'আত পড়েন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, আহমাদ)

রাত্রির সলাত সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

১) শেষ রাতে তাহাজ্জুদে উঠে প্রথমে হালকাভাবে দু'রাক'আত পড়বে। অতঃপর বাকী সলাত পড়বে। (সহীহ মুসলিম)

২) যদি কেউ প্রথম রাতে 'ইশার পরে বিতর পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে শেষ রাতে উঠে দু'রাক'আত করে তাহাজ্জুদ পড়বে। শেষে আর বিতর পড়তে হবে না। কেননা এক রাতে দুই বিতর চলে না। (আবূ দাউদ, নাসাঈ)

৩) বিতর ক্বাযা হয়ে গেলে সকালে অথবা যখন স্মরণ বা সুযোগ হবে, তখন পড়বে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ) এটি 'মুবাহ' (ইচ্ছাধীন, বাধ্যতামূলক নয়)।

৪) তাহাজ্জুদ বা বিতর ক্বাযা হয়ে গেলে ‘উবাদাহ বিন সামিত, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস প্রমুখ সাহাবীগণ ফজর সলাতের আগে তা আদায় করে নিতেন। (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৮৩)

৫) বিতর পড়ে শুয়ে গেলে এবং ঘুম অথবা ব্যথার আধিক্যের কারণে তাহাজ্জুদ পড়তে না পারলে রসূল ﷺ দিনের বেলায় (সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে) ১২ রাক’আত পড়েছেন (তন্মধ্যে তাহাজ্জুদের ৮ রাক’আত ও সলাতুয যোহা ৪ রাক’আত)। (সহীহ মুসলিম)

৬) যদি কেউ আগ রাতে বিতরের পর দু’রাক’আত নফল সলাত আদায় করে এবং শেষরাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে সক্ষম না হয়, তাহলে উক্ত দু’রাক’আত তার জন্য যথেষ্ট হবে। (দারেমী)

৭) যদি কেউ তাহাজ্জুদের নিয়তে শুয়ে গেলেও উঠতে না পারে, তাহলে সে উত্তম নিয়তের কারণে পূর্ণ নেকী পাবে এবং উক্ত ঘুম তার জন্য সদাকা হবে। (নাসাঈ, ইবনু মাজাহ)

দুই ঈদের সলাত

ঈদের সলাত ২য় হিজরী সনে চালু হয়। ঈদ হল মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর নির্ধারিত বার্ষিক দু’টি আনন্দ উৎসবের দিন। ঈদের উৎসবের দিন দু’টি হচ্ছে মুসলিমদের একে অপরের সাথে মিলিত হওয়ার দিন। এই দিনে বংশগৌরব, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি পরিহার করে ধনী-গরীব সকলে মিলে এক সাথে ঈদের আনন্দ উপভোগ করা আবশ্যক। পবিত্রতা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে এদিন দু’টি পালিত হবে। এতে আনন্দ উৎসবের নামে অশ্লীলতা যেমন থাকবে না, তেমনি বিনোদনের নামে উচ্ছৃংখলতা ও বিজাতীয় সংস্কৃতির চর্চা করাও যাবে না।

প্রাক ইসলামী যুগে আরব দেশে অন্যদের অনুকরণ নববর্ষ ও অন্যান্য উৎসব পালনের রিওয়ায ছিল। রসূল ﷺ মদীনায় হিজরত করে দেখলেন যে, মদীনাবাসী বছরে দু’দিন খেলাধুলা ও আনন্দ উৎসব করে। তখন রসূল ﷺ তাদেরকে বললেন, ‘আল্লাহ তোমাদের ঐ দু’দিনের পরিবর্তে দু’টি মহান উৎসবের দিন প্রদান করেছেন। ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর’। (আবুদাউদ)

ঈদের সলাতের গুরুত্ব

ঈদের সলাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটা সূর্যোদয়ের পরে সকাল সকাল খোলা ময়দানে গিয়ে পড়তে হয়। রসূল ﷺ নিয়মিতভাবে এ সলাত আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলিমকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন (ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৬ পৃঃ)। ঈদের সলাতের গুরুত্ব অপরিসীম। সকল নারী-পুরুষকে তো ঈদের মাঠে যেতে হবে। এমনকি ঋতুবর্তী মহিলাদেরকেও যেতে হবে। তারা সলাত আদায়কারীদের নিকট থেকে দূরে অবস্থান করবে এবং তাকবীর ও দু'আয় শরীক হবে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

শুধু তাই নয়, যাদের পর্দা করে ঈদের মাঠে যাওয়ার মত চাদর নেই, তাদেরকে সাথীদের চাদর মাথায় দিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) মহিলারা সকল সলাতে পুরুষদের পিছনে থাকবে।

ঈদের দিনে করণীয়

জুম'আর দিনে যেমন সাধ্যমত সুন্দর পোশাক পরিধানের কথা বলা হয়েছে, ঈদের ব্যাপারে তেমনটি বলা হয়নি। রসূল ﷺ খুব প্রত্যুষে ঈদগাহের দিকে রওয়ানা হতেন। ঈদুল ফিতরের দিন তিনি কিছু না খেয়ে বের হতেন না। এদিন তিনি বেজোড় সংখ্যক কয়েকটি খেজুর খেতেন। (সহীহ বুখারী)

বুরাইদা আসলামী বলেন, নাবী কারীম ﷺ ঈদুল ফিতরের দিনে কিছু না খেয়ে বের হতেন না এবং ঈদুল আযহার দিন সলাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছু খেতেন না। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)

রসূল ﷺ ঈদগাহে পৌঁছে প্রথমে দু'রাক'আত সলাত আদায় করতেন। তারপর খুৎবা দিতেন (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

খুৎবায় জনতাকে লক্ষ্য করে উপদেশ দিতেন ও নছীহত করতেন। আর সে নছীহত ছিল পরকালের ভয়, আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। তিনি প্রয়োজন মাফিক কথা বলতেন। বিশেষ করে মহিলাদেরকেও ভিন্নভাবে উপদেশ দিতেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

ঈদের দিনে বেশী তাকবীর বলার কথা এসেছে। এমনকি ঈদুল আযহার চাঁদ দেখার পর হতে রসূল ﷺ তাকবীর বলতেন। (সহীহ বুখারী)

ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী কারীম ﷺ বলেছেন, যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের আমল অন্যান্য দিনের আমলের তুলনায় উত্তম। তারা জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদও কি উত্তম নয়? নাবী কারীম ﷺ বললেন, জিহাদও নয়। তবে সে ব্যক্তির কথা আলাদা, যে নিজের জান মালের ঝুঁকি নিয়েও জিহাদ করে এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না। (সহীহ বুখারী)

ঈদের দিন সলাতের আগে কুরবানী করা যাবে না। যে সলাতের আগে কুরবানী করবে তার কুরবানী কুরবানী হিসেবে গণ্য হবে না (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)। প্রকাশ থাকে যে যার পক্ষ থেকে কুরবানী হবে তার যিলহাজ্জ মাসে চাঁদ দেখার পর হতে কুরবানীর দিন পর্যন্ত নখ, চুল কাটা সুন্নাত পরিপন্থী।

ঈদের সলাতের পদ্ধতি

অন্যান্য সলাত হতে ঈদের সলাতের পদ্ধতি একটু ভিন্নতর। ইকামাত ও আযান ছাড়াই ১ম রাক'আত তাকবীরে তাহরীমা ও সানা পাঠের পর ধীর-স্থিরভাবে স্বল্প বিরতি সহ পরপর ৭ তাকবীর দিয়ে আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ ইমাম উচ্চস্বরে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়বেন। আর মুক্তাদীগণ চুপেচুপে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বেন। তারপর রুকু-সাজদাহ সেরে অনুরূপভাবে ২য় রাক'আতে দাঁড়িয়ে ধীর-স্থিরভাবে পরপর ৫ তাকবীর দিয়ে কেবল বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়বেন।

রসূল ﷺ এসময় ১ম রাক'আতে সূরা ক্বাফ অথবা 'আলা এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা 'ক্বামার' অথবা 'গাশিয়া' পড়তেন (সহীহ মুসলিম)। প্রত্যেক তাকবীরের সময়ে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে হবে এবং বুকে বাঁধবে। তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হলে তা পুনরায় বলতে হয় না বা সাজদায়ে সাহো লাগে না।

সহীহ হাদীস অনুসারে ঈদের সলাতে মোট (৭+৫) = ১২ তাকবীর।

৬ তাকবীরে যে ঈদের সলাত পড়ানো হয় এর কোন সহীহ দলিল নেই।

ইশরাক্ব ও চাশতের সলাত

'শুরূক্ব' অর্থ সূর্য উদিত হওয়া। 'ইশরাক্ব' অর্থ চমকিত হওয়া। 'যোহা' অর্থ সূর্য গরম হওয়া। এই সলাত সূর্যোদয়ের পরপরই প্রথম প্রহরের শুরুতে

পড়লে একে ‘সলাতুল ইশরাক্ব’ বলা হয় এবং কিছু পরে দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়লে তাকে ‘সলাতুয যোহা’ বা চাশতের সলাত বলা হয়। এই সলাত বাড়ীতে পড়া ‘মুস্তাহাব’। এটি সর্বদা পড়া এবং আবশ্যিক গণ্য করা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহর রসূল ﷺ কখনও পড়তেন, কখনো ছাড়তেন।

ফযীলত ঃ আনাস (রা,) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের সলাত জামা’আতে পড়ে, অতঃপর সূর্য ওঠা পর্যন্ত আল্লাহর যিকরে বসে থাকে, অতঃপর দু’রাক’আত সলাত আদায় করে, তার জন্য পূর্ণ একটি হাজ্জ ও ওমরাহর নেকী হয়। (তিরমিযী)

বুরাইদা আসলামী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড় রয়েছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হ’ল প্রত্যেক জোড়ের জন্য একটি করে সদাকা করা। সাহাবীগণ বললেন, কার শক্তি আছে এই কাজ করার, হে আল্লাহর নাবী? তিনি বললেন, চাশতের দু’রাক’আত সলাতই এজন্য যথেষ্ট। (সহীহ মুসলিম)। চাশতের সলাতের রাক’আতের সংখ্যা ২, ৪, ৮, ১২ পর্যন্ত পাওয়া যায়। দু রাক’আত অন্তর সালাম ফিরাতে হয়। এই সলাতকেই সলাতুল আউওয়াবীন বলে। (সহীহ মুসলিম)।

মক্কা বিজয়ের দিন দুপুরের পূর্বে রসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা.)-এর বোন উম্মে হানীর গৃহে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে ৮ রাক’আত পড়েছিলেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

মাগরিবের পরের ৬ রাক’আত নফল সলাতকে আউওয়াবীন বলার হাদীসগুলি যঈফ। (তিরমিযী যঈফাহ)

সফর বা ভ্রমণের সময় সলাত

ক্বসর কী ?

‘ক্বসর’ অর্থ কমানো। পারিভাষিক অর্থে ঃ চার রাক’আত বিশিষ্ট সলাত দু’রাক’আত করে পড়াকে ‘ক্বসর’ বলে। মক্কা বিজয়ের সফরে রসূলুল্লাহ ﷺ ক্বসরের সাথে সলাত আদায় করেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

শান্তিপূর্ণ সফরে ক্বসর করতে হবে কি-না এ সম্পর্কে ওমর (রা.)-এর এক প্রশ্নের জবাবে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘আল্লাহ এটিকে তোমাদের জন্য সদাকা (উপঢৌকন) হিসেবে প্রদান করেছেন। অতএব তোমার তা গ্রহণ

কর’। (সহীহ মুসলিম) সফর অবশ্যই আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের সফর হতে হবে, গুনাহের সফর নয়।

সফর অথবা ভীতির সময়ে সলাতে ‘ক্বসর’ করার অনুমতি রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন-

“যখন তোমরা সফর কর, তখন তোমাদের সলাতে ‘ক্বসর’ করায় কোন দোষ নেই। যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে। নিশ্চয়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু”। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১০১)

সফরের দূরত্ব

সফরের দূরত্বের ব্যাপারে স্কলারদের মধ্যে ১ মাইল হতে ৪৮ মাইলের ২০ প্রকার বক্তব্য রয়েছে। (নায়ল ৪/১২২ পৃঃ) পবিত্র কুরআনে দূরত্বের কোন ব্যাখ্যা নেই। কেবল সফরের কথা আছে। রসূলুল্লাহ ﷺ থেকেও এর কোন সীমা নির্দেশ করা হয়নি। (যাদুল মা’আদ ১৪৬৩)

অতএব সফর হিসেবে গণ্য হয় এমন দূরত্বে সফর করার জন্য বের হয়ে কিছু দূর গিয়ে ক্বসর করা যায়। যেমন রসূল ﷺ মদীনা থেকে যোহরের ৪ রাক’আত সলাত আদায় করে বের হলেন। আর যুলহুলাইফা পৌঁছতে আসরের সময় হলে গেল এবং সেখানে তিনি ক্বসর করে ২ রাক’আত সলাত আদায় করলেন। (সহীহ বুখারী হাদীস # ১০৮৯)

সফরের মেয়াদ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ১৯ দিন (মক্কা বিজয় অভিযানে) অবস্থানকালে ‘ক্বসর’ করেছেন। আমরাও তাই করি। তার বেশী হলে পূর্ণ করি। (সহীহ বুখারী হাদীস # ১০৮০)

রসূল ﷺ তাবুক যুদ্ধের সময় ২০ দিন যাবৎ ক্বসর করেন। আনাস (রা.) সিরিয়া সফরে এসে দু’বছর যাবৎ সেখানে থাকেন এবং ক্বসর করেন। (মির’আত ৩/২২১ পৃঃ)

স্থায়ী মুসাফির যেমন যানবাহনের চালক এবং কর্মচারীগণ সর্বদা ক্বসর করতে পরেন। (মির’আত ৩/২২১ পৃঃ)

রসূল ﷺ যখন হাজ্জ করেছিলেন তখন ১৯ দিন মক্কায় ছিলেন এবং পুরো সময়টাতেই ক্বসর পড়েছিলেন। কতদিন হলে ক্বসর পড়তে হবে তা রসূল

ﷺ বলে যাননি। তবে আল কুরআনে সফররত অবস্থায় ক্বসর পড়তে বলা হয়েছে। তাই Authentic স্কলারগণ আল-কুরআনের সেই আয়াতকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, যতদিন সফরে থাকা হবে ততদিনই ক্বসর পড়তে হবে, এর কোন নির্দিষ্ট দিন নেই। '১৫ দিন পর্যন্ত ক্বসর' বলে ভারত উপমহাদেশে যে ফতোয়া প্রচলিত আছে তা ঠিক নয়। তাই হাজ্জে গিয়ে মক্কা বা মদীনায় ১৫ দিনের বেশী থাকলেও ক্বসরই পড়তে হবে।

ক্বসর কত রাক'আত পড়তে হবে?

যাত্রার সময় থেকেই ক্বসর সলাত আদায় করতে হয়। ফজর ২ রাক'আত, যোহর ২ রাক'আত, আসর ২ রাক'আত, মাগরিব ৩ রাক'আত, ইশা ২ রাক'আত। (সহীহ বুখারী)

কসরে কোন সুন্নাহ এবং নফল নেই, তবে ফজরের ২ রাক'আত সুন্নাহ এবং অন্ততপক্ষে বিতর ১ রাক'আত বা ৩ রাক'আত পড়া উত্তম কারণ রসূল ﷺ কখনো এই দু'টি ছাড়েননি।

ক্বসর অবস্থায় জামা'আতে সলাত?

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) জামা'আতে পুরা পড়তেন ও একাকী ক্বসর করতেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

সফররত অবস্থায় যদি জামা'আতে সলাত আদায় করি তাহলে ইমামের পিছনে সম্পূর্ণ ফরয সলাত আদায় করতে হবে, ক্বসর নয়।

যদি মুসাফির (ট্রাভেলার) জামা'আতে ইমামতি করেন এবং মুক্তাদিরা যদি মুসাফির না হোন তাহলে ইমাম ক্বসর পড়বেন। আসরের চার রাক'আতের উদাহরণ দেয়া যাক। ইমাম মুসাফির হওয়ার কারণে তিনি দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে সলাত শেষ করে উঠে যাবেন। কিন্তু পিছনের মুক্তাদিরা ইমামের সাথে সাথে দুই রাক'আত পর সালাম ফিরাবেন না, ইমাম সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদিরা দাঁড়িয়ে যাবেন এবং বাকী দুই রাক'আত সম্পূর্ণ করবেন।

ক্বসর সলাত জমা করে আদায় করা

সফররত অবস্থায় যোহর বা আসরের সময় যোহর-আসর এক সাথে ভিন্ন ভিন্ন ইকামাত দিয়ে ২+২ মোট ৪ রাক'আত সলাত আদায় করতে হয়।

অনুরূপভাবে মাগরিব বা ইশার সময় মাগরিব-ইশা ৩+২ মোট ৫ রাক'আত সলাত আদায় করতে হয়। (সহীহ বুখারী হাদীস # ১১০৯, ১১১২)

ভয়-ভীতি বা সফর ব্যতীত মুক্বীম অবস্থায় কোন বিশেষ কারণ বশত উপরের নিয়ম অনুসারে সুন্নাত ব্যতিত দুই ওয়াক্তের ফরয সলাত দুই ইকামাতে একত্রে জমা করে আদায় করা যায়। যেমন যোহর+আসর (৪+৪) এবং মাগরিব+ইশা (৩+৪) রাক'আত। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৫৪৩)

ইবনু আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো এটা কেন? তিনি বললেন, উম্মতের যেন কষ্ট না হয়। এই সুযোগ ইস্তেহাযা বা প্রদর রোগাক্রান্ত মহিলা ও বহুমুত্রের রোগী বা অন্যান্য কঠিন রোগী এবং কর্মব্যস্ত লোকগণও বিশেষ ওযর বশত অনিয়মিতভাবে গ্রহণ করতে পারে। (নায়লুল আওত্বার ৪/১৩৬-৪০ পৃঃ)

তবে রোগীরা যতদিন পর্যন্ত সুস্থ না হয় ততদিন দুই সলাতকে একত্রে পড়তে পারবেন।

দুই ওয়াক্তের সলাত জমা করে আদায় করার নিয়ম

দুই ওয়াক্তের সলাতকে জমা করে পড়ার নিয়ম হচ্ছে যোহরকে বিলম্ব করে এবং আসরকে এগিয়ে এনে একত্রে পড়তে হবে। অনুরূপভাবে মাগরিবকে বিলম্ব করে এবং ইশাকে এগিয়ে এনে একত্রে পড়তে হবে। (সহীহ বুখারী হাদীস # ১১১২)

ভ্রমনের সময় ওযূ

সফররত অবস্থায় পানির সমস্যা থাকলে তায়াম্মুম করে নিতে হবে। বাসা থেকে ওযূ করার পর পায়ে মোজা পরে থাকলে পা ধোয়ার আর প্রয়োজন নেই। পানি দিয়ে ওযূর সবই করবো শুধু মোজার উপর মাসেহ করলেই চলবে। ট্রাভেল বা মুসাফির অবস্থায় তিন দিন পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করতে পারবো এবং ভ্রমণ ছাড়া অন্য সময় (মুকীম অবস্থায়) ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত। মোজা চামড়ার হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

যানবাহনে সলাত

অবশ্য যানবাহনে ক্বিবলামুখী হয়ে সলাত শুরু করা বাঞ্ছনীয়। (আবূ দাউদ)

যখন যানবাহনে রুকু-সাজদাহ করা অসুবিধা মনে হবে, তখন কেবল তাকবীর দিয়ে ও মাথার ইশারায় সলাত আদায় করবে। সাজদার সময় মাথা রুকুর চেয়ে কিছুটা বেশী নীচু করবে। (আবূ দাউদ, আহমাদ, তিরমিযী)

যখন ক্বিবলা ঠিক করা অসম্ভব বিবেচিত হবে, কিংবা সন্দেহে পতিত হবে, তখন নিশ্চিত ধারণার ভিত্তিতে ক্বিবলার নিয়তে একদিকে ফিরে সামনে সুৎরা রেখে সলাত আদায় করবে। (বায়হাকী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

নৌকায় দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে, যদি ডুবে যাওয়ার ভয় না থাকে। এ সময় বা অন্য যে কোন সময় কষ্টকর দাঁড়ানোর জন্য কিছুতে ঠেস দেয়া যাবে। (আবূ দাউদ)

নাবী ﷺ সফরে স্বীয় বাহনের উপর নফল সলাত পড়তেন এবং তার উপরে বিতরও পড়তেন, সে তাকে নিয়ে পূর্ব পশ্চিম যেদিকে মন সে দিকে নিয়ে যেত। (বুখারী, মুসলিম) আবার (কখনও) স্বীয় উটনীর উপর নফল পড়তে চাইলে তাকে ক্বিবলামুখী করে তাকবীর বলতেন, অতঃপর সে যে দিকেই তাঁকে নিয়ে যেত সেদিকেই সলাত পড়তেন। (আবু দাউদ)

তিনি স্বীয় বাহনের উপর মাথার ইঙ্গিত দ্বারা রুকু ও সাজদাহ করতেন, সাজদাকে রুকুর তুলনায় অধিক নিম্নমুখী করতেন। (আহমাদ, তিরমিযী)

ফরয সলাত পড়ার ইচ্ছা করলে অবতরণ করে ক্বিবলামুখী হতেন। (বুখারী, আহমাদ)

প্রয়োজন পূরণের সলাত

সঙ্গত কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য বান্দা স্বীয় প্রভুর নিকট নিম্নের তরীকায় সলাত আদায়ের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে। ইমাম আহমাদ সহীহ সনদে আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযূ করল, অতঃপর পূর্ণভাবে দু'রাক'আত সলাত আদায় করল। আল্লাহ তাকে দান করেন যা সে প্রার্থনা করে সাথে সাথে কিংবা কিছুটা বিলম্বে হলেও। (মুসনাদে আহমাদ)

ক্ষমা প্রার্থনার সলাত

আলী (রা.) বলেন, আমার নিকট আবু বকর (রা.) হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি সত্য বলেছেন, আমি রসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন গুনাহ করবে অতঃপর উঠে পবিত্রতা হাসিল করে এবং কিছু নফল সলাত আদায় করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর রসূল ﷺ নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন।

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ

وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ

"যখন কেউ কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে তখন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।"
(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৫)

আবু বকর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কোন লোক যদি গুনাহ করে। অতঃপর উঠে দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত সলাত আদায় করে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, বায়হাকী, তিরমিযী)

তওবার জন্য নিম্নের দু'আটি বিশেষভাবে সাজদায় ও শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে পাঠ করতে হবে-

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ

আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। আমি তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি বা তাওবা করছি। (তিরমিযী হাদীস # ২৮৩১)

সলাতুল ইস্তিখারা
বা কল্যাণ ইঙ্গীত প্রার্থনার সলাত

ইস্তিখারা অর্থ কোন কাজের কল্যাণ প্রার্থনা করা। মুসলিম বান্দা যখন কোন কাজের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পতিত হয় এবং নিজে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারে তখন আল্লাহর নিকট সঠিক সিদ্ধান্ত চেয়ে বিশেষ নিয়মে প্রার্থনা করাকে সলাতুল ইস্তিখারা বলে।

জাবির (রা.) বলেন, রসূল ﷺ আমাদেরকে সকল কাজে আল্লাহর নিকট ইস্তিখারা করার নিয়ম ও দু'আ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করবে তখন সে যেন ফরয সলাত ছাড়া দু'রাক'আত সলাত আদায় করে। অতঃপর নিম্নের দু'আটি পড়ে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ، وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ،

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ- خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ

أَمْرِي- عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ

تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي- عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ-

فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি'ইলমিকা ওয়া আস্তাক্বদিরুকা বি ক্বুদরতিকা ওয়া আস্‌আলুকা মিন্ ফাদলিকাল 'আযীম। ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়া লা আক্বদিরু, ওয়া তা'লামু ওয়া লা আ'লামু, ওয়া আন্‌তা 'আল্লা-মুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমর, খয়রুল লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী, ফাক্বদিরহু লী ওয়া ইয়াসসিরহু লী; ছুম্মা বা-রিক লী ফীহি। ওয়া ইন কুনতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শার্রুল লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী, ফাছরিফহু 'আন্নী ওয়াছরিফনী 'আনহু, ওয়াক্বদির লিয়াল খয়রা হায়ছু কা-না, ছুম্মা আরদিনী বিহ।

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণের বিষয়টি প্রার্থনা করছি এবং তোমার শক্তির মাধ্যমে (সেটা অর্জন করার) শক্তি প্রার্থনা করছি। আমি তোমার মহান অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইছি। কেননা তুমিই ক্ষমতা রাখ। আমি ক্ষমতা রাখি না। তুমিই জানো, আমি জানি না। তুমিই যে অদৃশ্য বিষয় সমূহের মহাজ্ঞানী।

হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো যে, কাজটি আমার জন্য উত্তম হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহলে ওটা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও এবং সহজ করে দাও। অতঃপর ওতে আমার জন্য বরকত দান কর।

আর যদি তুমি জানো যে, এ কাজটি আমার জন্য মন্দ হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহলে এটা আমার থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও ওটা থেকে ফিরিয়ে রাখ। অতঃপর আমার জন্য মঙ্গল নির্ধারণ কর, যেখানে তা আছে এবং আমাকে তা দ্বারা সন্তুষ্ট কর। (সহীহ বুখারী)

এখানে হা-যাল আমর (এই কাজ) বলার সময় প্রার্থনাকারী নিজের কাজের নাম উল্লেখ করবে। ইস্তিখারার দু'আটি ক্বিরাআতের পরে এবং রুকুর পূর্বে পাঠ করার জন্য আল্লামা সাইয়িদ সাবিক্ব বলেছেন। (ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৫৮ পৃঃ)

অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আমরা যদি এমন কোন কাজের সম্মুখীন হই যে, সে কাজের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না, তখন রসূল ﷺ -এর সুন্নাহ অনুসারে ইস্তিখারার সলাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট দু'আ করে আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করব। যে কাজ করতে যাব তার প্রতি কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে এবং কোন দিকে ঝুঁকে না পড়ে নিরপেক্ষভাবে সরল মনে ইস্তিখারার সলাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যে দিকে মন টানবে সেভাবেই কাজ করতে হবে। এজন্য দু'রাক'আত সলাত দিনে বা রাতে যে কোন সময়ে পড়া যায়।

জাবির (রা.) হতে বর্ণিত বুখারীর হাদীসে এসেছে সালাম ফিরানোর পরে দু'আ করবে। এবং আবু দাউদে এসেছে সলাতের মধ্যে দু'আ করবে। (বুখারী হা/১১৬২, আবু দাউদ হা/১৫৩৮) অন্যান্য সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের মধ্যেই বিশেষ করে সাজদায় এবং শেষ

বৈঠকে তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বিশেষ দু'আসমূহ করতেন। (আবু দাউদ) সে হিসেবে ইস্তিখারার দু'আটিও শেষ বৈঠকে বসে ধীরে-সুস্থে করা বাঞ্ছনীয়। আর যদি সালাম ফিরানোর পরে উক্ত দু'আ করা হয়, তাহলে বেশী দেরী না করে এবং অহেতুক কোন কথা না বলে সত্বর দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করা এবং শুরুতে হামদ ও দুরূদ পাঠ করতে হবে। যেমন আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আলা রসূলিহিল কারীম, অতঃপর ইস্তিখারার দু'আ পাঠ করতে হবে।

জানাযার সলাতের নিয়ম

- জানাযার সলাতে চার তাকবীর। পাঁচ থেকে নয় তাকবীর পর্যন্ত প্রমাণিত আছে। তবে চার তাকবীরের হাদীসসমূহ অধিকতর সহীহ ও সংখ্যায় অধিক।
- মুক্তাদী ইমামের পিছনে তাকবীর বলবেন। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)
- প্রথমে মনে মনে জানাযার নিয়ত করে সরবে 'আল্লাহু আকবার' বলে দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধতে হবে। এ সময় 'সানা' পড়তে হবে না। (শারহুল মুনতাহা ৩/৫৬-৫৭; বায়হাকী ৪/২৮-২৯)
- আনাস, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ সকল তাকবীরেই হাত উঠাতেন। (নায়লুল আওত্বার ৫/৭০-৭১)
- অতঃপর আ'উযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়তে হবে। (সহীহ বুখারী, নাসাঈ)
- তারপর ২য় তাকবীর দিতে হবে ও দুরূদে ইবরাহীমী পাঠ করতে হবে, (যা সাধারণ সলাতে আত্তাহিইয়াতু-র পরে পড়া হয়)। তারপর ৩য় তাকবীর দিতে হবে ও নিম্নোক্ত দু'আ পড়তে হবে। দু'আ পাঠ শেষে ৪র্থ তাকবীর দিয়ে প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফিরাতে হবে। ডানে একবার মাত্র সালাম ফিরানোও জায়িয আছে। (তালখীছ, ৪৪/৫৭ পৃঃ)
- জানাযার সলাত সরবে ও নীরবে পড়া যায়। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, নাসাঈ) ইমাম সরবে পড়লে মুক্তাদীগণ আ'উযুবিল্লাহ-

বিসমিল্লাহ সহ কেবল সূরায়ে ফাতিহা চুপে চুপে পড়বেন এবং পরে দুরূদ ও অন্যান্য দু'আসমূহ পড়বেন। তবে ইমাম নীরবে পড়লে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা এবং অন্যান্য দু'আসমূহ পড়বেন।

জানাযার দু'আ

اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنا وَمَيِّتِنا وَشاهِدِنا ، وَغائِبِنا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَذَكَرِنا وَأُنْثانا. اللهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنّا فَأَحْيِهِ عَلى الإِسْلامِ ،وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ ، اللهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَه ، وَلا تُضِلَّنا بَعْدَه

আল্লা-হুম্মাগফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গা-য়িবিনা ওয়া ছগীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উন্‌ছানা, আল্লা-হুম্মা মান আহ্‌য়াইতাহূ মিন্না ফাআহয়িহী 'আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্‌ফায়তাহু মিন্না ফাতাওফ্‌ফাহূ 'আলাল ঈমান। আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহূ ওয়া লা তাফতিন্না বা'দাহূ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং (এই জানাযায়) উপস্থিত-অনুপস্থিত, আমাদের ছোট ও বড়, নর ও নারীদেরকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছো তাদেরকে ইসলামের উপরে জীবিত রাখো, আর যাদেরকে মৃত্যু দান করো তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাহার সওয়াব হতে বঞ্চিত করোনা এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না। (আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী)

এছাড়াও আরো কিছু দু'আ আছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়
সলাতের অন্যান্য
বিষয়

মসজিদে প্রবেশকালে দু'আ

أَعُوذُ بِاللهِ العَظِيمِ, وَوَجْهِهِ الْكَرِيمِ, وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

بِسْمِ اللهِ, وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

আউযুবিল্লাহিল আযীম ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম ওয়া সুলতানিহিল ক্বদীম মীনাশ শায়তনির রজীম- বিসমিল্লাহি ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু আলা রসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাফ্‌তাহলী আবওয়াবা রহমাতিক।

অর্থ ঃ মহান ও মহীয়ান আল্লাহ এবং তাঁর মর্যাদাশীল সত্ত্বা ও চিরন্তন কর্তৃত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হতে। আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), দুরূদ ও সালাম রসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি। হে দয়াময় আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজা আমার জন্য খুলে দাও। (সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ)

মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ،

اللَّهُمَّ اَعصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

বিসমিল্লাহি ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু আলা রসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন্ ফাদ্‌লিক, আল্লাহুম্মা সিমনী মিনাশ শায়তনির রজীম।

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি দুরূদ ও সালাম রসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি। মহান ও মহীয়ান আল্লাহ এবং তাঁর মর্যাদাশীল সত্ত্বা ও চিরন্তন কর্তৃত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হতে। হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। (আবূ দাউদ)

সুন্নাত-নফলের বিবরণ

ক) ফরয ব্যতীত সকল সলাতই নফল বা অতিরিক্ত। তবে যেসব নফল রসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত পড়তেন বা পড়তে তাকীদ করতেন, সেগুলিকে ফিক্বহী পরিভাষায় 'সুন্নাতে রাতেবাহ' বলা হয়। যেমন ফরয সলাত সমূহের

আগে-পিছের সুন্নাতসমূহ। এই সুন্নাতগুলি ক্বাযা হলে তা আদায় করতে হয়। যেমন যোহরের প্রথম দু'রাক'আত বা চার রাক'আত সুন্নাত ক্বাযা হলে তা যোহর সলাত আদায়ের পরে পড়তে হয় এবং ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ক্বাযা হলে তা ফজরের সলাতের পরেই পড়তে হয়। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) এজন্য তাকে বেলা ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না।

২য় প্রকার সুন্নাত হলো 'গায়ের মুওয়াক্কাদাহ', যা আদায় করা সুন্নাত এবং যা করলে নেকী আছে, কিন্তু তাকীদ নেই।

খ) ফরয ও সুন্নাতের জন্য স্থান পরিবর্তন ও কিছুক্ষণ দেরী করে উভয় সলাতের মাঝে পাথর্ক্য করা উচিত। (আবূ দাউদ)

সলাতের ফরয বা রুকনসমূহ

'রুকন' অর্থ স্তম্ভ। অর্থাৎ যা ইচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে সলাত বাতিল হয়ে যায়। যা ৮টি। যেমন-

১. ক্বিয়াম বা দাঁড়ানো।
২. তাকবীরে তাহরীমা ঃ অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' বলে দুই হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উঠানো।
৩. সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা।
৪. রুকু করা।
৫. সাজদাহ করা।
৬. তা'দীলে আরকান বা ধীর-স্থির ভাবে সলাত আদায় করা।
৭. ক্বা'দায়ে আখীরাহ বা শেষ বৈঠক।
৮. দুইদিকে সালাম ফিরানো।

সলাতের ওয়াজিবসমূহ

রুকন-এর পরেই ওয়াজিব-এর স্থান, যা আবশ্যিক। যা ইচ্ছাকৃতভাবে তরক করলে সলাত বাতিল হয়ে যায় এবং ভুলক্রমে তরক করলে 'সাজদায়ে সহো' দিতে হয়। যা ৮টি। যেমন-

১. 'তাকবীরে তাহরীমা' ব্যতীত অন্য সকল তাকবীর। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

২. রুকুতে তাসবীহ পড়া। কমপক্ষে ‘সুবহা-না রব্বিয়াল ‘আযীম’ বলা। (নাসাঈ, আবূ দাউদ, তিরমিযী)
৩. ক্বওমার সময় ‘সামি ‘আল্লা-হু লিমান হামিদাহ’ বলা। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)
৪. ক্বওমার দু’আ কমপক্ষে ‘রব্বানা লাকাল হামদ’ অথবা ’আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ’ বলা। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)
৫. সাজদায় গিয়ে তাসবীহ পড়া। কমপক্ষে ‘সুবহা-না রব্বিয়াল আ’লা’ বলা। (নাসাঈ, আবূ দাউদ, তিরমিযী)
৬. দুই সাজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসা ও দু’আ পাঠ করা। যেমন কমপক্ষে ‘রব্বিগফিরলী’ ২ বার বলা। (ইবনু মাজাহ, আবূ দাউদ, তিরমিযী)
৭. প্রথম বৈঠকে বসা ও ‘তাশাহহুদ’ পাঠ করা। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আহমাদ, নাসাঈ)
৮. সালামের মাধ্যমে সলাত শেষ করা। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ)

সলাতের সুন্নাতসমূহ

ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত সলাতের বাকী সব আমলই সুন্নাত। যেমন-

১. জুম’আর ফরয সলাত ব্যতীত দিবসের সকল সলাত নীরবে ও রাত্রির ফরয সলাতসমূহ সরবে পড়া।
২. প্রথম রাক’আতে ক্বিরাআতের পূর্বে আ’উযুবিল্লাহ........ চুপে চুপে পাঠ করা।
৩. সলাতে পঠিতব্য সকল দু’আ।
৪. বুকে হাত বাঁধা।
৫. রফউল ইয়াদায়েন করা।
৬. ‘আমীন’ বলা।
৭. সাজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে আগে হাত রাখা।
৮. ‘জালসায়ে ইস্তেরাহাত করা।
৯. মাটিতে দু’হাতে ভর দিতে উঠে দাঁড়ানো।
১০. সলাতে দাঁড়িয়ে সাজদার স্থানে নজর রাখা।

১১. তাশাহহুদের সময় ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করা ও শাহাদাত আঙ্গুল নাড়াতে থাকা।

১২. এছাড়া ফরয-ওয়াজিবের বাইরে সকল বৈধ কর্মসমূহ।

সলাত বিনষ্টের কারণসমূহ

(১) সলাতরত অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু খাওয়া বা পান করা।

(২) সলাতের স্বার্থ ব্যতিরেকে অন্য কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলা।

(৩) ইচ্ছাকৃতভাবে বাহুল্য কাজ বা 'আমলে কাছীর' করা। যা দেখলে ধারণা হয় যে, সে সলাতের মধ্যে নয়।

(৪) ইচ্ছাকৃত বা বিনা কারণে সলাতের কোন রুকন ও শর্ত পরিত্যাগ করা।

(৫) সলাতের মধ্যে অধিক হাস্য করা।

(৬) সুৎরা না থাকলে সলাতের সামনে দিয়ে কোন (সাবালিকা) মহিলা, গাধা ও কাল কুকুর অতিক্রম করলে সলাত ভঙ্গ হয়ে যাবে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও ইবনু খুযাইমাহ)

সলাতের নিষিদ্ধ সময় এবং নিষিদ্ধ সময়ে সলাত আদায়

সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন [সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর থাকে] এবং সূর্যাস্ত কালে সলাত আদায় করা নিষেধ। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

অনুরূপভাবে আসরের সলাতের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফজরের সলাতের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন সলাত নেই। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

তবে এই নিষিদ্ধ সময়গুলোতে অনিচ্ছাকৃত অনাদায়ি শুধু ফরয সলাত আদায় করা জায়িয আছে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

বিশেষ নোট ঃ যেমন কেউ ফজরে অনিচ্ছাকৃত ঘুম থেকে জাগতে পারলো না এবং জেগে দেখলো সূর্য উঠছে। তখন সে তাড়াতাড়ি ওযূ করে সূর্য উদয়ের মধ্য দিয়েই ফজরের দুই রাক'আত ফরয সলাত আদায় করে নিবে। কারণ সলাতের কোন কাযা নেই।

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে গবেষণা করে অনেক স্কলারগণ নিষিদ্ধ সময়গুলিতে 'কারণবিশিষ্ট' সলাতসমূহ জায়িয বলেছেন। যেমন-

তাহিইয়াতুল মসজিদ, তাহিইয়াতুল ওযূ, সূর্য গ্রহণের সলাত, জানাযার সলাত ইত্যাদি। (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৮১-৮৩ পৃঃ)

জুমু'আর সলাত ঠিক দুপুরের সময় জায়িয আছে। (তিরমিযী)

অমনিভাবে কাবা গৃহে দিবারাত্রি সকল সময় সলাত ও ত্বাওয়াফ জায়িয আছে। (নাসাঈ, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

সলাতের ওয়াক্ত

আওয়াল ওয়াক্তে সলাত আদায় করাকে রসূল ﷺ সর্বোত্তম আমল হিসেবে অভিহিত করেছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, দারাকুৎনী)

অনেক মসজিদেই দেখা যায় যে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার অনেক পরে জামা'আতের সময় নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী অনেক দেরীতে সলাত আদায় করা হয়। বিশেষ করে ফজর এবং আসরের সলাত ওয়াক্ত শুরু হওয়ার অনেক পরে পড়া হয়। দেরীতে সলাত আদায় করা রসূল ﷺ খুবই অপছন্দ করতেন। আরো রিস্ক হচ্ছে, সলাতের ওয়াক্ত হয়ে গেছে কিন্তু আমি আরো সময় আছে মনে করে দেরী করছি, যদি এর মধ্যে আমার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে ঐ ওয়াক্তের সলাত আদায় না করার জন্য আমাকে মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

আসর সলাত দেরী করে আদায় করা ঠিক নয়

হানাফী মাযহাব অনুসারে আসর সলাতের ওয়াক্ত শুরু হয় দুই সময়ে।

১) সূর্য্য হেলে যাওয়ার পর ছায়া যখন এক গুণ পরিমাণ হয় এবং
২) সূর্য্য হেলে যাওয়ার পর ছায়া যখন দুই গুণ পরিমাণ হয়।
অর্থাৎ একটি থেকে অন্যটির সময়ের ব্যবধান এক ঘন্টা।

প্রথম সময়টি রসূল ﷺ -এর সহীহ হাদীস ভিত্তিক কিন্তু দ্বিতীয় সময়টির কোন সহীহ হাদীস নেই অর্থাৎ রসূল ﷺ থেকে কোন দলিল নেই। হয়তো এটি হানাফী মাযহাবের নিজস্ব মতামত।

অতি দুঃখের বিষয় হচ্ছে যারা হানাফী মাযহাব অনুসরণ করেন তারা আসর সলাতের ওয়াক্ত হিসেবে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সহীহ হাদীস ভিত্তিক ১ম ফতোয়াটি না নিয়ে হাদীস বহির্ভূত দ্বিতীয় মতামতটি অনুসরণ করেন!

আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এমন সময় 'আসরের সলাত আদায় করেছেন যে, সূর্যরশ্মি তখনো তাঁর ঘরের মধ্যে ছিল, আর ছায়া তখনো তাঁর ঘর হতে বেরিয়ে পড়েনি। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৫৪৫)

'উরওয়াহ বললেন ঃ নাবী ﷺ -এর স্ত্রী আয়িশা (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এমন সময় 'আসরের সলাত আদায় করতেন যখন সূর্য কিরণ তাঁর কামরার মধ্যে পড়তো। তখনো তা দেয়ালের উপর উঠে যেতো না। (সহীহ মুসলিম হাদীস # ৯৬০ (খ))

মাসবূক্বের সলাত

কেউ ইমামের সাথে সলাতের কিছু অংশ পেলে তাকে 'মাসবূক্ব' বলে। মুসল্লী ইমামকে যে অবস্থায় পাবে, সে অবস্থায় সলাতে যোগদান করবে। (জামে আত তিরমিযী)

ইমামের সাথে যে অংশটুকু পাবে, ওটুকুই তার সলাতের প্রথম অংশ হিসেবে গণ্য হবে। রুকু অবস্থায় পেলে স্রেফ সূরায়ে ফাতিহা পড়ে রুকুতে শরীক হবে। 'সানা' পড়তে হবে না।

ইবনুয যুবাইর (রা.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে যখন কেউ মসজিদে প্রবেশ করে দেখে যে (জামাআতের) লোকেরা রুকুর অবস্থায় আছে, তাহলে সে যেন প্রবেশ করেই রুকু করে। অতঃপর রুকুর অবস্থায় চলতে চলতে কাতারে শামিল হয়। কারণ, এটাই হলে সুন্নাহ।" (ত্বাবারানী, আওসাত্ব, আব্দুর রাযযাক-মুসান্নাফ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ)

এই বিষয়ে দু'টিই গ্রহণযোগ্য ঃ কেউ যদি রুকুর আগে সূরা ফাতিহা পড়ার সময় পায় তাহলে সেটা এক রাক'আত হিসেবে গণ্য হবে। আর সূরা ফাতিহা না পেলে তা রাক'আত হিসেবে গণ্য হয় না, যেহেতু সূরা ফাতিহা পড়া ছাড়া সলাত হয় না। তবে এই মতও আছে যে শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহা না পড়তে পারলেও সলাত হবে এবং রুকু পেলে উক্ত রাক'আত গণ্য হবে।

নীরব ক্বিরা'আত সম্পন্ন সলাতে
(মুক্তাদীর) নীরবে ক্বিরা'আত পড়া ফরয

ফরয সলাত

যে সকল সলাতে ইমাম সাহেব সূরা ক্বিরাত উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করেন সেই সকল সলাতে শুধু 'সূরা ফাতিহা' ছাড়া অন্য সূরা মুক্তাদীদের পড়তে হয় না, ইমামের তিলাওয়াত শ্রবণ করতে হয়। (সহীহ বুখারী, মুয়াত্তা মালিক, হুমাইদী, আবু দাউদ, আহমাদ)

ইমামের পিছনে নীরব ক্বিরা'আত সম্পন্ন সলাতে মুক্তাদীগণ অবশ্যই 'সূরা ফাতিহাসহ' অন্যান্য সূরা নীরবে তিলাওয়াত করতে হবে। (সহীহ মুসলিম)

আমরা যোহর ও আসরের সলাতে প্রথম দু'রাক'আতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ও অপর একটি সূরা পাঠ করতাম এবং পরবর্তী দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতাম। (ইবনু মাজাহ)

রাতের নফল সলাত

তিনি রাতের সলাতে কখনো নীরবে এবং কখনো সরবে ক্বিরা'আত পড়তেন। তিনি ঘরে সলাত আদায়কালে হুজরায় অবস্থিত লোক তাঁর ক্বিরা'আত শুনতে পেত। আর কখনো স্বীয় শব্দকে আরো উঁচু করতেন ফলে হুজরার বাইরে অবস্থানরত লোকও তা শুনতে পেত। (সহীহ বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ, বাইহাকী)

নীরব সলাতের মধ্যে সূরা-ক্বিরা'আত কতটুকু আস্তে পড়বো?

যেসকল সলাতে আস্তে সূরা ক্বিরা'আত পড়তে হয় সেটা কতটুকু আস্তে হতে হবে সে বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। এমন আস্তে সঠিক উচ্চারণ করে শব্দগুলো পড়তে হবে যেন স্পষ্টভাবে দুই ঠোঁট নড়াচড়া করে এবং কী পড়ছি তা নিজে অনুধাবন করতে পারি। তবে মনে রাখতে হবে, মুখ বন্ধ করে মনে মনে সূরা-ক্বিরা'আত পড়া যাবে না। (সহীহ বুখারী ও মুয়াত্তা মালিক)

আল্লাহর রসূল ﷺ সলাতে কিভাবে তিলাওয়াত করতেন?

রসূল ﷺ আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী ধীরস্থিরভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাড়াহুড়া বা ঝটপট করে নয় বরং অক্ষর - অক্ষর করে

সুস্পষ্টভাবে তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি এমনি ধীরস্থিরভাবে কুরআন পাঠ করতেন যে, তাতে সূরা দীর্ঘ থেকে আরো দীর্ঘতর হয়ে যেত। (সহীহ মুসলিম, মুয়াত্তা মালিক, ইবনুল মুবারক, আবু দাউদ, আহমাদ)

রসূল ﷺ প্রতি আয়াতকে পৃথক পৃথক ভাবে থেমে থেমে তিলাওয়াত করতেন। আয়াতসমূহের শেষে ওয়াক্বফ করতেন, পরবর্তী আয়াতের সাথে সংযুক্ত করতেন না। (আবু দাউদ)

সলাতে ক্বিবলামুখী হওয়া

- পরিবহনে কিংবা ভীতিকর অবস্থায় ক্বিবলামুখী না হলেও চলবে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)
- অসুস্থ ও অক্ষম ব্যক্তি ক্বিবলার দিকে মুখ না করতে পারলে তাকে ফিরিয়ে দেয়ার মতো কেউ না থাকলে, সে যে দিকে মুখ করে সলাত আদায় করবে তাই শুদ্ধ হবে।
- যে সকল দেশ সৌদিআরব (মক্কা) থেকে অনেক দূরে, যেমন আমেরিকা, ক্যানাডা তাদের জন্য ক্বিবলার দিক একেবারে ১০০% একুরেট না হলেও চলবে, একটু ডানে বামে হলে কোন অসুবিধা নেই। যেমন ক্বিবলা যদি পূর্বদিক হয়ে থাকে তাহলে উত্তর-পর্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সলাত আদায় করা যাবে। তবে যেন আবার একেবারে বিপরীত দিকে (উল্টো দিকে) হয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। (তিরমিযী)

রোগীর সলাত

ইমরান বিন হুসাইন (রা.) বলেন ঃ আমি অর্শ (ফোড়া বিশেষ) রোগে আক্রান্ত ছিলাম, রসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ “দাঁড়িয়ে সলাত পড়, যদি তা না পার তবে বসে পড়বে। যদি তাও না পার তবে কাত হয়ে দেহের পার্শ্বদেশের ভরে শুয়ে পড়বে।” (বুখারী, আবু দাউদ ও আহমাদ)

তিনি আরো বলেন ঃ আমি নাবী ﷺ -কে বসে সলাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম? তিনি বললেন ঃ যে কোন ব্যক্তির দাঁড়িয়ে সলাত আদায়

করাই উত্তম। যে ব্যক্তি বসে সলাত আদায় করবে সে দাঁড়িয়ে সলাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে, আর যে শুয়ে (অপর বর্ণনায় পার্শ্ব দেশের উপর) সলাত আদায় করবে সে বসে সলাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে। (বুখারী, আবু দাউদ ও আহমাদ)

আনাস (রা.) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ একদল লোকের নিকট গমন করে দেখলেন তারা অসুস্থতার দরুণ বসে সলাত আদায় করছে। এদেখে তিনি বললেন- বসে সলাত আদায়কারীর সওয়াব দাঁড়িয়ে সলাত আদায়কারীর অর্ধেক। (আহমাদ ও ইবনু মাজাহ)

নাবী ﷺ এক অসুস্থ ব্যক্তিকে পরিদর্শন করতে গিয়ে তাকে বালিশের উপর সলাত আদায় করতে দেখে তিনি তা টেনে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর সে ব্যক্তি একখন্ড কাঠ নিলেন এর উপর সলাত আদায় করার জন্য। তিনি তাও টেনে ফেলে দেন এবং বলেন ঃ যদি সম্ভব হয় তবে মাটির উপর সলাত আদায় করবে তা না হলে ইশারা করে আদায় করবে এবং সাজদাকে রুকু অপেক্ষা বেশী নিচু করবে। (ত্বাবরানী, বাইহাক্বী)

বিশেষ নোট ঃ অনেকে ব্যাক পেইনের কারণে রুকু/সাজদাহ করতে পারেন না তাই চেয়ারে বসে সলাত আদায় করেন যা হাদীস অনুমোদিত। কিন্তু যারা হেঁটে মসজিদে আসেন বা লাঠিতে ভর দিয়ে মসজিদে আসেন তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে সলাতে কিয়াম করা (দাঁড়ানো) ফরয। যিনি হাঁটতে পারেন বা অন্যসময় দাঁড়াতে পারেন তাকে অবশ্যই সলাতে কিয়ামের অংশে কিয়াম করতে হবে এবং রুকু-সাজদাহ চেয়ায়ে বসে করবেন।

সুতরার বিবরণ

সবার জন্য সুতরা ওয়াজিব।

নাবী ﷺ সুতরার নিকটবর্তী হয়ে (সলাতে) দাঁড়াতেন। তাঁর ও দেয়ালের (সুতরা) মধ্যে তিন হাতের ব্যবধান থাকত। (বুখারী ও আহমাদ)

তাঁর সাজদার স্থান ও দেয়ালের মধ্যে একটি বকরী অতিক্রম করার মত ব্যবধান থাকত। (বুখারী ও মুসলিম)। অর্থাৎ সাজদার জায়গা থেকে সুতরার দুরত্ব ১ হাতের মত। এতটুকু রাখা ওয়াজিব। তারচেয়ে কম রাখলে সুন্নাহ বিরোধী হবে।

মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে যাওয়া নিষেধ। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানত যে, এতে তার কত বড় পাপ রয়েছে, তাহলে তার জন্য সেখানে চল্লিশ দিন বা চল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম হত অতিক্রম করে চলে যাওয়ার চাইতে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

এজন্য ক্বিবলার দিকে লাঠি, দেয়াল, মানুষ বা যে কোন বস্তু দ্বারা মুসল্লীর সম্মুখে সুতরা বা আড়াল করতে হয়। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

সুতরা ব্যতীত সলাত আদায় করবে না, আর তোমার সম্মুখ দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে দিবে না, যদি সে আগ্রাহ্য করে তবে তার সাথে লড়াই করবে, কেননা তার সাথে ক্বারীন (শয়তান) রয়েছে। (ইবনু খুযাইমা)

সুতরা কতটুকু হবে?

একটা রিহাল (আরবীতে রাহাল) এর মত উচ্চতা। অর্থাৎ দুই বিঘত অথবা সর্বনিম্ন এক বিঘত (বুড়ো আঙ্গুল থেকে কনিষ্ঠ আঙ্গুল পর্যন্ত) হলেও চলবে। পানির বোতলও রাখা যাবে।

বিশেষ নোট ঃ সলাতরত অবস্থায় যদি কেউ সামনে দিয়ে চলাচল করতে চায় তাহলে সলাতের মধ্যে থেকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে চলাচলকারীকে থামিয়ে দিয়ে হবে। জামা'আতে ইমামের সামনে সুতরা থাকলেই সকলের সুতরা হয়ে যাবে। আলাদা করে আর মুক্তাদিদের সুৎরার প্রয়োজন নেই। জামা'আত চলাকালীন সময়ে মুক্তাদিদের সামনে দিয়ে কেউ চলাচল করলে অসুবিধে নেই, কারণ ইমামের সুতরাই মুক্তাদিদের সুৎরা।

জুতা পরে সলাত আদায় ও তার আদেশ

রসূল ﷺ কখনও খালি পায়ে দাঁড়াতেন আবার কখনও জুতা পরে দাঁড়াতেন। আর উম্মতের জন্য এটা বৈধ রেখেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সলাত আদায় করবে তখন সে যেন স্বীয় জুতা জোড়া পরে নেয় অথবা খুলে নিয়ে স্বীয় পদদ্বয়ের মধ্যভাগে রেখে দেয়, সে দু'টির দ্বারা যেন অপরকে কষ্ট না দেয়। (আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ)

আবূ মাসলামাহ সা'ঈদ ইবনু ইয়াযীদ আল-আয্দী (রহ.) বলেন ঃ আমি আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নাবী

ﷺ কি তাঁর না'লাইন (চপ্পল) পরে সলাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হাঁ। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৩৮৬ ও সহীহ মুসলিম)

রসূল ﷺ বলেন ঃ তোমরা ঈহুদীদের বিরোধিতা কর কেননা তারা জুতা এবং মোজা পরে সলাত আদায় করে না। (আবু দাউদ ও বায্যার)

রসূল ﷺ কখনো সলাত দীর্ঘ করতেন আবার কখনো সংক্ষেপ করতেন

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করে তখন যেন সে সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ রয়েছে। আর যদি কেউ একাকী সলাত আদায় করে তখন ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, হাদীস # ৭০৩)

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সলাত শুরু করি। কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে আমার সলাত সংক্ষেপ করে ফেলি কেননা শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে তা আমি জানি। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, হাদীস # ৭০৯)

আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সলাত শুরু করি। কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে আমার সলাত সংক্ষেপ করে ফেলি। কেননা, শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে তা আমি জানি। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৭০৯)

সুরায়জ ইবনু ইউনুস (রহ.) ...... আবু ওয়াইল (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্মার (রা.) আমাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে একটি সারগর্ভ ভাষণ দিলেন। তিনি মিম্বার থেকে নামলেন। আমরা বললাম, হে আবুল ইয়ারযান! আপনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ ভাষণ দিয়েছেন তবে যদি তা কিছুটা দীর্ঘ করতেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তির দীর্ঘ সলাত ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ তার প্রজ্ঞার পরিচায়ক। অতএব, তোমরা সলাতকে দীর্ঘ এবং ভাষণকে সংক্ষিপ্ত করো। অবশ্যই কোন কোন ভাষণে যাদুকরি প্রভাব থাকে। (সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড, হাদীস # ১৪০)

দাউদ ইবনু রুশাইদ (রহ.) ...... আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) বলেন, যুহরের সলাত শুরু হয়ে যেত। অতঃপর কোন ব্যক্তি প্রয়োজন (প্রস্রাব-পায়খানা) পূরণের জন্য বাকী নামক স্থানে যেত। সে নিজের প্রয়োজন সেরে ওযূ করে এসে দেখত রাসূল ﷺ তখনো ১ম রাক'আতেই আছেন। তিনি সলাত এতটা লম্বা করতেন। (সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, হাদীস # ১৬০)

সলাতের আরো কিছু বিষয়

পুরুষরা থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পরে কি সলাত আদায় হবে?

আজকাল দেখা যায় অনেক ছেলেরাই মসজিদে এক ধরণের থ্রি কোয়ার্টার/ হাফপ্যান্ট পরে সলাতে আসে। তাদের হাফপ্যান্টগুলো এমন সাইজের যে দাঁড়ালে তা হাঁটু ঢাকা থাকে ঠিকই কিন্তু বসলেই হাঁটু বের হয়ে পরে। মনে রাখতে হবে শরীয়তের পরিভাষায় ছেলেদের সতর হচ্ছে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। এর কোন একটু অংশ দেখা গেলে সলাত হবে না, কারণ সলাতে সতর ঢাকা ফরয। এছাড়া সলাতের বাইরে অন্য সময়েও কোন ছেলেই এই অংশটুকু জনসম্মুখে উন্মুক্ত করতে পারবে না। যেমন অনেকেই হাফপ্যান্ট পরে ফুটবল খেলে বা জগিং করে থাকে যা ইসলামে নিষিদ্ধ।

পুরুষরা শর্ট গেঞ্জি এবং টাইট প্যান্ট পরে কি সলাত আদায় হবে?

আজকাল ফ্যাশনের অংশ হিসেবে ছেলেদের জন্য স্কিনটাইট শর্ট গেঞ্জি (টি-সার্ট) এবং টাইট জিন্স প্যান্ট বের হয়েছে যা পরে ছেলেরা মসজিদে আসে সলাতের জন্য। যখন তারা রুকু এবং সাজদায় যায় তখন তাদের পিছন দিক দিয়ে পাছার কিছুটা অংশ অর্থাৎ লজ্জাস্থান (সতর) বের হয়ে পড়ে। আমরা জানি যে সলাতে সতর ঢাকা ফরয। এই রকম অবস্থা হলে তার সলাত হবে না। এই দৃশ্য শুধু ছেলেদের নয় মেয়েদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যা ইসলামে হারাম।

সলাতের মধ্যে শয়তান কুমন্ত্রণা দিলে কী করবো?

উসমান বিন আবুল আস (রা.) নাবী করিম ﷺ -কে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! শয়তান আমার মধ্যে এবং আমার সলাত ও ক্বিরাতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে আমার ক্বিরাতে জটিলতা সৃষ্টি করে। রসূল ﷺ বললেন ঃ এ হচ্ছে শয়তান, যাকে 'খিনযাব' বলা হয়। তুমি তার আগমন অনুভব করলে,

আল্লাহর নিকট তিনবার আশ্রয় কামনা করবে (আউযুবিল্লাহ বলবে) এবং বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে। তিনি (উসমান) বলেন, এরপর আমি এমনটি করি ফলে আল্লাহ তাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন। (সহীহ মুসলিম, আহমাদ)

জামা'আত ও কাতার কেমন হবে?

দু'জন মুসল্লী হলে জামা'আত হবে। ইমাম বামে ও মুক্তাদী ডানে দাঁড়াবে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) তিনজন মুসল্লী হলে ইমাম সম্মুখে এবং দু'জন মুক্তাদী পিছনে দাঁড়াবে। (সহীহ মুসলিম) তবে বিশেষ কারণে ইমামের দু'পাশে দু'জন সমান্তরালভাবে দাঁড়াতে পারেন। তার বেশী হলে অবশ্যই পিছনে কাতার করবেন। (নাসাঈ, আবূ দাউদ) সামনের কাতারে পুরুষগণ ও পিছনের কাতারে মহিলাগণ দাঁড়াবেন। (সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ)

সলাতে কুকুরের মত বসা নিষেধ

দুই পায়ের নলা খাড়া রেখে, হাত দু'টিকে মাটিতে রেখে এবং দুই পাছার উপর ভর করে কুকুরের মত বৈঠক নিষিদ্ধ। কারণ এমন বৈঠক শয়তানের। (সহীহ মুসলিম, ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ৩১৬ নং)

সলাতের মধ্যে কাপড় গুটানো নিষেধ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি ৭ অঙ্গ দ্বারা সাজদাহ করি-- এবং কাপড় ও চুল না গুটাই।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ ৭৮২)

কাঁধ খোলা রেখে সলাত আদায় নিষেধ

কাঁধ খোলা রেখে সলাত নিষিদ্ধ। সুতরাং বহু হাজীদের ইহরাম পরিহিত এক কাঁধ খোলা অবস্থায় সলাত পড়া বৈধ নয়। (মাজমূউস স্বালাওয়াতি ফিল-ইসলাম, ড. শওকত উলাইয়ান ঃ ২৫১ পৃঃ)

অমুসলিমদের উপাসনালয়ে সলাত আদায়

অমুসলিমদের উপাসনালয়ে কোন মূর্তি বা ছবি না থাকলে তাতে সলাত আদায় করা বৈধ। ইবনে আব্বাস (রা.) মূর্তি না থাকলে গির্জায় সলাত আদায় করেছেন। (বুখারী বিনা সনদে, ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার

১/৬৩২) আবূ মুসা আশআরী, উমার বিন আব্দুল আযীয কর্তৃকও গির্জায় সলাত আদায় করার ব্যাপারে বর্ণনা এসেছে। (নাইলুল আউতার, শাওকানী, ফিকহুস সুন্নাহ উর্দু ১৩৫ পৃঃ)

'সাজদায়ে সাহু' কখন ও কীভাবে করতে হবে

সাজদাহ সাহু (ভুলের সাজদাহ)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমাদের যেমন ভুল হয়, আমারও ভুল হয়। আমি কোনো কিছু ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও। (সহীহ বুখারী)

আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সলাতে দাঁড়ালে শয়তান এসে তাকে সন্দেহে ফেলে, এমনকি সে বুঝতে পারে না যে, সে কত রাক'আত সলাত আদায় করেছে। তোমাদের কারো এ অবস্থা হলে সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সাজদাহ করে। (সহীহ বুখারী হাদীস # ১২৩২, সহীহ মুসলিম)

সাহু সাজদাহ ঃ সলাতের মধ্যে যে ত্রুটি হয় সাজদাহ সাহু তার পূর্ণতা দান করে। সাজদাহ সাহু কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়াজিব। কোন কোন ক্ষেত্রে সুন্নাহ। যদি ওয়াজিব বাদ পড়ে যায় তাহলে সাজদাহ সাহু ওয়াজিব। আর যদি সুন্নাহ বাদ পড়ে যায় তাহলে সাজদাহ সাহু সুন্নাহ।

রুকন ঃ রুকন হচ্ছে এমন জিনিস যেটা না থাকলে (না পাওয়া গেলে) সলাতটুকু বাতিল হয়ে যায়।

ওয়াজিব ঃ ওয়াজিব যদি বাদ পড়ে যায় তাহলে শাস্তি দেয়া হবে। যদি কোন কারণ ছাড়া কারও ওয়াজিব বাদ পড়ে, তবে সলাত আদায় হয়ে যাবে।

তিনটি কারণে সলাতে সাজদাহ সাহু দিতে হয় ঃ

১) সলাত বৃদ্ধি হওয়া। যেমন, কোন রুকু বা সাজদাহ বা বসা ইত্যাদি বৃদ্ধি হওয়া।
২) হ্রাস হওয়া। কোন ওয়াজিব কম হওয়া।
৩) সন্দেহ হওয়া। কত রাক'আত পড়েছি তিন না চার এ ব্যাপারে সংশয় হওয়া।

প্রথমত ঃ সলাত বৃদ্ধি হওয়া ঃ মুসল্লী যদি সলাতের অন্তর্ভূক্ত এমন কিছু কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে বৃদ্ধি করে যেমন ঃ দাঁড়ানো, বসা, রুকু, সাজদাহ ইত্যাদি- যেমন দু'বার করে রুকু করা, তিনবার সাজদাহ করা, অথবা যোহর পাঁচ রাক'আত আদায় করা। তবে তার সলাত বাতিল বা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশের বিপরীত আমল করেছে। নাবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যার পক্ষে আমাদের নির্দেশনা নেই, তবে উহা প্রত্যাখ্যাত।" (সহীহ মুসলিম)

কিন্তু যদি ভুলবশতঃ তা করে এবং ঐভাবেই সলাত শেষ করে দেয়ার পর স্মরণ হয় যে, সলাতে বৃদ্ধি হয়ে গেছে, তবে শুধুমাত্র সাজদাহ সাহু করবে। তার সলাতও বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সলাতরত অবস্থায় যদি উক্ত বৃদ্ধি স্মরণ হয়- যেমন চার রাক'আত শেষ করে পাঁচ রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে গেছে- তবে সে ফিরে আসবে এবং শেষে সাজদায়ে সাহু করবে।

(দু'টির জায়গায় তিনটি সাজদাহ করা) বা বসা (চার রাক'আত সলাতে দু'বার বসার পরিবর্তে তিনবার বসা) ইত্যাদি বৃদ্ধি হওয়া।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ যোহরের সলাত পাঁচ রাক'আত পড়লেন। তিনি যখন সালাম ফিরালেন তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, সলাতের সংখ্যা কি বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে নাবী ﷺ বললেন ঃ এ আবার কেমন কথা? তখন সবাই বললো, আপনি তো সলাত পাঁচ রাক'আত পড়লেন। এ কথা শুনে তিনি দু'টি সাজদাহ করলেন। (সহীহ মুসলিম)

সলাতের কমবেশী যাই-ই হোক সালামের আগে বা পরে দু'টি সাজদায়ে সাহু দিতে হবে। (সহীহ মুসলিম)

সলাত কম পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিলে

ভূলবশতঃ ১ বা ২ রাক'আত সলাত কম আদায় করে সালাম ফিরিয়ে থাকলে যদি অল্প (৫/৭ মিনিট) সময়ের মধ্যে মনে পড়ে, তাহলে (মাঝে কথা বলে থাকলেও) নামাযী তাকবীর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাকী সলাত আদায় করে সালাম ফিরানোর পর তাকবীর ও তাসবীহসহ দু'টি সাজদাহ করে পুনরায় সালাম ফিরাবে।

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাদের নিয়ে যোহর বা আসরের সলাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। তখন

যুল-ইয়াদাইন (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া আল্লাহর রসূল! সলাত কি কম হয়ে গেল?' নাবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, সে যা বলছে, তা কি ঠিক? তাঁরা বললেন, হাঁ। তখন তিনি আর দু' রাক'আত সলাত আদায় করলেন। পরে দু'টি সাজদাহ করলেন। সা'দ (রহ.) বলেন, আমি 'উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (রহ.)-কে দেখেছি, তিনি মাগরিবের দু' রাক'আত সলাত আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং কথা বললেন। পরে অবশিষ্ট সলাত আদায় করে দু'টি সাজদাহ করলেন এবং বললেন, নাবী ﷺ এ রকম করেছেন। (সহীহ বুখারী)

ফরয সলাতে দু'রাক'আতের পর দাঁড়িয়ে গেলে

আবদুল্লাহ ইবনু বুহায়নাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সলাতে আল্লাহর রসূল ﷺ দু' রাক'আত আদায় করে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লীগণ তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন তাঁর সলাত সমাপ্ত করার সময় হলো এবং আমরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিলাম, তখন তিনি সালাম ফিরানোর পূর্বে তাকবীর বলে বসে বসেই দু'টি সাজদাহ করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আহমাদ)

রুকন হ্রাস হওয়া

মুসল্লী যদি কোন রুকন কম করে ফেলে- উক্ত রুকন যদি তাকবীরে তাহরিমা (সলাত শুরু করার তাকবীর) হয়, তবে তার সলাতই হবে না। চাই উহা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিক বা ভুলক্রমে ছেড়ে দিক। কেননা তার সলাতই তো শুরু হয়নি।

আর উক্ত রুকন যদি তাকবীরে তাহরিমা ব্যতীত অন্য কিছু হয় আর তা ইচ্ছাকৃত হয় তবে তার সলাত বাতিল বা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

কিন্তু যদি অনিচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে কোন রুকন ছুটে যায়- যেমন প্রথম রাক'আতে কোন রুকন ছুটে গেল, এখন যদি দ্বিতীয় রাক'আতে সেই ছুটে যাওয়া রুকনের নিকট পৌঁছে যায়- তবে এঅবস্থায় আগের রাক'আত বাতিল হয়ে যাবে এবং এটাকে প্রথম রাক'আত গণ্য করবে এবং বাকী অংশ পূরা করে সাহু সাজদাহ দিবে।

কিন্তু যদি দ্বিতীয় রাক'আতে ছুটে যাওয়া সেই রুকনে না পৌঁছে, তবে ছুটে যাওয়া রুকনটি আগে আদায় করবে তারপর বাকী অংশগুলো আদায় করবে এবং সাহু সাজদাহ দিবে।

- মুসল্লী প্রথম রাক'আতের দ্বিতীয় সাজদাটি ভুলে গেল। যখন সেকথা স্মরণ হল, তখন সে দ্বিতীয় রাক'আতের দু'সাজদার মধ্যবর্তী স্থানে বসেছে। এঅবস্থায় আগের রাকাতটি বাতিল হয়ে যাবে এবং এটাকে প্রথম রাক'আত গণ্য করে অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করে সলাত শেসে সাহু সাজদাহ করবে।

- মুসল্লী প্রথম রাক'আতে একটি মাত্র সাজদাহ করেছে। তারপর দ্বিতীয় সাজদাহ না করেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে রুকু করার পর সেই ভুলের কথা স্মরণ হয়েছে, তবে সে বসে পড়বে এবং সেই ছুটে যাওয়া সাজদাহ দিবে এবং সেখান থেকে সলাতের বাকী অংশ পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। তারপর সাহু সাজদাহ করে সালাম ফিরাবে।

রাক'আতে সন্দেহ হলে

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের কেউ যখন সলাতের মধ্যে সংশয়ে পড়ে যাবে, তখন সে যেনো, কোনো একটিকে সঠিক ধরে নিয়ে সলাত আদায় করে নেয় এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে ২টি সাজদাহ করে নেয়। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

নাবী ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ সলাতে সন্দেহ করে এবং বুঝতে পারে না যে, সে কয় রাক'আত আদায় করেছে; ৪ রাক'আত, না ৩ রাক'আত? তখন তার উচিত, সন্দেহ দূর করে দিয়ে যা দৃঢ় প্রত্যয় হয় তার উপর ভিত্তি করা। অতঃপর সালাম ফিরার পূর্বে দু'টি সাজদাহ করা। এতে সে যদি ৫ রাক'আত পড়ে থাকে তাহলে ঐ সাজদাহ মিলে তার সলাত জোড় হয়ে যাবে। অন্যথা যদি পূর্ণ ৪ রাক'আত পড়ে থাকে, তাহলে ঐ সাজদাহ শয়তানের জন্য লাঞ্ছনাকর হবে।" (আহমাদ, সহীহ মুসলিম)

বিঃ দ্রঃ সালাম ফিরানোর পর সন্দেহ হলে কত রাক'আত পড়েছি সেই সন্দেহ বাদ দিতে হবে। এটি একটি অসওয়াসা। এই সন্দেহ অবজ্ঞা করতে হবে।

প্রথম তাশাহহুদ ত্যাগ করলে

একদা নাবী ﷺ সলাতের প্রথম বৈঠকে না বসে উঠে পড়েন। লোকেরা তাসবীহ বললেও তিনি না বসে সলাত শেষে দুই সাজদাহ করে সালাম ফিরালেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ)

প্রকাশ থাকে যে, ৪ রাক'আত আদায় করে ৫ রাক'আতের জন্য ভুলে উঠে সম্পূর্ণ খাড়া হয়ে গেলেও স্মরণ হওয়া বা করানোর সাথে সাথে নামাযী বসে যাবে। কিন্তু প্রথম বৈঠকের জন্য স্মরণ হওয়া বা করানোর পরেও বসবে না।

সাজদাহ সাহু সম্পর্কে যা জানা উচিত

- কুরআন তিলাওয়াতে ভুল হলে সাজদাহ সাহু দিতে হয় না। সূরা ফাতিহা পড়লে সলাত আদায় হয়ে যায়। তিলাওয়াতে সাজদাহ এটা সুন্নাহ। ইচ্ছা করলে করতে পারে।

- যোহর বা আসরের সলাতে কেউ শব্দ করে ক্বিরাত পাঠ শুরু করলেও এতে সাজদাহ সহু দিতে হবে না। (যোহর বা আসরের সলাতে ক্বিরাত চুপে চুপে পাঠ করাটা সুন্নাহ। এটা কোন ওয়াজিব বা রুকন নয়) এই ত্রুটির জন্য ইচ্ছা করলে সাজদাহ সাহু দিতে পারে।

- ঈদের সলাতে তাকবীর কম হলে ইচ্ছা করলে সাজদাহ সাহু দিতে পারে।

- 'ইশা বা মাগরিব বা ফজরের সলাতে ইমাম জোরে ফাতিহা পাঠ করছেন না। সেক্ষেত্রে ১ম রাক'আতের রুকু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। দ্বিতীয় রাক'আতেও যদি পূর্বের মত করে তাহলে সুবহানাল্লাহ বলে সতর্ক করা যেতে পারে। এজন্য সাজদাহ সাহু দিতেও পারে না করলেও কোন ক্ষতি নেই।

- মুক্তাদি ইমামের পিছনে যদি রুকন নষ্ট না করে তবে সাজদাহ সাহু দিতে হবে না। যদি কোন রাক'আতে রুকন নষ্ট করে তাহলে তার ঐ রাক'আত নষ্ট হয়ে যাবে। অন্য কিছু ভুল করলে তার সাজদাহ সাহু দিতে হবে না। যেহেতু সে ইমামের পিছনে রয়েছে।

- কুনুত যদি না পড়ে (বিতরের) তাহলে সাজদাহ সাহু দিতে হয় না। এটা রসূল ﷺ মাঝে মাঝে পড়েছেন। এটা পড়া সুন্নাহ।

- রুকু বা সাজদায় তাসবীহ পাঠ না করলে সেক্ষেত্রে সাজদাহ সাহু দেয়া যাবে। যদি না দেই তাহলেও কোন সমস্যা নেই। এটা সুন্নাহ।

- দুই সাজদার মাঝখানে স্থির না হয়ে বসলে সলাতই হবে না কারণ এটা রুকন। দ্বিতীয় সাজদার পর কিছুক্ষণ বসা (জলসাতুল ইসতিরাহা)। এটা সুন্নাহ।

- প্রথম তাশাহহুদে যদি না বসা হয় তবে সাজদাহ সাহু দিতে হবে।

- চার রাক'আত বিশিষ্ট সলাতে ১ম তাশাহহুদের পর দুরূদ পড়লে এতে সাজদাহ সাহু দিতে হবে না। কারণ এটা সুন্নাহ। পড়াটাই সুন্নাহ। যদি ৪টি জিনিস থেকে পানাহ চাওয়ার পরে মনে পরে যে এটা ১ম তাশাহহুদ এতে সাজদাহ সাহু দিতে হবে না। অতিরিক্ত দু'আ পড়াটাও সুন্নাহ।

- প্রথম তাশাহহুদের পর তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় বসলেও সাজদাহ সাহু নাই।

- শেষ রাক'আতে যদি বাতাস বের হয় তবে আবার ওযূ করে সম্পূর্ণ সলাত আদায় করতে হবে। এটাতে কোন সাজদাহ সাহু দিতে হয় না। কারণ সলাত আদায় হয়নি।

সাজদাহ সাহু সম্পর্কে প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ঃ সাজদাহ সাহুর ভিতর কোন নির্দিষ্ট দু'আ পড়ব?

উত্তর ঃ বিশেষ কিছু নেই। এটা অন্যান্য সাজদার মত করেই পড়তে হবে। আলাদা কোন যিকর নেই।

প্রশ্ন ঃ যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সাজদাহ সাহু না করে তাতে তার সলাত নষ্ট হবে কিনা?

উত্তর ঃ যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সাজদাহ সাহু না করে তাহলে সলাত নষ্ট হবে না। কিন্তু এটার জন্য তার গুনাহ হবে। কারণ সে ওয়াজিব নষ্ট করেছে।

প্রশ্ন ঃ এক ব্যক্তি ফজরের সলাতে এসেছে এবং ইমামের পিছনে ১ রাক'আত পেয়েছে এবং ভুল করে সালাম ফিরিয়ে দিয়েছে। সে কি সাজদাহ সাহু দিবে?

উত্তর ঃ ইমামের সাথে ভুল করলে সাজদাহ সাহু দিতে হয় না। তবে ইমাম থেকে আলাদা (পৃথক) হয়ে যাওয়ার পর ভুল করলে তখন তাকে সাজদাহ সাহু দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ সাজদাহ সাহু সালামের আগে না পরে দিতে হয়?

উত্তর ঃ সলাতের ভিতর সাজদাহ সাহু সে ইচ্ছা করলে আগেও দিতে পারে পরেও দিতে পারে।

বিঃ দ্রঃ সাজদাহ সাহুর দুই সাজদার মাঝখানে ইফতিরাশ করে বসবে (বা পায়ের উপর বসা)। সালাম ফিরানোর পূর্বে তাওয়ারুক করে বসতে হবে (নিতম্বের উপর বসা) এবং সালাম ফিরাতে হবে।

তিলাওয়াতে সাজদাহ

এই সাজদাহ করা মুস্তাহাব। এরজন্য ওযূ বা ক্বিবলা শর্ত নয়। এই সাজদাহ ফরয নয়। করলে নেকী আছে, না করলে গুনাহ নেই।

প্রথমে তাকবীর দিয়ে সাজদায় যাবে। অতঃপর দু'আ করবে। সলাতের ভিতরে হলে তাকবীর দিয়ে সাজদাহ করতে হবে।

সাজদায় দু'আ

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، فَتَبَارَكَ اللهُ

أَحسَنُ الْخَالِقِينَ

সাজাদা ওয়াজ হিয়া লিল্লাযী খলাক্বহু, ওয়া শাক্কক্ব মাস'আহু ওয়া বাসারহু, বিহাওলিহি ওয়াক্বুওয়্যাতিহি, ফাতাবা-রকাল্লা-হু আহসানুল খ-লিক্বীন।"

(অর্থ ঃ আমার মুখমন্ডল (আমার সমগ্র দেহ) সাজদায় অবনমিত সেই মহান সত্ত্বার জন্য যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং উহার কর্ণ ও উহার চক্ষু উদ্ভিন্ন করেছেন, স্বীয় ইচ্ছা ও শক্তিতে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ সর্বোত্তম স্রষ্টা।" (তিরমিযী, আহমাদ)।

সাজদায়ে শুকর

কোন খুশীর ব্যাপার/দুঃখ-কষ্ট দূর হবার পর রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সাজদায় পড়ে যেতেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)। এখানেও ওযূ/ক্বিবলা শর্ত নয়। একটি সাজদাহ করতে হবে। শুকরানার সলাত বলে কোন সলাত নেই। শুধুমাত্র সাজদাহ করতে হয়। সাজদায় দু'আ পড়ে উঠার সময় পুনরায় তাকবীর বলার দরকার নেই।

কিছু বাস্তব সিনারিও (Scenario)

সিনারিও ১ ঃ যেমন আমরা নিজ গাড়িতে করে কোথাও যাচ্ছি। পথে মাগরিবের ওয়াক্ত হয়েছে, সলাত আদায় করতে হবে। এখন আমরা যদি গাড়িতে বসে সলাত আদায় করি তাহলে হবে না। আমাদেরকে কোথাও গাড়ি থামিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ঠিক মতো রুকু-সাজদাহ করে সলাত আদায় করতে হবে।

সিনারিও ২ ঃ যেমন আমরা নিজ গাড়িতে করে কোথাও যাচ্ছি। পথে মাগরিবের ওয়াক্ত হয়েছে, সলাত আদায় করতে হবে। কিন্তু প্রচুর ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে এবং গাড়ি থামিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে কোথাও সলাত আদায় করার মতো অবস্থা নেই, আশেপাশে কোন বাড়ি বা শেল্টার নেই। এখন আমরা যদি গাড়িতে বসে সলাত আদায় করি তাহলে হবে।

সিনারিও ৩ ঃ যেমন আমরা পাবলিক বাসে করে কোথাও যাচ্ছি। পথে মাগরিবের ওয়াক্ত হয়েছে, সলাত আদায় করতে হবে, কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছতে ওয়াক্ত পার হয়ে যাবে। যদি বাস ড্রাইভারকে বলে বাস কিছুক্ষণের জন্য থামানো যায় তাহলে বাসের সিটে বসে সলাত আদায় করলে হবে না। আমাদেরকে বাস থেকে নেমে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ঠিক মতো রুকু-সাজদাহ করে সলাত আদায় করে নিতে হবে। যদি বাস থামানো সম্ভব না হয় তাহলে বাসের সিটে বসেই সলাত আদায় করতে হবে।

সিনারিও ৪ ঃ যেমন আমরা নিজ গাড়িতে করে অথবা পাবলিক বাসে করে কোথাও যাচ্ছি। পথে মাগরিবের ওয়াক্ত হয়েছে, সলাত আদায় করতে হবে। যদি দেখি যে মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগেই আমরা গন্তব্যে পৌছতে পারবো তাহলে গাড়িতে বসে সলাত আদায় করলে হবে না।

গন্তব্যে পৌঁছে ঠিক মতো রুকু-সাজদাহ্ করে সলাত আদায় করে নিতে হবে।

সিনারিও ৫ ঃ রসূল ﷺ বলেছেন মসজিদে ঢুকেই দুই রাক'আত সলাত আদায় না করে বসো না। উদাহরণস্বরূপ আমি ফজরে মসজিদে গেলাম জামা'আতে সলাত আদায় করার জন্য কিন্তু ফরয সলাত শুরু হওয়ার আগে যে সময় আছে তাতে শুধু মাত্র দুই রাক'আত সলাত আদায় করা যাবে। এখন আমি ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাহ পড়বো নাকি তাহিয়্যাতুল মসজিদের দুই রাক'আত সুন্নাহ পড়বো? সমাধান হচ্ছে আমি দুই রাক'আত সুন্নাহ পড়বো কিন্তু মনের মধ্যে নিয়ত থাকবে উভয় সুন্নাহর (২+২), অর্থাৎ তাহিয়্যাতুল মসজিদের দুই রাক'আত এবং ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাহ সম্মিলিত নিয়তে আদায় করলে দু'টিই আদায় হয়ে যাবে।

সিনারিও ৬ ঃ ফজর সলাত আদায় করতে গিয়ে মসজিদে গিয়ে দেখলাম জামা'আত শুরু হয়ে গেছে। এখন আমি ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাহ কি আগে পড়ে নিয়ে তারপর জামা'আতে যোগ দিব? সমাধান হচ্ছে জামা'আত চলাকালীন সময়ে কোন প্রকার সুন্নাহ পড়া যাবে না, ইমামের সাথে ফরয সলাতে যোগদান করতে হবে এবং ফরয শেষে দুই রাক'আত সুন্নাহ পড়ে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে ফরয সলাতের জন্য ইকামাত হয়ে গেলে আর কোন সুন্নাহ পড়া যাবে না। (সহীহ বুখারী)

সিনারিও ৭ ঃ রমাদান মাসে আমি 'ইশা এবং তারাবীহ পড়তে মসজিদে গিয়ে দেখি 'ইশার জামা'আত হয়ে গেছে এবং তারাবীর সলাত চলছে। এখন আমি কোন সলাত আদায় করবো? 'ইশা নাকি তারাবীহ? সমাধান হচ্ছে ইমামের পিছনে জামা'আতে যোগদান করা। সকলে তারাবীহ আদায় করছে কিন্তু আমার নিয়ত থাকবে ইমামের পিছনে চার রাক'আত জামা'আতের সাথে 'ইশা আদায় করছি। ইমাম যখন দুই রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরাবে তখন আমি সালাম ফিরাবো না এবং চার রাক'আত 'ইশা সম্পূর্ণ করবো। এতে জামা'আতের সাথে আমার 'ইশার সলাত আদায় হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে মসজিদে ইমামের নেতৃত্বে কোন জামা'আত চললে একাকী কোন সলাত আদায় করা যাবে না অথবা কয়েকজন মিলেও পিছনে আরেকটা জামা'আত করা যাবে না, ইমামের সাথে জামা'আতে যোগ দিতে হবে।

সিনারিও ৮ ঃ বাসায় পরিবারের সবায় মিলে পিতা-মাতা এবং সন্তান জামা'আত করলে কে হবেন ইমাম? সমাধান হচ্ছে, এখানে পিতা হবেন ইমাম এবং তার পিছনে স্ত্রী এবং সন্তানেরা এক লাইনে দাঁড়াবেন। যদি শুধু স্বামী এবং স্ত্রী দুজনে জামা'আত করে সলাত আদায় করতে চান তাহলে কে হবেন ইমাম এবং কিভাবে দাঁড়াতে হবে? সমাধান হচ্ছে, স্বামী হবেন ইমাম এবং স্ত্রী তার পাশে না দাঁড়িয়ে ঠিক ইমামের পিছনে দাঁড়াবেন। এক্ষেত্রে স্বামী সলাতের ইকামাত দিবেন।

সিনারিও ৯ ঃ পুরুষ-মহিলা একই জামা'আতে সলাত আদায় করলে মহিলা কখনো ইমাম হতে পারবেন না। সবসময় পুরুষকেই ইমামতি করতে হবে। যদি সবাই মহিলা হয় তাহলে তাদের ভিতর থেকে একজন মহিলা শুধুমাত্র মহিলাদের ইমামতি করতে পারবেন এবং নিচু স্বরে কিরাত পড়বেন। মহিলা ইমাম প্রথম কাতারে সকলের সাথে একসাথে দাঁড়াবেন। মনে রাখতে হবে সেই জামা'আতে একজনও পুরুষ থাকতে পারবে না।

সিনারিও ১০ ঃ আমি মসজিদে ঢুকে দেখলাম যে জামা'আত হয়ে গেছে এবং দুজন লোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জামা'আত করে সলাত আদায় করছেন। এখন আমি তাদের সাথে কোথায় দাঁড়াবো? সমাধান হচ্ছে যিনি ইমামতি করছেন তার ডান পাশের ব্যক্তিকে পিঠে হালকা স্পর্শ (নক করার মতো) করলে সে পিছনের কাতারে চলে আসবেন এবং তখন ইমাম একা থাকবেন সামনের কাতারে এবং অন্যান্যরা থাকবেন দ্বিতীয় কাতারে। পরবর্তীতে যারা আসবেন তারা দ্বিতীয় কাতারে শরীক হবেন।

সিনারিও ১১ ঃ উপরের সিনারিও অনুযায়ী ইমামের ডান পাশের ব্যক্তিকে পিঠে হালকা স্পর্শ করার পরও যদি সে পিছনের কাতারে চলে না আসে এবং পরবর্তীতে এক এক করে কয়েকজন এসে ইমামের পাশেই দাঁড়াতে থাকেন তাহলে ইমামকেই এক কাতার সামনে চলে যেতে হবে।

সিনারিও ১২ ঃ মসজিদে জামা'আত চলাকালীন সময়ে যদি প্রতিটি কাতার লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমি পিছনে একাকী একটি কাতারে দাঁড়াতে পারবো না। আমাকে শেষ কাতার থেকে একজনকে পিঠে নক করে আমার সাথে নিয়ে আসতে হবে। নক করার পরও যদি সে না আসে তাহলে তাকে ভদ্রভাবে ধরে টেনে নিয়ে আসতে হবে।

সিনারিও ১৩ ঃ আমি মসজিদে মাঝের কোন কাতারে দাঁড়িয়ে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করছি। হঠাৎ আমার ওযূ ছুটে গেল, এখন আমি কী করবো? এ ক্ষেত্রে লজ্জার কিছু নেই, আমাকে সলাত ছেড়ে দিয়ে ওযূ করতে চলে যেতে হবে এবং ওযূ করে এসে আবার জামা'আতে যোগ দিতে হবে। তবে ওযূ করতে গিয়ে যে কয় রাক'আত চলে গেছে তা ইমামের সালাম ফিরানোর পর আমাকে সালাম না ফিরায়ে একাকি পড়ে নিতে হবে।

সিনারিও ১৪ ঃ উপরের সিনারিও অনুযায়ী কাতারের মাঝখান থেকে ওযূ করতে চলে যাওয়াতে তো একটি গ্যাপ তৈরী হয়েছে, এখন কী হবে। এক্ষেত্রে পাশের ব্যক্তি ডানে বা বামে চেপে গ্যাপ পুরণ করে নিবেন, এভাবে কাতারের সবাই এক এক করে চেপে যাবেন। যদি ঐ কাতারের কেউ গ্যাপ পুরণ না করেন তাহলে পিছন থেকে কেউ সামনে এসে গ্যাপ পুরণ করে নিতে হবে। কাতারের মাঝে গ্যাপ রাখা যাবে না।

সিনারিও ১৫ ঃ জামাত চলাকালীন অবস্থায় যদি ইমামের ওযূ ছুটে যায় তাহলে ইমাম সাহেব পিছন থেকে একজন মুসল্লীকে টেনে এনে তার স্থানে দাঁড় করিয়ে দিবেন ইমামতি করার জন্য। এভাবে সলাতের মধ্যে কোন ব্রেক হবে না, নতুন ইমাম একইভাবে সলাত চালিয়ে যাবেন। ইমাম ওযূ করে এসে মুসল্লী হিসেবে অন্যান্যদের সাথে কাতারে দাঁড়িয়ে যাবেন।

সলাতে একাগ্রতার কিছু নমুনা

'যাতুর রিকা' অভিযানে মুসলিমদের এক ব্যক্তি এক মুশরিক মহিলাকে হত্যা করে ফেললে তার স্বামী প্রতিজ্ঞা করল যে, মুহাম্মাদের সঙ্গীদের মধ্যে কারো রক্ত না বহানো পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হবে না। এই সংকল্প নিয়ে সে মহানাবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের খোঁজে বের হয়ে পড়ল। এদিকে মহানাবী ﷺ এক মঞ্জিলে বিশ্রাম নিতে অবতরণ করলে সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে বললেন, "কে আমাদের (নিরাপত্তার) জন্য পাহারা দিবে?" এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুহাজিরদের মধ্যে এক ব্যক্তি এবং আনসারদের মধ্য হতে আর এক ব্যক্তি পাহারা দিতে প্রস্তুত হলেন। তাঁদেরকে মহানাবী ﷺ বললেন, "তোমরা এই উপত্যকার মুখে অবস্থান কর।"

অতঃপর তাঁরা দু'জন যখন উপত্যকার মুখে পৌঁছলেন, তখন মুহাজের (বিশ্রামের জন্য) শয়ন করলেন এবং আনসারী উঠে নফল সলাত পড়তে শুরু করলেন। এমতাবস্থায় উক্ত মুশরিক লোকটি কাছাকাছি এসে যখন তাঁর (নামাযীর) আবছা দেহ দেখতে পেল, তখন সে বুঝল, নিশ্চয় ও মুহাম্মাদের গুপ্তচর। সুতরাং তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে তা সঠিক নিশানায় পৌঁছে আনসারীকে আঘাত করল। তিনি তীর দেহ থেকে বের করে দিয়ে সলাতেই মশগুল থাকলেন। এভাবে পরপর তিন খানা তীর খেয়ে ও তা বের করে ফেলে রুকু-সাজদাহ করে সম্পন্ন করলেন। অতঃপর তার মুহাজির সঙ্গী জেগে উঠলেন। মুশরিকটি তার কথা ওঁরা জানতে পেরেছেন ভেবে পালিয়ে গেল। এরপর মুহাজির যখন আনসারীর রক্তাক্ত দেহের প্রতি লক্ষ্য করলেন, তখন বলে উঠলেন, 'সুবহানাল্লাহ! প্রথম বারেই যখন তীর মারল, তখনই কেন আমাকে জাগিয়ে দাও নি?" আনসারী উত্তরে বললেন, 'আমি এমন একটি সূরা পাঠ করছিলাম, যা শেষ না করে আমি ছাড়তে পছন্দ করলাম না!' (আবূ দাউদ ১৯৮ নং, আহমাদ)

আলী বিন হুসাইন (রা.) যখন সলাতের জন্য ওযূ সম্পন্ন করতেন, তখন তাঁর দেহে কম্পন শুরু হত! এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, 'ধিক তোমাদের প্রতি! তোমরা জান কি, কার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি? কার সাথে মুনাজাত (নির্জনে আলাপ) করতে চলছি? (হিলয়্যাতুল আওলিয়া ২/১৩৩)

সলাতের কোয়ালিটি কিভাবে বাড়াবো?

১) অল্প পানি দিয়ে খুবই যত্নসহকারে ওযূ করি, পানির অপচয় না করি।

২) সলাতের ভেতর সূরাগুলো খুবই আস্তে আস্তে তিলাওয়াত করি এবং সেইসাথে অর্থগুলো অনুধাবন করতে থাকি। দাঁড়ানো অবস্থায় আমাদের দৃষ্টি থাকবে সাজদার স্থানের উপর। সলাতের মধ্যে নড়া-চড়া না করার চেষ্টা করি এবং এদিক সেদিক না তাকাই।

৩) খুবই ধীরে ধীরে রুকুতে যাবো, রুকুর সময় পিঠ যেন সোজা থাকে, বাঁকা যেন না হয় এবং আমাদের দৃষ্টি এবারও সাজদার স্থানে রাখি। রুকুতে দীর্ঘ সময় কাটাই এবং তাসবীহগুলো খুবই ধীরে ধীরে পড়তে থাকি এবং সেই সাথে অর্থগুলোও অনুধাবন করার চেষ্টা করি। রুকুতে তাসবীহগুলো তিনবার করে পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং তারও

বেশী সংখ্যক পড়ার চেষ্টা করি। মনে রাখতে হবে রুকুতে কুরআন পড়া নিষেধ।

৪) রুকু থেকে খুবই ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াই এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কিছুটা সময় নেই এবং দাঁড়ানো অবস্থায় দু'আ পড়ি। রুকু থেকে উঠে সাথে সাথেই যেন তাড়াহুড়ো করে সাজদায় চলে না যাই।

৫) এবার সাজদায় যাবো খুবই ধীরে ধীরে। সাজদায় অবশ্যই দীর্ঘ সময় কাটাবো এবং তাসবীহগুলো খুবই ধীরে ধীরে পড়বো, সেইসাথে অর্থগুলোও অনুধাবন করতে থাকবো। এখানে খেয়াল করি আমাদের মালিক, আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে দেখছেন এবং আমার যা-যা প্রয়োজন তা তার কাছে আকুল আবেদনের মাধ্যমে বলছি। এখানেও সতর্ক থাকতে হবে যে সাজদায় কুরআন পড়া নিষেধ।

৬) দুই সাজদার মাঝে বসে যথেষ্ট সময় নেই এবং দু'আ পড়ি, এই দু'আতে রিযিক বাড়িয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। সাজদাহ শেষ করে সরাসরি উঠে যেন না দাঁড়াই, একটু বসে তারপর দাঁড়াই।

৭) শেষ বৈঠকে আরাম করে বসি, আমাদের দৃষ্টি ডান হাতের শাহাদাত আঙুলের উপর রাখি। এখানেও খুবই ধীরে সুস্থে সব কিছু পড়ি, তাড়াহুড়ো না করি এবং যা পড়ছি তার অর্থগুলো অনুধাবন করি। শেষ বৈঠকে শেষের দিকে নিজের ভাষায়ও মহান আল্লাহর নিকট কিছু চাইতে পারি বা দু'আ করতে পারি।

৮) সলাত শেষে যখন সালাম ফিরাবো তখন অন্তর থেকে সত্যিকার অর্থেই আমাদের ডানে-বামে সকলের জন্য শান্তি কামনা করবো।

৯) ফরয সলাত শেষ করে সাথে সাথেই সুন্নাত সলাত পড়া শুরু করে দেবো না যদি কোন জরুরী কাজ না থাকে। রসূল ﷺ ফরয সলাত আদায়ের পরে কিছু তাসবীহ পাঠ করতেন। আমরাও ফরযের পর আরাম করে বসবো এবং ধীরে ধীরে তাসবীহগুলো পাঠ করবো এবং সেই সাথে অর্থগুলোও অনুধাবন করতে থাকবো। তোতা পাখির মত তাড়াহুড়ো করে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা শেষ করার জন্য তাসবীহ পাঠ করবো না বা গুনবো না।

১০) শয়তান সলাতের মধ্যে চেষ্টা করবে আমাদের মনকে অন্যদিকে সরিয়ে নিতে। কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে খুবই সচেতন থাকবো। আমরা যখন

সচেতন থাকবো তখন শয়তান হয়ত অন্য পলিসি গ্রহণ করবে, সে আমাদের মনের মধ্যে ভালো ভালো চিন্তার বিষয় এনে দেবে।

আরো কিছু টিপ্‌স

- সলাতে একপায়ে ভর করে দাঁড়ানো যাবে না।
- সলাতে কোন কিছুর সাথে ঠেস বা হেলান দিয়ে দাঁড়ানো যাবে না।
- ক্ষুধার্ত অবস্থায় সলাতে না দাঁড়ানোই ভাল যদি হাতে সময় থাকে।
- সলাতের আগে খাবার সামনে এসে গেলে খাবার আগে খেয়ে নেয়া।
- খুব ভরা পেটেও সলাতে না দাঁড়ানোই ভাল যদি হাতে সময় থাকে।
- পায়খানা-প্রস্রাবের বেগ থাকলে সলাতে না দাঁড়ানো, ওটা আগে সেরে নেয়া।
- দৌঁড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সলাতে না দাঁড়ানো।
- সলাতের মধ্যে অযথা নড়া-চড়া না করা। সলাতে এদিক ওদিক না তাকানো, দৃষ্টি রাখতে হবে সাজদার স্থানে।
- সলাতের মধ্যে নাক, কান বা শরীর না চুলকানো এবং সলাতের মধ্যে কাপড় ঠিক না করা যদি সতর বের হয়ে না গিয়ে থাকে।
- সলাতের মধ্যে হাসাহাসি এবং ঠেলাঠেঠি করা যাবে না।
- সলাতের মধ্যে 'হাই' না দেয়ার চেষ্টা করা। 'হাই' এসে গেলে হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরা, কারণ এটা আসে শয়তান থেকে এবং হা করলে শয়তান মুখের মধ্যে ঢুকে পরে।
- অপরিষ্কার কাপড় পরে বা ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে সলাতে না দাঁড়ানো। প্রয়োজনে সলাতের জন্য এক সেট পরিষ্কার কাপড় আলাদা করে রাখা যেতে পারে।
- খুব দ্রুত সূরা ক্বিরাত না পড়া এবং খুব দ্রুত সলাত শেষ না করা। সবই করতে হবে ধীরে ধীরে।
- আওয়াল ওয়াক্তেই সলাত পড়া উত্তম অর্থাৎ যখন সলাতের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং ওয়াক্ত শেষের দিকে সলাত রেখে না দেয়া।
- ফরয সলাতগুলো অবশ্যই জামা'আতে পড়ার চেষ্টা করা।
- সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে ইমামের আগে যেন রুকু-সাজদাহ না হয়ে যায় এবং সালামও যেন না ফিরানো হয়।

৭ম অধ্যায়
আমরা কি মাযহাব
মানতে বাধ্য?

আমরা কি মাযহাব মানতে বাধ্য?

মাযহাব কী? মাযহাব অর্থ মত ও পথ। সারা পৃথিবীতে ছড়ানো সুন্নী মুসলিমদের চারটি মত ও পথ। সুন্নীদের ফিকহ (Fiqh or Jurisprudence) এর বিখ্যাত চার ইমামের নামানুসারে আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে বিভক্ত চারটি মত ও পথের অনুসারীগণ – যেমন ঃ হানাফী, মালিকি, শাফেঈ এবং হান্‌বালী মাযহাব। মাযহাবের অস্তিত্ব রসূলুল্লাহ ﷺ এর যমানায় ছিল না, এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে তাঁর মৃত্যুর চারশত বছর পর।

মায্‌হাব হচ্ছে কতিপয় মাসয়ালা-মাসায়েলের ব্যাপারে ওলামাদের মতামত, অনুধাবন ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান। আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এই জ্ঞান, গবেষণা এবং মতামতের অনুসরণ করা কারো উপর অপরিহার্য করেননি। কেননা মতামতের মধ্যে শুদ্ধ-অশুদ্ধ উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান। তবে মাযহাবসমূহের যে সব বিষয় কুরআন-সহীহ হাদীস এর উপর নির্ভরশীল শুধু সেগুলোই অনুসরণ করা ওয়াজিব। আর যেগুলো কুরআন-হাদীসের বাণী দ্বারা সমৃদ্ধ নয়, সেগুলো মতামত ও ইজতিহাদের বিষয়; এতে শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ উভয় সম্ভাবনা রয়েছে।

যে সকল মত ও পথ কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা মোটেও সমর্থিত নয়, এগুলো ইসলাম ধর্মে নূতন সৃষ্টি। মাযহাব মেনে চলা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল বা মুবাহ কোনটাই নয়। জেনে রাখা ভালো যে মুসলিমদের জন্যে একটি মাত্র মাযহাব আল্লাহ অনুমোদন করেছেন তাদেরকে বিভ্রান্তি থেকে বাঁচানোর জন্যে, এবং সেই মাযহাব হচ্ছে কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাযহাব যা তিনি তাঁর জীবিতকালে তাঁর সাহাবীগণ, তৎপর তাঁর চার খলিফা, তাবিঈন, তাবি-তাবিঈনগণ অনুসরণ করে গেছেন। মুসলিমদের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন দল ও মত সৃষ্টি করা আল্লাহ নিষেধ করেছেন (কুরআন ৭ ঃ ১৫৩; ৩ ঃ ১০৩)

অনেকে বলেন কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবকে অবশ্যই মানতে হবে এবং মাযহাবের সংমিশ্রণ করা যাবে না। এই ধরণের কথা ঠিক নয়। আমরা মাযহাব মানতে অবশ্যই বাধ্য না। কোন মাযহাবের ঐ বিষয়টুকু শুধু মানবো যেটুকু সহীহ হাদীস ভিত্তিক। যা সহীহ হাদীস ভিত্তিক না তা অবশ্যই মানা যাবে না। এটি রসূল ﷺ এর অর্ডার।

অন্ধ অনুসরণ বা তাকলীদ করা নিষেধ

তাকলীদ ঃ বিনা দলিলে কারো কথার উপর আমল করাকে বলে 'তাকলীদ'। অথবা দলিল ব্যতীত কারো কথা গ্রহণ করাকে বলা হয় 'তাকলীদ'।

সাবধানতা ঃ তাই কুরআন-হাদীসের দলিল ছাড়া কোন ব্যক্তির কথার উপর কোন প্রকার আমল করা যাবে না এবং রসূল ﷺ ছাড়া আর কাউকে অন্ধ অনুসরণও করা যাবে না সে যতো বড় বুজুর্গই হোক না কেন। (আবু দাউদ থেকে বর্ণিত)

হানাফী মাযহাব সংক্রান্ত জটিলতা

চার ইমামকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাদের প্রত্যেকেই তাদের নিকট যে হাদীসসমূহ পৌঁছেছিল তার উপর ইজতেহাদ করেছিলেন। তাদের একে অপরের সাথে যে মত পার্থক্য ঘটেছিল তার বিশেষ কারণ হচ্ছে, কারো নিকট কোন হাদীস পৌঁছেছিল যা অন্যের নিকট পৌঁছে নাই। কারণ, সেই যামানায় হাদীসের খুব বেশী প্রসার ঘটেনি। আর হাদীসের হাফিজগণ নানা এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। কেউ ছিলেন হিজাযে, কেউ সিরিয়া, কেউ ইরাকে, কেউ মিসরে বা অন্যান্য কোন মুসলিম দেশে। তাদের যামানায় এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাতায়াত ছিল খুবই কঠিন ও কষ্টবহুল। সে কারণে দেখতে পাওয়া যায়, ইমাম শাফিয়ী (রহ.) যখন ইরাক ছেড়ে মিসরে গেলেন তখন ইরাকে তার যে পুরাতন মাযহাব ছিল তা ত্যাগ করেন। কারণ, তখন তাঁর সম্মুখে নতুন নতুন বহু সহীহ হাদীস উপস্থাপিত হয়।

তাই যেমন একটি উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর মাযহাব হচ্ছে কোন মহিলাকে স্পর্শ করলে ওযূ ছুটে যায় কিন্তু অন্যদিকে ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ.)-এর মতে ছুটে না। এমতাবস্থায় আমাদের উপর ওয়াজিব হল কুরআন ও সহীহ সুন্নাতের সন্ধান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর তবে তার বিচারের ভার আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ছেড়ে দাও যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনে থাক। এটাই হচ্ছে উত্তম এবং সঠিক ব্যাখ্যা।” (সূরা নিসা ঃ ৫৯)

আর আমাদেরকে তো হুকুম করাই হয়েছে আল্লাহ তা’আলার নিকট হতে যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য। আর রসূল ﷺ আমাদেরকে সহীহ হাদীসের মাধ্যমে উহার ব্যাখ্যা দান করেছেন। কারণ আল্লাহ তা’আলা বলেন ঃ

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

“তোমাদের রবের তরফ হতে যা তোমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অনুসরণ কর। তাকে ছেড়ে অন্য কোন আউলিয়াদের অনুসরণ কর না। তোমরা খুব কমই ইহা স্মরণ কর।” (সূরা আ’রাফ ঃ ৩)

তাই কোন মুসলিমের সামনে কোন সহীহ হাদীস পেশ করলে তাকে এই বলে ত্যাগ করা জায়িয নেই যে, এটা আমাদের মাযহাবে নেই। কারণ সমস্ত ইমামগণের ইজমা হচ্ছে সর্বদা সহীহ হাদীস গ্রহণ করা, আর উহাদের খেলাফ তাদের যে মতবাদ তা পরিহার করা।

এখন Information Technology-র যুগ। আমাদের সামনে সকল তথ্য বিদ্যমান। কোনটি সহীহ এবং কত % সহীহ, কোনটি দুর্বল এবং কত % দুর্বল আর কোনটি জাল এবং কত % জাল ইত্যাদি সব তথ্য রয়েছে। হাদীস বিশারদগণ রসূল ﷺ -এর মৃত্যুর পরদিন থেকে দিনের পরদিন গবেষণা করে এগুলো সব বের করেছেন। এখন আর কোন বিষয় অস্পষ্ট বা গোপন নেই। কোন কোন গবেষক নির্দিষ্ট কয়েকটি হাদীসের উপরও পি.এই.ডি করছেন, কেউ আল কুরআনের একটি মাত্র সূরার উপর দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে পি.এই.ডি করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করছেন। কুরআন-হাদীসের বিষয়গুলো গবেষণা করে এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আজ এর ফলাফল শুধু আরবী ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, পাবলিশ হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়।

হানাফী মাযহাবের দুর্বলতা কোথায়?

ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) যখন ইসলামের উপর কাজ করেছেন তখন রসূল ﷺ এর হাদীসগুলো কম্পাইল হয়নি। তখন সারা পৃথিবীতে হাদীসগুলো ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় ছিলো। তার উপর ছিল হাজার হাজার সহীহ, দুর্বল এবং জাল হাদীসের সংমিশ্রণ। তখনও হাদীস নিয়ে ঐ পরিমাণ গবেষণা হয়নি এবং ফিল্টারিংও হয়নি যে কোনটি সহীহ আর কোনটি জাল। ইমাম আবূ হানিফা (রহ.)-র নিকট ছিল তখন এই নানারকম সংমিশ্রিত হাদীস এবং তিনি যা পেয়েছেন তার উপর ভিত্তি করে সমসাময়িক ফতোয়া দিয়েছেন। এরপর ইমাম আবূ হানিফা (রহ.)-এর ছাত্র অন্যান্য তিন ইমাম এসেছেন, যুগের উন্নতি হয়েছে। হাদীসের উপর গবেষণা করে সহীহ-দুর্বল-জাল হাদীসের সংকলন বের হয়েছে। সলাতসহ ইসলামের অন্যান্য বিষয়গুলো সহীহ হাদীস ভিত্তিক প্রকাশ পেয়েছে। ইমাম আবূ হানিফা যে বিষয়গুলো দুর্বল বা জাল হাদীসের উপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিয়েছিলেন পরবর্তিতে সেই বিষয়ের উপর সহীহ হাদীস সামনে আসাতে ইমাম আবূ হানিফার ফতোয়া অগ্রহণযোগ্য এবং বাতিল হয়ে গেছে।

চার ইমামের ফতোয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী দুর্বল এবং জাল হাদীস ভিত্তিক হচ্ছে ইমাম আবূ হানিফা (রহ.)-র ফতোয়া, কারণ চারজনের মধ্যে তিনিই এসেছেন সর্বপ্রথম। আমরা একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাই যে ইমাম আবূ হানিফা (রহ.)-এর ছাত্র পরবর্তি তিন ইমামই ইমাম আবূ হানিফাকে অনুসরণ করেননি। তারা ইমাম আবূ হানিফার ফতোয়াকে বাদ দিয়ে নতুন করে ফতোয়া দিয়েছেন। কারণ তাদের হাতেও নতুন নতুন সহীহ হাদীসের সমারোহ ঘটেছে। ইমাম আবূ হানিফার ফতোয়া যদি সঠিক থাকতো তাহলে তারা নতুন মাযহাব সৃষ্টি না করে সরাসরি ইমাম আবূ হানিফাকেই অনুসরণ করতেন। কিন্তু তারা তা না করে ইমাম আবূ হানিফাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেনি।

হাদীস সম্বন্ধে ৪ মাযহাবের ৪ ইমামের বক্তব্য

নিম্নে ইমামগণের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে। তাদের উল্লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে, তাদের উপর যেসব দোষারোপ করা হয়, তা দূরীভুত হবে এবং তাদের অনুসারীদের নিকট সত্য উদঘাটিত হবে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) বলেন ঃ

১. কোন ব্যক্তির জন্য হালাল হবে না আমাদের কোন কথাকে গ্রহণ করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জ্ঞাত হবে এটা আমরা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি ।

২. ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম, যে আমার দলিল না জেনে, শুধু কথার উপর ফতোয়া দেয় । কারণ আমরা মানুষ । আজ এক কথা বলি আগামীকাল আবার ওটা হতে প্রত্যাবর্তন করি ।

৩. যদি আমি এমন কোন কথা বলি, যা আল্লাহর কিতাব কিংবা রসূল ﷺ -এর কথার সাথে বিরোধপূর্ণ হয়, তখন আমার কথাকে ত্যাগ করবে ।

৪. ইমাম ইবনে আবেদীন তার কিতাবে বলেন ঃ যদি কোন হাদীস সহীহ হয় আর ওটা মাযহাবের বিরোধী হয় তথাপি ঐ হাদীসের উপর আমল করতে হবে । ওটাই হবে তার জন্য মাযহাব । কোন মোকাল্লেদ ওটার উপর আমলের দ্বারা হানাফী মাযহাব হতে বের হয়ে যাবেন না । কারণ সহীহ রেওয়াতে ইমাম ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) হতে বর্ণিত আছে, যদি হাদীস সহীহ হয় তবে ওটাই আমার মাযহাব ।

সোর্স ঃ ইবনু আবিদীন এর হাশিয়া ১ম খণ্ড ৬৩ পৃষ্ঠা, رسم الفتي ১ম খণ্ড ৪র্থ পৃষ্ঠা, ছালিহ আর ফাল্লানীর إيقاظ الهمم পৃষ্ঠা ৬২ ।

ইবনু আব্দিল বর এর الإنتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء পৃষ্ঠা ১৪৫ ইবনুল কাইয়িম এর إعلام الوقعين (২/৩০৯), ইবনুল আবিদীন البحر الرائق এর টীকায় (৬/২৯৩), رسم الفتي পৃষ্ঠা ২৯, ৩২, শা'রানীর اليزان এ দ্বিতীয় বর্ণানাটি রয়েছে (১/৫৫) আর তৃতীয় বর্ণনা পাওয়া যাবে আব্বাছ আদ্‌দূরীর বর্ণনায় ইবনু মা'ঈন এর التاريخ গ্রন্থে (৬/৭৭/১) যুফার থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে ।

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন ঃ

১. আমিতো একজন মানুষ মাত্র । ভুলও করি, শুদ্ধও করি । তাই আমার রায়কে উত্তমভাবে পর্যবেক্ষণ কর । তার মধ্যে যেগুলো কুরআন-হাদীসের সাথে মিলে তাদের গ্রহণ কর । আর যেগুলো কুরআন ও হাদীসের সাথে মিলে না তাকে ত্যাগ কর ।

২. রসূল ﷺ -এর পরে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার কিছু কথা গ্রহণ করাও চলে, আর কিছু ত্যাগ করাও চলে। শুধুমাত্র নাবী ﷺ -এর সব কথা গ্রহণযোগ্য।

সোর্স ঃ ইবনু আব্দিল বর الجامع الصغير গ্রন্থে (২/৩২) তাঁর থেকে ইবনু হাযম أصول الأحكام গ্রন্থে (৬/১৪৯) ফাল্লানী ৭২ পৃষ্ঠা।

ইবনু আব্দিল বর ঘটনাটি الجامع এর (২/৯১) পৃষ্ঠায় এবং ইবনু হাযম أصول الأحكام এর (৬/১৪৫, ১৭৯) পৃষ্ঠায় হাকাম ইবনু উতাইবাহ ও মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাক্বীউদ্দীন আস্ সুবকী الفتاوى এর (১/১৪৮) পৃষ্ঠায় ইবনু আব্বাসের কথা হিসাবে উদ্ধৃত করেন।

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেন ঃ

১. এমন কেউ নেই যার নিকট রসূল ﷺ -এর কিছু সুন্নাত আছে আর কিছু গায়েব আছে। তাই আমি যত কথাই বলি না কেন, আর যত উসূলী কথাই বলি না কেন, যদি রসূল ﷺ হতে তার বিপরীত কোন কথা আমার দ্বারা বলা হয়ে থাকে তবে রসূল ﷺ -এর কথাই গ্রহণযোগ্য, আর ওটাই আমার মত বলে ধরা হবে।

২. মুসলিমদের ইজমা হয়েছে যে যদি কারও নিকট রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন সুন্নাত প্রকাশিত হয় তাঁর কথাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কথা গ্রহণ করা তার জন্য জায়িয হবে না।

৩. যদি আমার কোন কিতাবে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের পরিপন্থী কোন কথা দেখতে পাও তবে তোমরা রসূল ﷺ -এর কথাকেই গ্রহণ করবে। ওটাই আমার কথা।

৪. যদি কোন হাদীস সহীহ হয় তবে ওটাই আমার মাযহাব।

৫. একদা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে সম্বোধন করে বলেন ঃ তোমরা আমার থেকে হাদীস ও তার বর্ণনাকারীদের বিষয়ে অধিক জ্ঞাত আছ। যদি কোন সহীহ হাদীস পাও তবে সাথে সাথে আমাকে জ্ঞাত করবে যাতে আমি তার উপর মাযহাব বানাতে পারি।

৬. ঐ সমস্ত মাসআলা যাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আমি যা বলেছি তা সহীহ হাদীসের বিপরীত তবে আমি আমার জীবিত অবস্থায় ও মৃত্যুর পরও ওটা হতে বিরত হচ্ছি।

সোর্স ঃ হাকিম স্বীয় অবিচ্ছিন্ন সূত্রে শাফি'ঈ থেকে বর্ণনা করেন যেমন রয়েছে ইবনু আসাকির এর تاريخ دمشق গ্রন্থের (১৫/১/৩ পৃষ্ঠা) إعلام الموقعين গ্রন্থে (২/৩৬৩, ৩৬৪ পৃষ্ঠা) ও الإيقاظ গ্রন্থে (১০০ পৃষ্ঠা)।

ইবনুল কাইয়িম (২/৩৬১), আল ফাল্লানী (৬৮ পৃষ্ঠা)।

আল হারাবীর ذم الكلام গ্রন্থে (৩/৪৭/১), খত্বীবের الاحتجاج بالشافعي গ্রন্থে (৮/২), ইবনু আসাকির (১৫/৯/১), নববীর الجموع গ্রন্থে (১/৬৩), ইবনুল কাইয়িম (২/৩৬৮), আল ফাল্লানী (১০০ পৃষ্ঠা)। অপর বর্ণানাটি আবূ নুআইমের الحاية গ্রন্থে (৯/১০৭), ইবনু হিব্বানের الصحيح গ্রন্থে (৩/২৮৪-ইহসান) স্বীয় বিশুদ্ধ সনদে ইমাম থেকে তার (আবু নুআইমের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

নববীর পূর্বোক্ত কিতাবে, শা'রানী তার গ্রন্থে (১/৫৭ পৃষ্ঠা) এটাকে হাকিম বাইহাক্বীর কথা বলে উল্লেখ করেন। আল ফাল্লানী ৯১০৭ পৃষ্ঠা)।

ইবনু আবি হাতিম آداب الشافعي গ্রন্থের ৯৪-৯৫ পৃষ্ঠাতে, আবু নুআইম الحاية গ্রন্থের (৯/১০৬)। খত্বীব الاحتجاج بالشافعي গ্রন্থের (৮/১) খত্বীব থেকে ইবনু আসাকির তার গ্রন্থে (১৫/৯/১) পৃষ্ঠা ইবনু আব্দিল বর الانتقاء গ্রন্থে পৃষ্ঠা ৭৫। ইবনুল জাউযী الإمام أحمد مناقب পৃষ্ঠা ৪৯৯ ও আলহারাবী তার গ্রন্থের (২/৪৭/২) পৃষ্ঠাতে বর্ণনা করেন।

আবু নুআইম الحاية তাঁর গ্রন্থে (৯/১০৭ পৃষ্ঠা), আর হারাবী তার গ্রন্থের (১/৪৭ পৃষ্ঠা), ইবনুল কাইয়িম إعلام الموقعين গ্রন্থের (২/৩৬৩ পৃষ্ঠা), আল ফুল্লানী (১০৪ পৃষ্ঠা।

ইবনু আবী হাতিম آداب الشافعي গ্রন্থে (৯৩ পৃষ্ঠা), আবুল কাসিম আস্ সামার কান্দি الأمالي তে, আরো রয়েছে আবু হাফছ আল মুআদ্দাব এর المنتقى منها (১/২৩৪)-তে আবু নুআইম الحاية (৯/১০৬ পৃষ্ঠা), ইবনু আসাকির (১৫/৯/২) বিশুদ্ধ সনদে।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন ঃ

১. আমাকে তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) কর না, আর না মালিক বা শাফিয়ী (রহ.) বা আওযায়ী (রহ.) অথবা সাওরী (রহ.)-কে অনুসরণ কর। বরং তারা যেখান হতে গ্রহণ করেছে সেখান হতে গ্রহণ কর। (যারা বুঝেছে ও শিখেছে তাদের হতে)।

২. যে ব্যক্তি রসূল ﷺ -এর কোন হাদীসকে অস্বীকার করবে সেতো ধংসের মুখামুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

সোর্স ঃ ইবনু আবী হাতিম (৯৩ পৃঃ), আবু নুআইম ও ইবনু আসাকির (১৫/৯/২), ইবনু আবী হাতিম (৯৩-৯৪ পৃঃ), আল ফাললানী (১১৩ পৃঃ), ইবনুল কাইয়িম এর আলআলাম (২/৩০২ পৃঃ), ইবনুল জাউযী (১৮২ পৃঃ)।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-র কিতাব সম্পর্কে কিছু গুরত্বপূর্ণ তথ্য

হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ কোন বিষয়েই ইমাম আবূ হানীফা কোন কিতাব লিখে যাননি। তিনি বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন বিষয়ে, কিছু পত্র লিখেছিলেন, তার মৃত্যুর পর ঐ সকল পত্রসমূহ বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়; যেমন ফিকহুল আকবার, আল আলিমু অল মুতাআল্লিমু, আর-রাদ্দু আলাল কাদরিয়াহ প্রভৃতি। রাদ্দুল মুহ্তার, মুকাদ্দামা, নাকলু মাযহাবী আবূ হানীফা ১ম খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা।

- "ইমাম আবূ হানীফা তাঁর শিষ্যদিগকে মৌখিক শিক্ষাদান করতেন, তিনি তাঁর কিছুই লিখিয়েও যান নাই।" (ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস- ১৯৬ পৃষ্ঠা, সামসুদ্দীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)
- ইমাম আবূ হানীফা আলোচনা মৌখিক করতেন, লেখাতেন না। তিনি বলতেন "আমি একজন মানুষ, আজ একটি মত প্রকাশ করছি। পরের দিন বিবেচনা করে দেখছি আমার গতকালের মত ঠিক ছিল না। তাই গতকালের মত পরিবর্তন করি। তাই আমার মতামত কেউ লিখে রাখবে না।" *(তাবিলু মুখতালিফিল হাদীস- ৬২-৬৩ পৃষ্ঠা, মুহাম্মাদ বিন কুতাইবা, সিফাতু সালাতিন্নবী-২৫ পৃষ্ঠা)*

আল মুখতাসারুল কুদূরী ঃ এ গ্রন্থখানি বর্তমান বিশ্বে হানাফী মাযহাবের "কিতাব" নামে পরিচিত। হানাফী ফিকাহ অথবা হানাফী ফিকার কোন গ্রন্থে "কিতাবে আছে" বলে উল্লেখ থাকলে বুঝে নিতে হবে কিতাব অর্থ আল মুখতাসারুল কুদূরী। অতএব, গ্রন্থখানি হানাফী মাযহাবের গ্রন্থ বলে নির্ধারিত। *(মাদরাসার পাঠ্য দাখিল নবম ও দশম ভূমিকা, ৭ পৃষ্ঠা গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী, আরাফাত পাবলিকেশন্স। ফিকার ক্রমবিকাশ পৃষ্ঠা* ১১২, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন।)*। এই গ্রন্থে ১২ হাজার মাসআলাহ আছে। হানাফী ফিকাহ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানি উপমহাদেশের সকল হানাফী মাদরাসার পাঠ্যভুক্ত।

গ্রন্থকার পরিচিতি ঃ নাম - আবুল হাসান, পিতার নাম আহমাদ। কুদূরী নামেও পরিচিত। হাঁড়ি-পাতিলকে বলা হয় কুদূর। সেই আমলে হাঁড়ি-পাতিলের ব্যবসায়ীদেরকে বলা হতো কুদূরী।

তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ৩৬২ হিজরীতে। মৃত্যুবরণ করেন ৪২৮ হিজরীতে। গ্রন্থখানি তিনি নিজ হাতে লিখেন নাই। কিতাবের শুরুতে লিখিত আছে যে, "আবুল হাসান বলেছেন-"। এতে প্রমাণ হয় যে, আবুল হাসান ১২ হাজার মাসআলাহ বলেছেন, অন্য যে কেউ তা লিপিবদ্ধ করেছেন। অতঃপর ঐ লিপিবদ্ধ গ্রন্থকে আল মুখতাসারুল কুদূরী নামকরণ করা হয়েছে। কে লিখেছেন, তার নাম, ঠিকানা কিছুই জানা যায় না। অতএব, সংকলনকারীর নাম ও ঠিকানা বিহীন এই গ্রন্থখানাই হল হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব।

আবুল হাসানের মৃত্যুর দিন যদি গ্রন্থ লেখার শেষ দিন ধরা যায় তাহলে গ্রন্থ লেখা হয় ৪২৮ হিজরীতে। হানাফী মাযহাব অর্থ ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-র জন্ম ৮০ হিজরীতে, মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-র মৃত্যুর (৪২৮-১৫০)=২৭৮ বৎসর পর গ্রন্থটি সংকলিত হয়। আবুল হাসানের সাথে ইমাম আবূ হানীফার কোন দিন সাক্ষাত হয়নি। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-র কথাগুলি কার নিকট পেলেন তার কোন সূত্র বর্ণনা করেন নাই। অতএব, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-র নামে বর্ণিত কথাগুলির কোন সূত্র নেই। তেমন বহু কথা আছে যা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-র নয়, তাও হানাফী মাযহাব বলে পরিচয় দেয়া হয়।

সিহাহ সিত্তার সংকলনের বহু বছর পর আল মুখতাসারুল কুদূরী হানাফী মাযহাবের কিতাব লিপিবদ্ধ হয়। এই কিতাবে সিহাহ সিত্তার কোন বরাতও নেই।

আল হিদায়া ঃ এ গ্রন্থখানি মুখতাসারুল কুদূরীর ব্যাখ্যা। লেখক হলেন আলী বিন আবী বকর। ব্যাখ্যা গ্রন্থখানি লেখা হয় ৫৯৩ হিজরীতে। মুখতাসারুল কুদূরীর (৫৯৩-৪২৮)=১৬৫ বৎসর পর। মুখতাসারুল কুদূরীর লেখকের সাথে হিদায়ার লেখকের কোন দিন সাক্ষাত হয় নাই। মাদরাসার পাঠ্য হিদায়া ঃ ফাজিল ক্লাসের পাঠ্য।

হিদায়ার লেখক কোন হাদীসবিদ ছিলেন না। ফলে তিনি জাল, যঈফ সকল শ্রেণীর হাদীস নির্বিচারে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি ৫১১ হিজরীতে তুর্কি অঞ্চলের কারগান নামক প্রদেশের মুরগিনান নামক শহরে

জন্মগ্রহণ করেন এবং সমরকন্দ (তুর্কিঅঞ্চল) নামক শহরে ৫৯৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

হিদায়া ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-র মৃত্যুর (৫৯৩-১৫০)=৪৪৩ বৎসর পর লেখা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-র নামে বহু কথা বলা হয়েছে কিন্তু তার কোন সূত্র বলা হয় নাই। হিদায়ার লেখক ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-র মৃত্যুর (৫১১-১৫০)=৩৬১ বৎসর পর জন্ম নিয়ে কিভাবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-র মতামত অবগত হলেন তার কোন সূত্রই বলেন নাই।

এ কিতাবখানিতেও সিহাহ সিত্তার কোন বরাত নাই। অথচ সিহাহ সিত্তার সংকলন হয়েছে তার বহু বছর পূর্বে।

কান যুদ্দাকায়েক ঃ এ ফিকার কিতাবখানি মাদ্রাসার পাঠ্য। লেখকের নাম আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন মাহমুদ আননাসাফী। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৬৪৫ হিজরীতে এবং মৃত্যুবরণ করেন ৭১০ হিজরীতে।

গ্রন্থ রচনা করেন ৭১০ হিজরীতে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-র মৃত্যুর (৬৪৫-১৫০)=৪৯৫ বৎসর পর জন্মগ্রহণ করেন। গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-র মৃত্যুর (৭১০-১৫০)=৫৬০ বৎসর পর। অতএব, লেখকের কোন প্রকারে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-র সাথে সাক্ষাৎ হয় নাই।

শরহে বিকায়া ঃ কিতাবখানি মাদ্রাসার পাঠ্য। কিতাবখানি একটি কিতাবের ব্যাখ্যা। "বিকায়া" নামক একখানা কিতাব যা হিদায়ার সারসংক্ষেপ। তারই ব্যাখ্যা শরহে বিকায়া। বিকায়ার লেখক ছিলেন মাহমুদ বিন আহমাদ। তার জন্ম তারিখ পাওয়া যায় না। তবে তিনি ৬৭৩ হিজরীতে মারা যান। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-র সাথে তার সাক্ষাতের প্রশ্ন ওঠে না। অথচ তার কিতাব হানাফী মাযহাবের প্রামাণ্য কিতাব সমূহের একটি। এই কিতাবের ব্যাখ্যা লিখেছেন উবায়দুল্লাহ বিন মাসউদ বিন মাহমুদ। জন্ম তারিখ পাওয়া যায় না। তবে মৃত্যুবরণ করেন ৭৪৭ হিজরীতে।

চার ইমামের জীবনকাল

নং	নাম	জন্ম (শহর)	হিজরী/খৃঃ	মৃত্যু (শহর)	হিজরী/খৃঃ
১	ইমাম আবূ হানিফা (নোমান ইবনে থাবিত)	কুফা (ইরাক)	৮০/৭০০	বাগদাদ (ইরাক)	১৫০/৭৬৭
২	ইমাম মালিক ইবনে আনাস	মদীনা (সৌদিআরব)	৯৩/৭১৫	মদীনা (সৌদিআরব)	১৭৯/৭৯৫
৩	ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদ্রিস আস-শাফি	গাজা (প্যালেস্টাইন)	১৫০/৭৬৭	ফুসতাত (মিশর)	২০৪/৮২০
৪	আহমাদ ইবনে হানবল	বাগদাদ (ইরাক)	১৬৪/৭৮০	বাগদাদ (ইরাক)	২৪১/৮৫৫

বিখ্যাত ৬ জন হাদীস সংকলকদের জীবনকাল

নং	নাম	জন্ম (শহর)	হিজরী/খৃঃ	মৃত্যু (শহর)	হিজরী/খৃঃ
১	বুখারী	বুখারা (উজবেকিস্তান)	১৯৪/৮১০	খারতাংক (সমরকান্দ, ইরান)	২৫৬/৮৭০
২	মুসলিম	নিশাপুর (খোরাসান, ইরান)	২০৪/৮২০	নিশাপুর (ইরান)	২৬১/৮৭৫
৩	আবূ দাউদ	শিস্তান (ইরান)	২০২/৮১৭	বসরা (ইরাক)	২৭৫/৮৮৮
৪	নাসাঈ	নাসা (খোরাসান, ইরান)	২১৫/৮৩০	মক্কা (সৌদি আরব)	৩০৩/৯১৫
৫	তিরমিযী	তিরমিয (ইরান)	২০৯/৮২৮	তিরমিয (ইরান)	২৭৯/৮৯৬
৬	ইবনে মাজাহ	কাজভিন (ইরান)	২০৯/৮২৮	কাজভিন (ইরান)	২৭৩/৮৯০

মোট সংগৃহীত হাদীস এবং সেখান থেকে পরিত্যাগ ও গ্রহণ

নং	নাম	মোট সংগৃহীত হাদীস	পরিত্যাগ	গ্রহণ
১	বুখারী	৬০০,০০০	৯৯.৫৪%	২,৭৬২
২	মুসলিম	৩০০,০০০	৯৮.৫৫%	৪,৩৪৮
৩	আবূ দাউদ	৩০০,০০০	৯৮.৯৬%	৩,১১৫
৪	নাসাঈ	৫০০,০০০	৯৯.০৪%	৪,৮০০
৫	তিরমিযী	৪০০,০০০	৯৯.০০%	৪,০০০
৬	ইবনে মাজাহ	২০০,০০০	৯৭.৮৩%	৪,৩২১
মোট		**২,৩০০,০০০**	**৯৮.৯৮%**	**২৩,৩৪৬ (১.০২%)**

References:

- Four Imams – Muhammad Abu Zahra
- Hadith Sonkoloner Itihash - Muhammad Abdur Raheem
- The Quranic Concept of Nikah (Wedlock) – by Akhtar Sherazi

কেউ কাউকে ভুল না বুঝি

সকলের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ, এই অধ্যায়ে ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) সম্পর্কিত যে তথ্য দেয়া হয়েছে তা তাকে কোনভাবেই ছোট করার উদ্দেশ্যে নয়। আমাদেরকে কেউ ভুল বুঝবেন না। এই তথ্যগুলো ইমাম আবূ হানিফা (রহ.)-এর জীবনী থেকে নেয়া যার মূল বই আরবী ভাষায় আরব দেশ থেকে রচিত, এখানে শুধু কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে চার ইমামের জীবনী থেকে কিছু মূল্যবান তথ্য তুলে ধরার কারণে যদি কোন মুসলিম ভাই বা বোন মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে আমরা ক্ষমা প্রার্থী।

জাল ও দুর্বল (মওজু ও যঈফ) হাদীস থেকে সাবধানতা অবলম্বন

শরীয়াতের মূল উৎস হচ্ছে আল কুরআন। আর কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হলো হাদীস। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিভিন্ন কারণেই ইসলামের মধ্যে নানা ধরনের বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্র। ইসলামের শত্রুরা যখন মুসলিমদের সাথে পেরে উঠছিলনা তখন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। তারই অংশ হিসেবে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান কুচক্রীরা সম্মিলিত হয়ে পরিকল্পিতভাবে মাঠে নামে। ফলে কিছু ইয়াহুদী ও খৃষ্টান বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণের ভাব দেখিয়ে মুসলিমদের মাঝে তারা বিভিন্ন কর্মকান্ডের অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়। এজন্য তারা সাধারণ মুসলিম জনগণকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদের কথার মধ্যে "রসূলুল্লাহ বলেছেন" এই কথাটি সংযোগ করে হাদীস বলে চালিয়ে দেয়। এভাবে মুসলিম সমাজে জাল-যঈফ হাদীসের প্রচলন ঘটে। একইভাবে বিভিন্ন প্রকার বিদ'আত ও কুসংস্কারের প্রসার ঘটতে থাকে।

যিনি বিদ'আত করেন তার নিকট সব কিছুই গোলমেলে হয়ে যায়। ফলে সে বিদ'আতকে সুন্নাত আর সুন্নাতকে বিদ'আত মনে করে। অতএব বিদ'আতের ভয়াবহতা হতে রক্ষা পেতে হলে আমাদের মাঝে প্রচলিত বিদ'আতগুলো হতে সতর্ক হয়ে সেগুলোকে পরিত্যাগ করে সহীহ সুন্নাহ মাফিক আমল করা ছাড়া আখিরাতে মুক্তির জন্য আমাদের সামনে আর কোন বিকল্প পথ খোলা নেই। আসুন আমরা দুর্বল ও জাল হাদীসগুলো জেনে সেগুলো পরিত্যাগ করি এবং সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করে আমাদের জীবন গড়ি। যে আমলই আমরা করি না কেন, তা যাচাই-বাছাই করেই করা উচিত। কারণ, হতে পারে বহু আমল আমাদের জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে যেগুলো দুর্বল বা জাল হাদীসের উপর নির্ভরশীল। রসূল ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার উপর আমার নির্দেশ নেই সে আমলটি অগ্রহণযোগ্য"। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

আসুন! আমরা জাল ও যঈফ হাদীসগুলোকে জানি এবং তথাকথিত আলেম-ওলামাদের জাল ও যঈফ হাদীস নির্ভর ফাতোয়া ও আক্বীদাহ হতে নিজেদেরকে মুক্ত করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর ও তাঁর নাবীর

যথাযথ অনুসরণ করার তৌফীক দান করুন। আমীন। রসূল ﷺ বলেছেন, "মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনবে তাই হাদীস হিসেবে বর্ণনা করবে।" (সহীহ মুসলিম)

দুর্বল হাদীসের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অথবা করেছেন ঃ এরূপ বলা ঠিক নয়। ইমাম নাববী (রহ.) বলেন ঃ হাদীস বিশারদ মুহাক্কিক (সঠিক) আলেমগণ বলেছেন ঃ কোন হাদীস দুর্বল হলে তাতে এ কথা বলা যাবে না যে ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অথবা করেছেন অথবা নির্দেশ দিয়েছেন, অথবা নিষেধ করেছেন অথবা হুকুম করেছেন ইত্যাদি যা দৃঢ় অর্থবোধক শব্দ দ্বারা প্রকাশ পায়। অনুরূপভাবে একথাও বলা যাবে না যে, আবূ হুরায়রাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন অথবা বলেছেন, কিংবা উল্লেখ করেছেন ইত্যাদি যা এর সমার্থবোধক শব্দ। অনুরূপভাবে তাবিঈ এবং তার পরবর্তীদের ক্ষেত্রেও এমন কথা বলা যাবে না, যদি হাদীসটি দুর্বল হয়ে থাকে। বরং এর প্রত্যেকটিতেই এ কথা বলতে হবে ঃ তার সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সূত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে, অথবা উল্লেখ করা হয়েছে ইত্যাদি শব্দ। যে হাদীসের বিশুদ্ধতা স্পষ্ট হবে, সে ক্ষেত্রেই বলতে হবে "রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন"।

তাই দুর্বল হাদীসের উপর কোন অবস্থাতেই 'আমল করা যাবে না, চাই ফাযায়িলের ক্ষেত্রে হোক বা মুস্তাহাবগুলোর (উত্তম) ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্যকিছুর ক্ষেত্রে হোক। যারা দুর্বল হাদীসের উপর ফাযায়িলের ক্ষেত্রে আমল করা যাবে এরূপ কথা বলেছেন তাদের পক্ষে কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে কোনই দলিল নেই। দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য এমন একটি দলিলও তাদের কোন আলেমের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয়নি। শুধু একে অপর হতে কতিপয় উক্তি বা ভাষ্য উল্লেখ করেছেন। যা তর্কের স্থলে গ্রহণযোগ্য নয়। তা সত্ত্বেও তাদের ভাষ্যের মধ্যেও মতদ্বন্দ্ব লক্ষ্যণীয়, যেমন ইবনুল হুমাম বলেছেন ঃ দুর্বল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়, জাল হাদীস দ্বারা নয়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, অনেক আলেম এই ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করে থাকে। তারা কোন হাদীস সহীহ না যঈফ তা না জেনেই তার উপর আমল করছেন। আর যখন হাদীসটির দুর্বলতা অবহিত হন তখন দুর্বলতার পরিমাণ তারা জানতে চান না। সেটি কি কম দুর্বল না বেশি দুর্বল? অতঃপর সেই দুর্বল হাদীস মোতাবেক

আমলের পক্ষে এমনভাবে প্রচারণা করেন ঠিক যেমনটি করতেন হাদীসটি সহীহ হলে! সেজন্যই মুসলিমদের মাঝে এমন অনেক ইবাদত বৃদ্ধি পেয়েছে যা মোটেই সহীহ নয়। পক্ষান্তরে মুসলিমরা এমন বহু সহীহ ইবাদত থেকে সরে গিয়েছে যা প্রমাণযোগ্য সনাদসমূহের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী (রহ.) বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের হাদীসগুলিকে যাচাই-বাছাই করে সহীহ ও যঈফ হাদীসগুলিকে চিহ্নিত করেন। এছাড়া জাল হাদীসগুলোকে চিহ্নিত করে হাদীস শাস্ত্রকে নির্ভেজাল ও নিখুঁত রাখতে বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলারগণ যুগযুগ ধরে গবেষণা করে যাচ্ছেন।

ইসলামের ইতিহাস থেকে প্রমাণিত ঃ যিনদীক ও মুনাফিক সম্প্রদায় ১৪ হাজার হাদীস জাল করেছিল। তাদের মধ্যে আবদুল করিম ইবনে আবুল আওযা নিজে স্বীকার করেছে যে সে ৪ হাজার হাদীস জাল করেছে। এদের মধ্যে আরো একজন মুহাম্মাদ বিন সাঈদ ইবনে হাসান আল আসাদী আরো ৪ হাজার হাদীস জাল করেছে। ইমাম নাসাঈ বলেন ঃ মিথ্যা হাদীস রচনায় খ্যাত ছিল চার জন। তারা হলো- মদীনায় ইবনে আবি ইয়াহইয়া, বাগদাদে ওয়াকেদী, খোরাসানে মাকাতেল বিন সুলাইমান এবং সিরিয়ায় মুহাম্মাদ বিন সাঈদ মাছলুব।

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিম ছাড়া বাকি অন্যান্য যে হাদীস গ্রন্থগুলো আছে যেমন ঃ জামে আত তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে আন নাসাঈ, আহমদ, বাইহাকী ইত্যাদি সবগুলোর মধ্যেই কিছু কিছু জাল ও যঈফ হাদীস রয়েছে। আমাদের দেশে ‘মিশকাত শরীফ’ নামে সংকলিত যে হাদীসগ্রন্থটি মাদ্রাসার সিলেবাসভুক্ত পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হয় তার মধ্যেও অনেক হাদীস রয়েছে যা জাল এবং যঈফ। এ যুগটা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির যুগ। আমাদের সামনে ভুল-শুদ্ধ সকল তথ্য রয়েছে। এখন এটা আমাদের নিজ দায়িত্ব সঠিকটা বেছে নেয়া। ইসলাম হচ্ছে অংকের মতো পরিষ্কার। রসূল ﷺ তাঁর জীবনে যা যা করেছেন সেটাই সঠিক ইসলাম আর তিনি যা করেননি তা যতোই পুণ্যের কাজ বলে মনে হোক না কেন বা যতো বড় বুজুর্গ বা আলেম দ্বারাই পালিত হোক না কেনো তা ইসলাম নয়।

বিদ'আত কী?

যে সব ধরনের কাজ বা অনুষ্ঠান ইবাদত বা সওয়াবের কাজ বলে কুরআন ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয়, রসূল ﷺ নিজে যা কখনো করেননি বা কাউকে কখনো করতে বলেননি, তাঁর সাহাবাদের সময়ও তা ইবাদত হিসেবে প্রচলিত ছিলোনা এমন সব কাজ বা অনুষ্ঠানাদি সওয়াবের উদ্দেশ্যে পালন করার নামই বিদ'আত।

বিদ'আত বলতে বুঝায় দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন আনা, নতুন কিছু ঢুকিয়ে দেয়া। যেমন একটি উদাহরণ দেয়া যাক ঃ রসূল ﷺ -এর নিয়ম অনুযায়ী খাওয়ার সময় বলতে হয় 'বিসমিল্লাহ' কিন্তু আমরা যদি ভাল মনে করে আর একটু বাড়িয়ে বলি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' তাহলেই সেটা হবে বিদ'আত। আবার যেমন, প্রত্যেক ফরয সলাতের পর ৩৩ বার করে 'সুবহান আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর' পড়তে হয় কিন্তু আমি ভাল মনে করে ৩৩ বারের জায়গায় যদি ৪০ বার করে নিয়মিত পড়ার প্রচলন করি তাহলেই সেটা হবে বিদ'আত।

আর এভাবে যদি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ভাল মনে করে যে যার মতো পরিবর্তন আনতে থাকে তাহলে আল্লাহ তাঁর রসূল ﷺ -এর মাধ্যমে আমাদের জন্য যে ইসলাম পাঠিয়েছেন একসময় এর অরিজিনাল অস্তিত্ব আর থাকবে না। তাই নিম্নের সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াতে যে কোন ধরণের পরিবর্তনকে ব্যান্ড করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোন প্রকার পরিবর্তন চলবে না, ইসলাম পরিপূর্ণ।

বিদ'আতের বিপক্ষে কুরআনের দলিল

বিদায় হাজ্জের ভাষণের পর আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاؕ

"আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্যকভাবে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম--[মনোনীত করলাম]।" (সূরা আল মায়িদা ঃ ৩)

এ আয়াত থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন-ইসলাম পরিপূর্ণ, তাতে নেই কোন কিছুর অভাব। অতএব তা মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সকল দ্বীনি প্রয়োজন পূরণে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। এই দ্বীনে বিশ্বাসীদের দিক নির্দেশনা বা গাইডেন্সের জন্য এই দ্বীন ছাড়া অন্য কোন দিকে তাকাবার প্রয়োজন অতীতেও হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবেনা।

বিদ'আতীর পরিণাম

- দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নতুন আবিস্কৃত বিষয় বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার পরিণাম হল জাহান্নাম। (সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)
- আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মে কোন নতুন পদ্ধতি আনলো যা আমাদের দ্বীনে নেই তা গ্রহণ করা হবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

সলাতকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে প্রচলিত বিদ'আত

১) নাউয়াইতুয়ান ওসাল্লিয়া লিল্লাহী তা'আলা...... বলে মুখে উচ্চারণ করে সলাতের জন্য নিয়ত করা।

২) জায়নামাযে দাঁড়িয়ে জায়নামাযের দু'আ পাঠ করা।

৩) সলাত শেষে সওয়াবের উদ্দেশ্যে পাশের মুসুল্লিদের সাথে মুসাফা/হ্যান্ডসেক করা।

৪) মাগরিবের পর দুই রাক'আত নফল নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং এই সলাত বসে পড়া।

৫) সলাতুল আওয়াবীন নামে মাগরিবের পরে ৬ রাক'আত সলাত আদায় করা।

৬) ওযূর সময় প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় ভিন্ন ভিন্ন দু'আ পড়া।

৭) ওযূর সময় ঘাড় মাসেহ করা।

৮) মোজার উপর মাসেহ করার জন্য মোজা চামড়ার হতে হবে এটা মনে করা।

৯) শবে বরাতের সলাত আদায় করা।

১০) শবে মিরাজের সলাত আদায় করা।

১১) সলাতুল হাজাত এবং সলাতুত তসবিহ নামে সলাত আদায় করা।
১২) ইহরামের নিয়তে দুই রাক'আত সলাত আদায় করা।
১৩) সলাতের পর মাথায় বা কপালে হাত রাখা।
১৪) পাগড়ী পড়ে সলাত আদায় করলে অনেক সওয়াব হবে মনে করা।
১৫) ওয়াক্তের সলাত ওয়াক্তে আদায় না করে কাযা সলাত আদায় করা।
১৬) উমরী কাযা সলাত আদায় করা। এবং মক্কা ও মদীনায় গিয়ে উমরী কাযা সলাত আদায় করা।
১৭) জানাযার সলাতে সানা পাঠ করা।
১৮) জুম্মার দিনে খুৎবার সময় চাঁদার বাক্স চালানো।
১৯) জুম্মার দিন খুৎবার সময় লাল বাতি জ্বালিয়ে রাখা এবং লিখে রাখা যে লাল বাতি জ্বলন্ত অবস্থায় সলাত আদায় করা নিষেধ।
২০) পুরুষ এবং মহিলাদের সলাতের পদ্ধতি আলাদা করা।
২১) জামা'আত শুরু হয়ে গেলেও বা ইকামাত হয়ে গেলেও সুন্নাত পড়া।
২২) সফরে কসর না পড়ে নিয়ম মত সলাত আদায় করা।
২৩) সফরে দুই ওয়াক্ত সলাত একত্রে আদায় না করা। যেমন ঃ যোহর-আসর একসাথে ও মাগরিব-'ইশা একসাথে।
২৪) ফরয সলাতের পর ইমামের নেতৃত্বে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত এবং ইমামের সাথে আমীন আমীন বলা, এবং মুনাজাত করতেই হবে এটা জরুরী মনে করা।
২৫) সওয়াবের উদ্দেশ্যে তসবি ছড়া ব্যবহার করা।
২৬) জানাযা সলাতের শেষে হাত তুলে দু'আ করা।
২৭) জানাযার সময় মৃতের কাযা সলাতের কাফফারা স্বরূপ টাকা-পয়সা আদায় করা।
২৮) জানাযার ও ঈদের সলাতের আযান দেয়া।
২৯) আযানের ও ইকামাতের সময় রসূল ﷺ-এর নাম আসলে দুই বৃদ্ধাঙ্গুলে চুমু দিয়ে তা দুই চোখে লাগানো।
৩০) ইকামাতের শব্দগুলো একবার করে না বলে আযানের মতো দুইবার করে বলা।
৩১) নতুন নতুন দুরূদের আবিস্কার করা এবং তা পড়া।
৩২) জুতা পাক থাকা সত্ত্বেও জানাযার সলাতে জুতা খুলে দাঁড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করা।
৩৩) দু'আ শেষ করে দুই হাত দিয়ে মুখ মুছা জরুরী মনে করা।

৩৪) চারটি মাযহাবের মধ্যে যে কোন একটি মাযহাব হুবহু মানা ফরয, ওয়াজিব অথবা সুন্নাত মনে করা।
৩৫) সলাত আদায়ের পরে পীর সাহেবের বা কোন হুজুরের বানানো ওযীফা বা হাদিয়া ফরয বা সুন্নাত মনে করে পড়া।
৩৬) বিপদে আযান দেয়া।
৩৭) জায়নামাযের মধ্যে কাবার ছবি থাকা এবং সেই ছবিতে পা লাগলে তাকে সালাম করা বিদ'আত।
৩৮) মসজিদে কারুকার্য করা বিদ'আত।
৩৯) মসজিদের ভিতরে ক্বিবলা বরাবর একদিকে 'আল্লাহু' এবং অপর দিকে 'মুহাম্মাদ' লিখা বিদ'আত।
৪০) মসজিদের ভিতরে ক্বিবলা বরাবর চাঁদ-তারা ডিজাইন করা বিদ'আত। মনে রাখতে হবে আমরা চাঁদ-তারার সাজদাহ করি না।

বিশেষ নোট

সলাতের প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সহীহ হাদীসের দলিল রয়েছে। তাই আল্লাহর রসূল ﷺ-এর দেখিয়ে দেয়া সলাতের নিয়মকে "আহলে হাদীসের নিয়ম" বলে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। তবে 'আহলে হাদীস' মানে হাদীস অনুসরণকারী। ইসলামের যে কোন বিষয়ে আমাদের সকলেরই উচিত সরাসরি কুরআন ও সহীহ হাদীসকেই অনুসরণ করা, কোন ব্যক্তি বা দলকে নয়।

বাজারে শেখ নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)-এর সংকলিত সহীহ হাদীস ভিত্তিক রসূল ﷺ -এর একটি সলাতের বই রয়েছে। রসূল ﷺ-এর দেখিয়ে দেয়া সহীহ হাদীসভিত্তিক সলাতের নিয়মকে অনেকে মনে করেন শেখ নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)-এর নিয়ম। এই ধরণের চিন্তা করা প্রচন্ডরকম বোকামী। কারণ নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)-এর সলাতের কোন নিয়ম বানানোর অধিকার নেই। তিনি তার বইতে সলাতের নিয়মগুলো সহীহ হাদীসের দলিলগুলো তুলে ধরেছেন। তাই আল্লাহর রসূলের সলাতের নিয়মকে নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)-এর বানানো নিয়ম বলা ঠিক নয়। উল্লেখ্য যে, শেখ নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.) আলবেনীয়া নামক একটি দেশের বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার, তিনি ছিলেন হাদীস বিসারদ (মুহাদ্দিস)। তিনি তার সারা জীবন হাদীস নিয়ে গবেষণা করেছেন।

সলাতে আমরা কী পড়ি? আসুন সলাত বুঝে পড়ি

নিয়্যত ঃ *নাউয়াইতু আন উছাল্লিয়া* .... বলে মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যত করা কোন হাদীসে নেই, এটা বিদ'আত। নিয়্যত থাকবে অন্তরে।

আল্লাহু আকবার ঃ আল্লাহ্ মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

দু'আ ঃ *ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু* .... নিশ্চয়ই আমি (পৃথিবীর সকল কিছু পরিত্যাগ করে) আকাশ ও যমীনের স্রষ্টার দিকে আমার মুখ করলাম এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। [জায়নামাযের দু'আ বলতে কিছু নেই, এই দু'আটা সলাত শুরু করে তারপর পড়া যেতে পারে, এটি অপশোনাল]।

সানা ঃ *সুবহানাকাল্লাহুম্মা* .... হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, তুমিই প্রশংসনীয়, তোমার নামই বরকতময়। তোমার গৌরবই সর্বোচ্চ এবং তুমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই।

আউযুবিল্লাহ...ঃ আমি বিতাড়িত (অভিশপ্ত) শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

বিসমিল্লাহির... ঃ আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি।

সূরা ফাতিহা ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত কর তাদের পথে যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ। পক্ষান্তরে যাদের প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট এবং যারা বিপথগামী, তাদের পথে আমাদের পরিচালিত করো না। হে আল্লাহ! আমার এ দু'আ কবুল কর। (প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা সকলকে অবশ্যই পড়তে হবে।)

যেকোন সূরা ঃ যে সূরা বা আয়াতগুলো আমি সাধারণত সলাতে পড়ে থাকি সেগুলোর অর্থ কোন ভাল বাংলা অনুবাদ থেকে মুখস্ত করে নিতে হবে।

রুকু ঃ *‘সুবহা-না রব্বিয়াল আযীম’* অর্থাৎ আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

ক্বওমা ঃ *‘সামি‘আল্লা-হু লিমান হামিদাহ’* অর্থাৎ প্রশংসাকারীর প্রশংসা আল্লাহ শুনতে পান।

‘রব্বানা লাকাল হামদ্, হামদান কাসীরন, তাইয়িবান মুবারকান ফীহ’। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা। তোমার প্রশংসার মাঝে রয়েছে প্রচুর বরকত।

সাজ্‌দাহ ঃ ‘*সুবহা-না রব্বিয়াল আ‘লা’* অর্থাৎ আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ তা’আলার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

দুই সাজ্‌দার মাঝে ঃ *আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াআফিনী ওয়ারযুকনী ওয়াহদিনী ওয়াযবুরনী*। (এই দু’আ পড়া সুন্নাহ)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, নিরাপদে রাখ, জীবিকা দান কর, সরল পথ দেখাও, পরিশুদ্ধ কর।

আত্তাহিয়্যাতু ঃ যাবতীয় সম্মান, ইবাদত ও প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্য। হে নাবী! আপনার উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আমাদের উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর নেককার বান্দাগণের উপরও। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

দুরূদে ইব্রাহীমী ঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর বংশধরগণের উপর শান্তি বর্ষণ করুন, যেরূপ ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরগণের উপর বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বরকত দান করুন যেরূপ ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি দান করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

ওয়াজিব দু'আ ঃ *আল্লাহুম্মা ইন্নি 'আউযুবিকা মিন 'আযাবি জাহান্নামা, ওয়া মিন আযাবিল কাবরি, ওয়া মিন ফিৎনাতিল মাহ-ইয়া ওয়াল মামাতি, ওয়া মিন শাররি ফিৎনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের 'আযাব থেকে, কবরের 'আযাব থেকে, জীবন-মরণের বিপর্যয় থেকে এবং মাসীহেদ-দাজ্জালের ফিৎনার অনিষ্ট থেকে। এই চারটি বস্তু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা ওয়াজিব। অতঃপর নিজের জন্য যা ইচ্ছা দু'আ করবে। (সহীহ মুসলিম)

আরো দু'আ ঃ *আল্লাহুম্মা ইন্নি যলামতু.....* এটাকে নির্দিষ্ট করে দু'আ মাসুরা বলে না। সহীহ হাদীসে উল্লিখিত যেকোন দু'আই এক একটা দু'আ মাসুরা। সলাতে এই দু'আটাও পড়তে পারি অথবা অন্য কোন দু'আও পড়তে পারি। আল্লাহুম্মা ইন্নি যলাম্‌তু .... অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপর অনেক যুলুম করেছি, তুমি ছাড়া পাপ মার্জনাকারী কেউ নেই। অতএব, হে আল্লাহ! অনুগ্রহপূর্বক আমার পাপ ক্ষমা করো এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি দয়াময় ও পাপ ক্ষমাকারী।

সালাম ঃ *'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ'* অর্থাৎ তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক (ডানে এবং বামে)।

সলাতে মন এদিক-সেদিক কেন যায়?

মনোবিজ্ঞানীদের ভাষ্যমতে আমাদের মন সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। আমাদের শরীর সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। ইচ্ছে করলেই আমরা আমাদের হাতকে উপরে তুলতে পারি, আবার খেয়াল-খুশি মত নিচে নামাতে পারি। সহজ ভাষায় বলা যায় আমাদের মনোভাব অনুযায়ী সব আদেশ নিষেধ শরীর গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু আমাদের চালিকা শক্তি মন আমাদের নিয়ন্ত্রণ খুব একটা গ্রাহ্য করে না। আমরা অধিকাংশ মানুষ হয়তো লক্ষ্য করে থাকবো মন স্থির নয়; বরং সর্বদা চলমান।

উদাহরণস্বরূপ সদ্য পরীক্ষায় অংশ নেয়া একজন ছাত্রের কথা বলা যায়। যখন ছাত্রটি পরীক্ষা শেষ করে সলাতে দাঁড়ায়, তার মাথার মধ্যে আপনা আপনি পরীক্ষা মূল্যায়নের বিষয়টি চলে আসে। সে সলাতের মধ্যে চোখ বুলায় প্রশ্নপত্র ও উত্তর পত্রের দিকে। মিলিয়ে নেয় কি চাওয়া হয়েছে আর সে কি লিখেছে। সর্বোপরি সে তার পুরো পরীক্ষার উপর একটি সার্বিক মূল্যায়ন করে নেয়। অনুরূপভাবে একজন ব্যবসায়ী যখন সলাতে দাঁড়ায় তার মনোযোগ চলে যায় ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে। 'আজ কত বিক্রি হল' অথবা 'আজকের লভ্যাংশটা বেশ ভালই'। সম্ভবতঃ একথাগুলোই সে অবচেতন মনে আউড়ে যায়। এ ধারার বাইরে কেউ নয়; এমনকি একজন গৃহবধু সেও সলাতে দাঁড়িয়ে ভাবে "তাহলে আজকে কি রান্না করা যায়; পোলাও নাকি বিরিয়ানী?"

এভাবে সার্বিকভাবে বলা যায়- যখনই আমরা সলাতে দাঁড়াই, আমাদের মন তখনই উড়াল দেয় এখানে সেখানে। কিন্তু প্রশ্ন আসে কেন এমন হয়? কেন আমরা পারি না মনকে বেঁধে রাখতে? উত্তরটা হলো মনের শূন্যতা। আরো খোলাসা করে বলা যায়, যখন আমরা সলাতে দাঁড়াই মনকে তখন কোন কাজ দিই না। কিন্তু মন কোন কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। তাই মন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়।

সলাতে মনকে কিভাবে স্থির রাখা যায়?

বেশির ভাগ সলাত আদায়কারী সলাতের মধ্যে যে অংশগুলো তিলাওয়াত করে থাকে যথা সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য অংশ সেগুলো পুরোপুরি আত্ত্বস্থ অর্থাৎ মুখস্ত ও ঠোটস্ত। এমনকি সে ঘুমের মধ্যেও পড়ে যেতে পারে–

একজন মুসলিম সূরা ফাতিহা অবচেতন মনেও হাজার মাইল বেগে অবলীলায় তিলাওয়াত করতে পারে। এই যে যান্ত্রিকতা বা স্বতঃস্ফূর্ততা এর কারণে তেলাওয়াতের সময় তার মস্তিষ্কের খুব ক্ষুদ্রতম অংশ ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু বেশিরভাগ মুসলিম সলাতের মধ্যে যে অংশগুলো তিলাওয়াত করে সে অংশসমূহের কোন অর্থ জানে না। যেহেতু তারা আরবি জানে না এবং অর্থও বুঝে না। সে কারণে অবচেতনভাবেই তার মন এদিক-সেদিক চলে যাওয়ার বড় ধরনের সম্ভাবনা থেকে যায়।

এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজন মনকে কাজ দেয়া বা ব্যস্ত রাখা। তাই সলাতে পবিত্র কুরআন থেকে যখন যে অংশ তিলাওয়াত করা হয়, তার অর্থ ও বিশ্লেষণের কাজে মনোনিবেশ একটি উত্তম প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করতে পারে। যে ভাষাটি আমি সবচেয়ে বেশি বুঝি সেই ভাষায় তিলাওয়াতকৃত অংশটুকু অনুবাদ করা।

এভাবে যদি কুরআন তিলাওয়াত এর সাথে সাথে তার অর্থটি অনুধাবনের প্রয়াস চালানো হয়, তবে আমাদের মস্তিষ্ক কাজ পাবে। যখন মস্তিষ্ক তিলাওয়াতকৃত অংশটুকু অনুবাদের কাজে ব্যস্ত থাকবে, তখন সে আর এদিক সেদিক ছুটাছুটি করবে না। কিন্তু কয়েক দিন বা কয়েক মাস পরে এ পদ্ধতিটিও আর কাজে লাগবে না। কেননা ততদিনে এ কাজটিও মস্তিষ্ক স্বতঃস্ফুর্তভাবে করতে সক্ষম হয়ে যাবে। আগেই বলা হয়েছে আমাদের মস্তিষ্ক খুব শক্তিশালী। তাই একসাথে দু'টি কাজ তথা তিলাওয়াত ও অনুবাদ যৌথভাবে করা তার জন্যে তেমন কঠিন নয়। তাই হয়তো আবার এক সময় মন এদিক সেদিক চলে যেতে পারে তবে সম্ভাবনা একটু কম। যেহেতু মস্তিষ্কের একটি অংশ তিলাওয়াত ও অন্য অংশ অনুবাদে ব্যাপৃত থাকবে তাই মনছুট হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

এভাবে মনের ঘাড়ে লাগাম পরিয়ে তাকে এদিক সেদিক চলে যাওয়া থেকে নিবৃত্তির কার্যকর পন্থা হচ্ছে যা তিলাওয়াত করা হয় ও সে অংশের মাতৃভাষায় অনুবাদ। এ দু'টি বিষয়ের দিকে মনোযোগ তীব্র করা। আমরা জানি মস্তিষ্ক একই সাথে একটির অধিক বিষয়ে শতভাগ মনোযোগ দিতে পারে না। অতএব যখন দু'টি একই সময়ে শতভাগ মনোযোগের চেষ্টা করা হবে তখন মনের ছুটাছুটি আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

এক কথায় বলা যায় মস্তিষ্ক কুরআন তিলাওয়াত ও এর অনুবাদ এ দু'টি কাজে নিবদ্ধ করে অর্থের প্রতি শতভাগ মনোযোগ নিবদ্ধ করলে আল্লাহ চাহেতো স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মনের বেখেয়ালি চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে।

সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে কী কথোপকথন হয়?

আল্লাহর সাথে বান্দার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সেতুবন্ধন হলো এ সূরা। বান্দা তার মনিবেরই শেখানো দু'আর মাধ্যমে তাঁর নিকট ধরণা দেয়ার এক মহাসুযোগ পেয়েছে। এ যেন সরকারীভাবে দেয়া দরখাস্তের ফরমে দস্তখত করার সুযোগ। যিনি দরখাস্ত কবুল করবেন তিনিই যদি দরখাস্তের ফরম পূরণ করার জন্য দেন, তাহলে এ দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়ারই পূর্ণ আশা।

এ সূরায় রহমান ও রহীম হিসেবে পরিচয় দিয়ে যে দু'আ শেখানো হয়েছে এ দু'আ যাতে বারবার পেশ করা হয়, সেজন্য সলাতে প্রতি রাকাআতে এ সূরাটি পড়ার হুকুম করা হয়েছে। এ হুকুমটাও আরেকটা বড় মেহেরবানী। এর মানে হলো, দরখাস্তের ফরম দেয়া সত্ত্বেও ফরমটা পুরণ করতে যেন অবহেলা না করা হয়, সেজন্য জোর তাগিদ দেয়া।

কুরআন মাজীদে এ সূরার নাম দেয়া হয়েছে 'উম্মুল কিতাব' তথা কুরআনের মূল বা সারকথা। এই সূরার মাধ্যমে মানুষের মন-মগজ যে দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেটাই কুরআনের বুনিয়াদি শিক্ষা। যার মানসিকতা এ সূরার ভিত্তিতে তৈরি হলো, সে কুরআন মাজীদের মূল স্পিরিট পেয়ে গেল। অর্থাৎ সূরা ফাতিহার প্রাণসত্তা যে পেল কুরআনের দেখানো পথে চলা তার জন্যই সহজ হয়ে গেল।

'ইসলাম' মানে আত্মসমর্পণ– নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে তুলে দেয়া। আর এটাই সূরা ফাতিহার সারকথা ও কুরআনের মর্মকথা। সূরা ফাতিহা সম্পর্কে হাদীসে কুদসীতে (যেসব হাদীসে কোনো কথাকে সরাসরি 'আল্লাহ বলছেন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, ঐ হাদীসসমূহকে হাদীসে কুদসী বলা হয়।) আল্লাহ তা'আলা এমন আবেগময় ভাষায় কথা বলেছেন, যা বান্দার মনে গভীর দোলা না দিয়ে পারে না।

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ 'আল্লাহ বলেন, 'কাস্সামতুস্ সলাতা বাইনী ওয়া বাইনা আ'বদী নিসফাইন, ওয়া লিআ'বদী মা সাআলানী।' অর্থাৎ আমি

সলাতকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধিভাবে বিভক্ত করেছি; আর আমার বান্দা আমার কাছে যা চাইল, তা-ই তার জন্য রইল ।'

যখন বান্দা বলে ঃ
"আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন" **তখন আল্লাহ্ বলেন** = "হামিদানী আ'বদী" (আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল) ।

যখন বান্দা বলে ঃ
"আররহমানির রহীম" **তখন আল্লাহ্ বলেন** = "আসনা আ'লাইয়া আ'বদী" (আমার বান্দা আমার গুণ গাইল) ।

যখন বান্দা বলে ঃ
"মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" **তখন আল্লাহ্ বলেন** = "মাজজাদানী আ'বদী" (আমার বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করল) ।

যখন বান্দা বলে ঃ
"ই-ইয়াকা না'বুদু ওয়া ই-ইয়াকা নাসতাঈন" **তখন আল্লাহ্ বলেন** = "হাযা বাইনী ওয়া বাইনা আ'বদী ওয়া লিআ'বদী মা সাআলা" (এটাই আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সম্পর্ক আর আমার বান্দার জন্য তা-ই, যা সে চাইল । অর্থাৎ আমার ও আমার বান্দার মাঝে এ চুক্তি হলো যে, সে আমার কাছে চাইবে আর আমি তাকে দেব) ।

আর বান্দা যখন বলে ঃ
"ইহ্দিনাস সিরাত্বল মুস্তাকীম .... ওয়া লাদদ্বল্লীন" **তখন আল্লাহ্ বলেন** = "হাযা লিআ'বদী ওয়া লিআ'বদী মা সাআলা" (এটা আমার বান্দার জন্যই রইল, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই, যা সে চাইল) ।

এ হাদীসে মহব্বতের এমন অগ্নিকণা রয়েছে যে, বান্দার অন্তরে ঈমানের বারুদ থাকলে এবং সলাতে সূরা ফাতিহা পড়ার সময় আল্লাহর প্রাণস্পর্শী কথাগুলোর দিকে গভীর মনোযোগ দিলে আল্লাহর সাথে মহব্বতের এমন আগুন জ্বলে উঠবে যে, আবেগের গভীরতায় বান্দা মনিবের অতি কাছে বলে অনুভব করবে । এ সূরা পড়ার সময় এ হাদীসটির কথা খেয়াল থাকলে একেকটি আয়াত পড়ার পর আল্লাহর প্রেমময় জবাবটা মনের কানে শোনার জন্য বান্দাকে থামতেই হবে । এমন জবাবে যে তৃপ্তি ও শান্তি তা তারাই বোধ করতে পারে, যারা আয়াতগুলো ধীরে ধীরে মজা নিয়ে পড়ে ।

এ সূরাটি দুনিয়ার বাদশাহর সাথে অসহায় মানুষের গোপন কথোপকথনস্বরূপ। এখানে বাদশাহর কথাগুলো গোপনই আছে। শুধু দয়ার কাঙাল মানুষের কথাগুলোই সূরাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– কোনো রাজার দরবারে কোনো প্রজা গিয়ে প্রথম রাজার গুণগান করে। রাজা জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কে?' প্রজা বলে 'আর কে, আপনারই নগন্য খাদিম ও দয়ার ভিখারী।' রাজা তখন জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কী চাও?' প্রজা তখন তার আসল বাসনা জানায়। সূরা ফাতিহায় এমনই একটা ছবি ফুটে উঠেছে।

বান্দা প্রথমে আল্লাহর গুণগান করার পর আল্লাহ যেন জিজ্ঞেস করছেন ঃ
"কে তুমি?" **বান্দা বিনয়ের সাথে জবাব দিচ্ছে** = 'একমাত্র আপনারই দাস, আপনার কাছেই সাহায্যপ্রার্থী।'

আল্লাহ বলেন ঃ
"আচ্ছা বুঝলাম, এখন তুমি আমার কাছে কী চাও?" **বান্দা বলে** = 'আমাকে সঠিক পথে চালাও।'

আল্লাহ বলেন ঃ
"কোন পথটাকে তুমি ঠিক মনে কর?" **বান্দা বলে** = 'সে পথ আমি চিনি না। শুধু এটুকু বলতে পারি, ঐ পথে চালাও, যে পথে চললে তোমার নিয়ামত সবসময় পাওয়া যাবে; কোনো সময় গযবে পড়ার কারণ ঘটবে না ও পথ হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না।'

তখন আল্লাহ বলেন ঃ
"যদি সত্যিই তুমি চাও যে, আমি তোমাকে সঠিক পথে চালাই তাহলে এই নাও কুরআন। এই কুরআনের কথামতো চল; তাহলে গযব থেকে বেঁচে থাকবে, ভুল পথে যাওয়ার কোনো ভয় থাকবে না এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আমার সন্তুষ্টি ও নিয়ামত ভোগ করতে পারবে।"

কুরআন মাজীদের শুরুতে এ সূরাটিকে স্থাপন করে মানবজাতিকে এ কথাই জানানো হয়েছে যে, সিরাতুল মুস্তাকীম আল্লাহর দেয়া এমন বিরাট নিয়ামত, যা ইখলাসের সাথে মনেপ্রাণে পরম আকুতি নিয়ে আল্লাহর কাছে না চাইলে পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় বেঁচে থাকার সব প্রয়োজনীয় জিনিসই মানুষকে দিয়ে থাকেন। এর জন্য আল্লাহর কাছে চাওয়ার কোনো শর্ত নেই। আল্লাহকে অস্বীকার করলে এমনকি আল্লাহকে

গালি দিলেও তিনি রিযিক বন্ধ করবেন না। না চাওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার বড় বড় নিয়ামত আল্লাহর বিদ্রোহীকেও দেয়া হয়।

কিন্তু সিরত্বল মুস্তাকীম, হিদায়াত বা আল্লাহর দ্বীনের পথ কারো উপর চাপিয়ে দেয়ার জিনিস নয়। না চাইলে এ মহান নিয়ামত কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে দেয়া হয় না। কোনো অনিচ্ছুক জাতি হিদায়াত পায় না। কারণ, হিদায়াত আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম দান এবং এ দান অপাত্রে দেয়ার নিয়ম নেই। খাঁটি মনে কাতরভাবে মহান ও দয়াময় মনিবের নিকট ধরণা দেয়া ছাড়া এ দান পাওয়া যায় না।

সলাত কীভাবে দৈহিক উন্নয়ন করে?

আমরা যখন রুকুতে যাই তখন আমরা মাথা ঝুঁকাই তখন আমাদের শরীর বাঁকা হয় এবং মাথার দিকে রক্ত বাড়তে থাকে। এরপর যখন সোজা হয়ে দাঁড়াই তখন রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয় এবং শরীর রিলাক্সড হয়ে যায়। এরপর আসে সাজদার কথা। এটি সলাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের শরীরেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ মাথা আর মাথার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো "ব্রেন"। আমাদের শরীরে ইলেক্ট্রোমাটিক্স তৈরী হয়। আমরা দেখেছি যে ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার হয় তাতে আর্থিং এর ব্যবস্থা থাকে। সাজদাতে মাথা নোয়ানের মাধ্যমে সেই ইলেকট্রোসটিকস বের হয়ে যাওয়ার উপায় পায়। ফলে মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা ইত্যাদি কমে যায়।

ব্রেনের যে অংশটা চিন্তা করে সেটা মাথার উপর থাকে না। সেটা থাকে ফ্রনটাল লোপে; সেজন্যেই আমরা সলাতের মাঝে সাজদাহ করি। যখন আমরা সাজদায় যাই তখন আমাদের ব্রেনে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়, এতে আমাদের ব্রেনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যখন সাজদাহ করি তখন আমাদের মুখের চামড়ায় ও ঘাড়ে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়, এতে আমাদের মুখমণ্ডলে রক্ত প্রবাহের মাত্রা বেড়ে যায়। এটা শীতকালে আমাদের জন্যে খুবই উপকারী। বিভিন্ন অসুখ থেকে বাঁচতে পারি যেমন ফাইব্রোলাইটিস ও চিলব্রেইন, যখন সাজদাহ করি তখন পারারাইন সাইনোসাইটিস ড্রেনেইজ তৈরী হয়। এতে করে সাইনোসাইটিস-এর সম্ভাবনা কমে যায়। যেটা হলো সাইনাসের প্রদাহ।

আমরা সারাদিন সারারাত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আর ম্যাক্সিলারী সাইনাসের ড্রেনেইজ থাকে শরীরের উপরের অংশে, আমরা সারাদিন

দাঁড়িয়ে থাকি ফলে-এর চলাচল হয় না। সেজন্যে যখন সাজদায় যাই ব্যাপার এমন যেন একটা ভরা পাত্র উল্টে দিলাম। এতে করে ম্যাক্সিলারী সাইনোসাইটিস হয়। এছাড়াও এতে করে আমাদের শরীরে ড্রেনেইজ তৈরী হয় ফ্রন্টাল সাইনাসের এ্যথ মোডিয়াল সাইনাসের এবং স্পেরিয়াল সাইনাসের। এতে করে সাইনোসাইটিসের সম্ভাবনা কমে যায়। এতে তার সাইনোসাইটিস থেকে থাকলেও এটা তার প্রাকৃতিক চিকিৎসা। এছাড়াও সাজদাহ তাদের জন্যে প্রাকৃতিক চিকিৎসা যারা ব্রঙ্কাইটিস রোগে ভোগে থাকে। এতে করে ব্রঙ্কিলট্রি দিয়ে রস মিশ্রিত হতে পারে। সাজদার কারণে ব্রঙ্কিলটিতে রস জমা হয়ে থাকতে পারে না। এতে করে বিভিন্ন পালমোনারী অসুখের চিকিৎসা করা যায়। যেখানে আমাদের শরীরে রস জমা হয়।

আমাদের শরীরে রস ছাড়া ও ধূলাবালি এবং রোগজীবাণু জমা হতে পারে। সাজদার মাধ্যমে এসব অসুখের উপকার পাওয়া যায়। আমরা যখন নিঃশ্বাস নেই, তখন আমরা ফুসফুসের মাত্র দুই তৃতীয়াংশ ব্যবহার করে থাকি। আর বাকী এক তৃতীয়াংশ ফুসফুস থেকে যায়। মাত্র দুই তৃতীয়াংশ তাপ বাতাস আমাদের ফুসফুসে ঢুকে ও বের হয়ে যায়। বাকী এক তৃতীয়াংশ বাতাসকে বলে রেদিডিউল এয়ার, আমরা যখন সাজদাহ করি তখন আমাদের তলপেট চাপ দেয় ডায়াফ্রামে আর এই ডায়াফ্রাম চাপ দেয় আমাদের ফুসফুসের নিচের অংশে আর এতে ফুসফুসের সেই রেসিডিয়াল এয়ার বের হয়ে যায়।

তাহলে এ বাতাস বের হয়ে গেলে আরো বাতাস ফুসফুসে ঢুকে, এতে করে আমাদের ফুসফুস স্বাস্থবান হয়। যখন সাজদাহ করি, যেহেতু অভিকর্ষ বল কমে যায় তলপেটের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। তলপেটের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভেতর রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। সাজদাহ এবং রুকু এগুলোর মাধ্যমে হারনিয়া ফিসোরাল ইত্যাদি অসুখের নিরাময় হয়ে থাকে। এছাড়াও সাজদায় অনেক রোগের নিরাময় হয়, তার মধ্যে একটা হল হেযোরয়েট, যেটাকে সাধারণ মানুষ বলে থাকে পাইলস। এছাড়াও সাজদার মাধ্যমে জরায়ুর স্থানচ্যুতিকে রোধ করা যায় যখনই সাজদাহ করি তখন আমাদের শরীরের ভর থাকে হাঁটুর উপর আমাদের পা থাকে নমনীয়। এছাড়া আমাদের পায়ের সোলিয়াস ও গ্যালট্রোনিমিয়াস থালস (এ থালসগুলোকে বলা হয় প্যারিফেরিয়াল (২টি)। কারণ এ মাসলগুলিতে অনেক ধমনী আছে। আর এ ধমনীগুলো দিয়ে শরীরের নিচের অংশে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে এতে করে শরীরের নিচের অংশ Relaxed হয়।

যখন সাজদায় যাই, আমাদের হাঁটু তখন মাটি স্পর্শ করে। হাত এবং কপালও মাটি স্পর্শ করে এই পদ্ধতিতে কার্বোইন্টাইল ইস্পাইন এর বিভিন্ন অষুখের নিরাময় হয়। কারণ এই সাজদার মাধ্যমে ইন্টারবায়োট্রিক্যাল জয়েন্টের উন্নতি হয়। সাজদার মাধ্যমে বিভিন্ন হৃদরোগের উপকার পাওয়া যায়। যখন আমরা সাজদাহ থেকে উঠে হাঁটু গেড়ে বসি এতে শরীরের উপরের অংশে যে রক্ত চলে গিয়েছিল সেটা স্বাভাবিক হয়। আর শরীরেরও Relaxed হয়। তখন আমাদের উরু ও পিঠের ধমনীর মাধ্যমে আমরা উপকার পাব কোষ্ঠকাঠিন্য আর বদ হজমের। এতে করে যারা ভূগছি পেপটিক আলসারে বা পাকস্থলীর জন্যে তারাও উপকার পাবো, যখন আমরা বসা থেকে উঠে দাঁড়াই। যখন সাজদাহ থেকে উঠে দাঁড়াই, আমাদের শরীরের ভর থাকে পায়ের বলের উপরে। যখন আমরা সলাত আদায় করি, তখন আমরা শারীরিকভাবে উপকৃত হই।

তবে মুসলিমরা শুধু শারীরিক উপকারিতার জন্য সলাত আদায় করে থাকে না। এটা হল বাড়তি উপকার। আমরা সলাত আদায় করি আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলার প্রশংসা করার জন্য, তাঁর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য এবং সঠিক পথ লাভের জন্য। সলাতের এই সকল Medical benefit অবিশ্বাসী এবং যারা মুসলিম নয় তাদের আকর্ষণ করবে। কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি। কারণ এটা আল্লাহ তা’আলার আদেশ। কিছু লোক জিজ্ঞাসা করে যে, কিছু মুসলিম প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে। কিন্তু তারা প্রতারক এবং অসৎ প্রকৃতির ও নীতিহীন লোক, তাহলে আমরা কী করে বলি যে Salat is the programme towards righteousness এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে সূরা আল মু’মিনূন এর ১ ও ২ নং আয়াতে।

আল কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে রেফারেন্সেস ঃ

রসূল ﷺ নিজে সলাতের প্রতিটি স্টেপ এক এক করে যেভাবে দেখিয়েছেন তার দলিলসমুহ শুধুমাত্র সহীহ হাদীস থেকে এই বইতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বইতে দলিল হিসেবে কোন ইমামের বা স্কলারের ফতোয়া বা মতামত রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি, কারণ সলাতের প্রতিটি বিষয়েই রসূল ﷺ -এর সহীহ হাদীস দলিল হিসেবে রয়েছে।

আল কুরআন

১) সূরা আত তাওবা ঃ ১১, ৮৪
২) সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৪১-৪৪
৩) সূরা মারইয়াম ঃ ৫৯
৪) সূরা মায়িদা ঃ ৬
৫) সূরা আহযাব ঃ ৩৬
৬) সূরা আরাফ ঃ ৩, ২০৪
৭) সূরা নিসা ঃ ৫৯, ১০১
৮) সূরা নূর ঃ ৩০-৩১
৯) সূরা মাউন ঃ ৪-৫
১০) সূরা আহযাব ঃ ৫৯

সহীহ হাদীস

১১) সহীহ বুখারী
১২) সহীহ মুসলিম
১৩) আবূ দাউদ
১৪) সুনান নাসাঈ
১৫) জামে আত তিরমিযী
১৬) ইবনু মাজাহ
১৭) বায়হাকী
১৮) আহমাদ
১৯) দারাকুৎনী
২০) মুসতাদরেকে হাকেম
২১) ইবনু আবী শাইবাহ
২২) ইবনু খুজায়মা
২৩) তাহাবী
২৪) আবূ আওয়ানাহ
২৫) ফতহুল বারী
২৬) ত্বাবারানী
২৭) আওসাত্ব
২৮) নাইলুল আউতার
২৯) শাওকানী
৩০) মুয়াত্তা মালেক

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে

যাকাত

কত দিব, কখন দিব এবং কীভাবে দিব?

১০০ প্রশ্ন ও উত্তর

তাহক্বীক (Verification)

শাইখ মু. বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহ.)
- সদস্য, সউদী ওলামা পরিষদ
মক্কা, সৌদিআরব

প্রশ্ন ১. আল কুরআনে কতবার যাকাতের কথা উল্লেখ রয়েছে?

আল কুরআনের ২৮ স্থানে সলাতের পাশাপাশি যাকাত প্রদানের হুকুম দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ২. যাকাত দেয়ার শর্ত কি?

মনে রাখতে হবে যাকাত পরিশোধ হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত।

প্রশ্ন ৩. যাকাত প্রদানের জন্য কি নিয়্যত করতে হবে?

যাকাতের অংশ পৃথক করার সময় বা প্রদান করার সময় অবশ্যই নিয়্যত করতে হবে। নচেৎ যাকাত পরিশোধ হবে না।

প্রশ্ন ৪. নিসাব কী?

নিসাব হচ্ছে যাকাত আদায়ের স্কেল। যদি কারো নিকট সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণালংকার বা সাড়ে ৫২ তোলা রুপার অলংকার সমপরিমাণ বা বেশী থাকে অথবা তার সমপরিমাণ বা বেশী অর্থ বা সম্পদ থাকে তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন ৫. সাড়ে ৭ ভরিতে কত গ্রাম এবং সাড়ে ৫২ তোলায় কত গ্রাম?

স্বর্ণ এক ভরি	= ১১.৬৬ গ্রাম।
স্বর্ণ সাড়ে ৭ ভরি	= ৮৭.৫০ গ্রাম।
রুপা সাড়ে ৫২ তোলা	= ৬১২.৫০ গ্রাম।

প্রশ্ন ৬. যাকাতের নিসাবের শর্ত কী?

স্বর্ণ বা রুপা যে কোন একটির নিসাবের মূল্য পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বা ব্যবসায়িক সামগ্রীকে যাকাতের নিসাব বলে। কোন ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ তার মালিকানায় থাকে এবং আরবী মাসের হিসাবে এক বৎসর তার মালিকানায় স্থায়ী থাকে তাহলে তার উপর এ সম্পদ থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত রূপে প্রদান করা ফরয। মনে রাখতে হবে বছরের শুরু ও শেষে এ নিসাব বিদ্যমান থাকা জরুরী। বছরের মাঝখানে এ নিসাব পূর্ণ না থাকলেও যাকাত প্রদান করতে হবে। সম্পদের প্রত্যেকটি অংশের উপর এক বছর

অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয় বরং শুধু নিসাব পরিমাণের উপর বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। অতএব, বছরের শুরুতে শুধু নিসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকলেও বছরের শেষে যদি সম্পদের পরিমাণ বেশী হয় তাহলে ঐ বেশী পরিমাণের উপর যাকাত প্রদান করতে হবে। বছরের যে কোন অংশে অধিক সম্পদ যোগ হলে তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে মূল নিসাবের উপর বছর অতিক্রম করা শর্ত। যাকাত, যাকাতুল ফিতর, কুরবানী এবং হাজ্জ এ সকল শরীয়তের বিধান সম্পদের মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত।

প্রশ্ন ৭. যাকাত যে ২.৫% দিতে হবে এই হিসাব কুরআন বা হাদীসের কোথায় আছে?

কুরআনে ২.৫% যাকাত দিতে হবে তার উল্লেখ নেই। হাদীসে ২.৫% এর হিসাব সরাসরি উল্লেখ নেই। তবে নিম্নের হাদীস অনুযায়ী অঙ্ক করে ২.৫% এর হার উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন-

৪০ দিনারে যাকাত = ১ দিনার
১০০ দিনারে যাকাত = ১০০/৪০ = ২.৫ দিনার

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি ঘোড়া ও গোলামের যাকাত থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি দিলাম। তবে তোমরা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ, তথা প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম যাকাত দিবে। (ইবনে মাজাহ # ১৭৯০)

নাবী ﷺ -এর প্রতি বিশ দিনার বা তার কিছু বেশী হলে অর্ধ দিনার এবং চল্লিশ দিনারে এক দিনার (যাকাত হিসাবে) গ্রহণ করতেন। (ইবনে মাজাহ # ১৭৯১)

প্রশ্ন ৮. কারো নিকট শুধু সাড়ে ৫২ তোলা রুপার অলংকার সমপরিমাণ অর্থ বা সম্পদ থাকলেই কি তাকে যাকাত দিতে হবে?

হ্যা, কারো নিকট সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণালংকার বা তার সমপরিমাণ অর্থ না থাকে কিন্তু সাড়ে ৫২ তোলা রুপার অলংকার সমপরিমাণ বা তার বেশী অর্থ বা সম্পদ থাকে তাহলেই তাকে যাকাত দিতে হবে। এখানে রুপাই তার নিসাব, নিসাব হওয়ার জন্য স্বর্ণ থাকা জরুরী নয়। কারণ হাদীসে বলেছে স্বর্ণ অথবা রুপা।

প্রশ্ন ৯. কার উপর যাকাত ফরয?

নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক সকল মুসলিম নর-নারীর উপর যাকাত প্রদান করা ফরয। কোন ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার পর আরবী মাস হিসাবে পরিপূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে তার উপর পূর্ববর্তী বছরের যাকাত প্রদান করা ফরয। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি যাকাতের নিসাবের মালিক হওয়ার পাশাপাশি ঋণগ্রস্ত হয়, তবে ঋণ বাদ দিয়ে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। যাকাত ফরয হওয়ার পর যদি কোন ব্যক্তি যাকাত প্রদান না করে অর্থ-সম্পদ খরচ করে ফেলে তাহলেও তার পূর্বের যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন ১০. কোন্ কোন্ সম্পদের উপর যাকাত দিতে হয় না?

ব্যবহৃত জমি, বাড়ী-ঘর, ফ্লাট-এপার্টমেন্ট, বিল্ডিং, দোকানঘর, কারখানা, কারখানার যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, যন্ত্রাংশ, কাজের যন্ত্র, হাতিয়ার, অফিসের আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম, যানবাহনের গাড়ী, নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ, বিমান ইত্যাদি, যানবাহন বা চলাচলের অথবা চাষাবাদের পশু, ব্যবহারিক গাড়ী, ব্যবহারিক কাপড়-চোপড়, ঘরের আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি, নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহার্য সামগ্রী, গৃহপালিত পাখি, হাঁস-মুরগী ইত্যাদির যাকাত হয় না। ঋণ পরিশোধের জন্য জমাকৃত অর্থের উপর যাকাত হয় না। শস্য ও গবাদি পশুর যাকাত পরিশোধ করার পর ঐ শস্য বা গবাদি পশু বিক্রি করে নগদ অর্থ প্রাপ্ত হলে ঐ প্রাপ্ত অর্থের উপর একই বছরে যাকাত দিতে হবে না। কারণ একই সম্পদের একই বছরে দুইবার যাকাত হয় না।

প্রশ্ন ১১. যাকাত ইংরেজি বা বাংলা বছর হিসাবে দিলে জায়িয হবে কি?

যাকাত ইংরেজি বা বাংলা বছর হিসাব করে দেয়া ঠিক নয়। যাকাত চন্দ্র বর্ষ অর্থাৎ আরবী বছর অনুযায়ী দিতে হবে। কারণ ইংরেজী বা বাংলা বৎসরের তুলনায় আরবী বৎসর গড়ে এগার-বার দিন কম হয়। ছত্রিশ বছরে ইংরেজি বা বাংলা বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর দেখা যায় যে এ সময়ের মধ্যে আরবী বছর একটি বেশি হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ১২. আরবী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যাকাত দেয়ার নিয়ম কি?

স্বর্ণ বা রুপার নিসাবের ভিত্তিতে প্রতি আরবী বছরে (৩৫৪ দিন) নিজের পূর্ণ মালের যাকাত হিসাব করে প্রথমে সম্পদ থেকে যাকাতের অংশ অর্থাৎ পূর্ণ মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই ভাগ বা ২.৫% পৃথক করে নিতে হবে।

প্রশ্ন ১৩. ইংরেজী-বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যাকাত দেয়ার নিয়ম কি?

যদি হিসাবপত্র ইংরেজী বা বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অর্থ্যাৎ ৩৬৫ দিনের (যেমন ৩০ চৈত্র, ৩০ জুন বা ৩১ ডিসেম্বর) ভিত্তিতে হয় তাহলে যাকাত ধার্য্য হবে ২.৫৭৭% হারে।

প্রশ্ন ১৪. কোন্ কোন্ খাতে বা কাদেরকে যাকাত দেয়া যেতে পারে?

সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে আটটি খাতে যাকাতের নির্দেশ এসেছে ১) একেবারে নিঃস্ব, অসহায় ২) মিসকিন, কোনরকম দিনযাপনকারী ৩) যাকাত আদায়কারী কর্মচারী ৪) ঈমান আনার জন্য ভিন্ন ধর্মের লোকদের মন জয় করার জন্য এবং নতুন মুসলিমও হতে পারে ৫) দাস মুক্তির জন্য অথবা নিরপরাধ ব্যক্তিকে জেলমুক্তির জন্য ৬) ঋণগ্রস্তকে ৭) আল্লাহর পথে অর্থাৎ ফী-সাবিলিল্লাহ, যেমন ঃ দাওয়াতী কাজে ৮) মুসাফিরকে।

প্রশ্ন ১৫. কোন কোন সম্পদের উপর যাকাত ফরয?

(ক) স্বর্ণ-রুপা (খ) নগদ টাকা (গ) বানিজ্যিক পণ্য (ঘ) গৃহপালিত গবাদি পশু (ঙ) ফসল ও ফলমূল।

প্রশ্ন ১৬. কে যাকাত পাবে না বা কাকে যাকাত দেয়া যাবে না?

কোনো ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে যাকাত দিতে পারে না, স্বামী স্ত্রীকে যাকাত দিতে পারবে না।

প্রশ্ন ১৭. যাকাত দিতে হবে প্রকাশ্যে না গোপনে? বলে নাকি না বলে?

যাকাতের অর্থ দিতে হবে এই বলে যে, এটি যাকাতের অর্থ। এটি ঠিক নয়। যাকাতের অর্থ বরং না বলে দেয়াটাই উচিত। কারণ অনেকের এতে করে আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন হয়।

প্রশ্ন ১৮. আমার কাছে দুই লাখ টাকা এক বছর ধরে আছে এবং এছাড়া স্বর্ণ বা আর কোন সম্পদ নেই। আমার কি যাকাত দিতে হবে?

দুই লাখ টাকা দিয়ে যদি সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে ৫২ তোলা রুপা কেনা যায় তাহলে তার ২.৫% অর্থাৎ দুই লাখ টাকায় ৫ হাজার টাকা যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন ১৯. ব্যবহৃত স্বর্ণ বা রুপার কি যাকাত দিতে হবে?

যদি কারো নিকট সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে ৫২ তোলা রুপা তার সমপরিমাণ বা তার বেশী থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ফরয। স্বর্ণ-রুপা চাকা হোক বা অলংকার, ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত, স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত যে কোন বস্তু, সর্বাবস্থায় স্বর্ণ-রুপার যাকাত ফরয।

প্রশ্ন ২০. আমার কাছে ২০ ভরি স্বর্ণ আছে, আমি কি সেখান থেকে সাড়ে সাত ভরি বাদ দিয়ে বাকী সাড়ে ১২ ভরির যাকাত দিব নাকি পুরো ২০ ভরিরই যাকাত দিবো?

পুরো ২০ ভরিরই যাকাত দিতে হবে, সাড়ে সাত ভরি বাদ দেয়া যাবে না।

প্রশ্ন ২১. আমার কাছে ১০ ভরি স্বর্ণ আছে, ব্যাংকে ১০ লাখ টাকা আছে এবং ২০ লাখ টাকার শেয়ার আছে, আমি কিভাবে যাকাত দিব এবং কত দিব?

স্বর্ণের বিক্রয় মূল এবং অন্যান্য সব টাকা এক সাথে যোগ দিয়ে মোট টাকার উপর ২.৫% যাকাত দিতে হবে। যেমন ধরি, ১০ ভরি স্বর্ণের দাম ৫ লাখ টাকা + ব্যাংকে ১০ লাখ টাকা + শেয়ার ২০ লাখ টাকা = মোট ৩৫ লাখ টাকা। এর ২.৫% হবে = ৮৭,৫০০ টাকা।

প্রশ্ন ২২. মূল্যবান পাথরের কি যাকাত দিতে হবে?

হীরা (ডায়মন্ড), হোয়াইট গোল্ড, প্লাটিনাম প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু যদি সম্পদ হিসেবে বা টাকা আটকানোর উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়, তাহলে বাজার মূল্য হিসাবে তার যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন ২৩. নগদ অর্থের সাথে সম্পর্কিত এমন জিনিসের যাকাত কীভাবে দিতে হবে?

নগদ অর্থ, টাকা-পয়সা, ব্যাংকে জমা, পোষ্টাল সেভিংস, বৈদেশিক মূদ্রা (নগদ, এফসি একাউন্ট, টিসি, ওয়েজ আর্নার বন্ড), কোম্পানির শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড, ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার, বন্ড, সঞ্চয়পত্র, জমাকৃত মালামাল (রাখী মাল), প্রাইজবন্ড, বীমা পলিসি (জমাকৃত কিস্তি), কো-অপারেটিভ বা সমিতির শেয়ার বা জমা, পোষ্টাল সেভিংস সার্টিফিকেট, ডিপোজিট পেনশন স্কীম কিংবা নিরাপত্তামূলক তহবিলে জমাকৃত অর্থের যাকাত প্রতি বছর ক্যাশ টাকার মতোই যথা নিয়মে প্রযোজ্য হবে।

প্রশ্ন ২৪. প্রভিড্যান্ট ফান্ড বা পেনশন প্ল্যান এর উপর কি যাকাত দিতে হবে?

প্রতিষ্ঠানের রীতি অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে চাকুরীজীবির বেতনের একটি অংশ নির্দিষ্ট হারে কর্তণ করে ভবিষ্যৎ তহবিলে জমা করা হলে ঐ অর্থের উপর যাকাত ধার্য হবে না, কারণ ঐ অর্থের উপর চাকুরীজীবির কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভবিষ্যৎ তহবিলের অর্থ ফেরৎ পাওয়ার পর যাকাতের আওতাভুক্ত হবে। ঐচ্ছিকভাবে (অপ্শনাল) ভবিষ্যৎ তহবিলে বেতনের একটা অংশ জমা করা হলে তার উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে অথবা বাধ্যতামূলক হারের চাইতে বেশী হারে এই তহবিলে বেতনের একটা অংশ জমা করা হলে ঐ অতিরিক্ত জমা অর্থের উপর বছরান্তে যাকাত প্রযোজ্য হবে। চাকুরীজীবির অন্যান্য সম্পদের সাথে এই অর্থ যোগ হয়ে নিসাব পূর্ণ হলে যাকাত প্রদান করতে হবে। পেনশনের টাকাও হাতে পেলে যাকাত হিসাবে আসবে।

প্রশ্ন ২৫. ধর্মিও কাজের জন্য জমাকৃত টাকার উপর কি যাকাত দিতে হবে?

মানত, কাফ্ফারা, হাজ্জ ও কুরবানীর জন্য জমাকৃত টাকার উপরেও বছরান্তে যথানিয়মে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন ২৬. সূদ বা ঘুষের টাকার উপর কি যাকাত দিতে হবে?

ব্যাংক জমা বা সিকিউরিটির (ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার, বন্ড, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি) উপর অর্জিত সুদ এবং ঘুষের টাকা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ উপার্জন নয়

বিধায় যাকাতযোগ্য সম্পদের সঙ্গে যোগ করা যাবে না। সওয়াবের নিয়্যত ছাড়া অর্জিত সুদ কোন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে। তবে মূল জমাকৃত অর্থের বা সিকিউরিটির ক্রয় মূল্যের উপর যাকাত প্রদান করতে হবে। ব্যাংক জমার উপর বৈধ মুনাফা প্রদান করা হলে ঐ মুনাফা মূল জমার সঙ্গে যুক্ত করে যাকাতযোগ্য অন্যান্য সম্পত্তির সাথে যোগ করতে হবে।

প্রশ্ন ২৭. বৈদেশিক মুদ্রার উপর যাকাত কী হারে দিতে হবে?

যাকাত প্রদানের সময় উপস্থিত হলে মালিকানাধীন সকল বৈদেশিক মুদ্রার নগদ, ব্যাংকে জমা, টিসি, বন্ড, সিকিউরিটি ইত্যাদি যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তির বসবাসের দেশের কারেন্সির রেট নির্ধারণ করে অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে যোগ করে যাকাত প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন ২৮. মহিলারা বিয়ের মোহরাণার অর্থের উপর যাকাত কিভাবে দিবে?

'মাহর' বিধানের মাধ্যমে ইসলাম নারীদের জন্য এক অনন্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। কনে, বরের সাথে তার বিবাহবন্ধনে স্বীকৃতির সম্মানীস্বরূপ, বরের কাছ থেকে মাহর (মোহরাণা) পেয়ে থাকে। মাহর বাবদ প্রাপ্ত জমাকৃত অর্থের উপর যাকাত ধার্য হবে। মাহরের অর্থ নিসাব মাত্রার হলে অথবা অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে যোগ হয়ে নিসাব পূর্ণ হলে যাকাত প্রদান করতে হবে। মোহরাণার যে অর্থ আদায় করা হয়নি তার উপর যাকাত ধার্য হবে না, কারণ এই অর্থ তার আওতাধীনে নেই।

প্রশ্ন ২৯. শেয়ার ব্যবসার উপর কিভাবে যাকাত দিতে হবে?

যৌথ মূলধনী কোম্পানির মোট মূলধনকে সমমূল্য বিশিষ্ট বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রাংশে বিভক্ত করা হয়। এরূপ ক্ষুদ্রাংশগুলোকে শেয়ার বলে। শেয়ার মালিককে কোম্পানির নিট সম্পত্তির একজন অংশীদার হিসেবে গণ্য করা হয়। শেয়ার ক্রয়ের উদ্দেশ্য বৃহৎ কোম্পানির ব্যবসায় বিনিয়োগ, কোম্পানির আংশিক মালিকানা অর্জন এবং লভ্যাংশ বা মুনাফা উপার্জন করা। ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ যেমন- অসামাজিক বা অনৈতিক ব্যবসায়ে লিপ্ত, নিষিদ্ধ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় বা সুদী কারবার ও দৈবনির্ভর লেনদেনে নিয়োজিত কোম্পানির শেয়ার ক্রয় বৈধ নয়। কোম্পানি নিজেই

যদি শেয়ারের উপর যাকাত প্রদান করে তা হলে শেয়ারমালিককে তার মালিকানাধীন শেয়ারের উপর যাকাত দিতে হবে না। কোম্পানি যাকাত প্রদান করতে পারবে যদি কোম্পানির উপ-বিধিতে এর উল্লেখ থাকে অথবা কোম্পানির সাধারণ সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অথবা শেয়ারমালিকগণ কোম্পানিকে যাকাত প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করেন। কোম্পানি নিজে তার শেয়ারের উপর যাকাত প্রদান না করলে শেয়ার মালিককে নিম্নোক্ত উপায়ে যাকাত প্রদান করতে হবে ঃ

এক. শেয়ার মালিক যদি শেয়ারগুলো বার্ষিক লভ্যাংশ অর্জনের কাজে বিনিয়োগ করে, তা হলে যাকাতের পরিমাণ নিম্নোক্ত উপায়ে নির্ণয় করা হবে ঃ (ক) শেয়ার মালিক যদি কোম্পানির হিসাবপত্র যাচাই করে তার মালিকানাধীন শেয়ারের বিপরীতে যাকাতযোগ্য সম্পদের পরিমাণ জানতে পারেন, তাহলে তিনি ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করবেন। (খ) কোম্পানির হিসাবপত্র সম্পর্কে যদি তার কোন ধারণা না থাকে তাহলে তিনি তার মালিকানাধীন শেয়ারের উপর বার্ষিক অর্জিত মুনাফা যাকাতের জন্য বিবেচ্য অন্যান্য সম্পত্তির মূল্যের সঙ্গে যোগ করবেন এবং মোট মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করবেন।

দুই. শেয়ার মালিক যদি শেয়ার বেচাকেনার ব্যবসা (মূলধনীয় মুনাফা) করার জন্য শেয়ারগুলো ব্যবহার করেন তা হলে যেদিন যাকাত প্রদেয় হবে, শেয়ারের সেদিনের বাজার মূল্য ও ক্রয়-মূল্যের মধ্যে যেটি কম তারই ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করবেন।

প্রশ্ন ৩০. বানিজ্যিক সম্পদের উপর কিভাবে যাকাত প্রদান করতে হবে?

ব্যবসার নিয়্যতে (পুনঃবিক্রয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ মুনাফা অর্জনের জন্য) ক্রয়কৃত, আমদানী-রপ্তানী পণ্য, ট্র্যানজিট বা পরিবহন পণ্য, বিক্রয় প্রতিনিধির (এজেন্ট) কাছে রাখা পণ্যদ্রব্য ও মজুদ মালামালকে ব্যবসার পণ্য বলে। ব্যবসার পণ্যের উপর সর্বসম্মতভাবে যাকাত ফরয। এমনকি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত প্লট, এপার্টমেন্ট বা যে কোন বস্তু অথবা মালামালের মূল্যের উপরও যাকাত প্রদান করতে হবে। বাকী বিক্রির পাওনা, এলসি মার্জিন ও আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যবসার নগদ অর্থসহ অন্যান্য চলতি সম্পদ যাকাতের হিসাবে আনতে হবে। অন্যদিকে ব্যবসার দেনা

যেমন বাকীতে মালামাল বা কাঁচামাল ক্রয় করলে কিংবা বেতন, মজুরী, ভাড়া, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ও গ্যাস বিল, কর ইত্যাদি পরিশোধিত না থাকলে উক্ত পরিমাণ অর্থ যাকাত যোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে। যাকাত নির্ধারণের জন্য বিক্রেতা তার পণ্যের ক্রয়-খরচ মূল্যকে (ক্রয়মূল্যের সাথে ভাড়া সহ ক্রয়-সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ যোগ করে) হিসাবে ধরবেন।

প্রশ্ন ৩১. উৎপাদিত পণ্যের উপর কিভাবে যাকাত প্রদান করতে হবে?

তৈরি বা উৎপাদিত পণ্য, উপজাত দ্রব্য, প্রক্রিয়াধীন পণ্য, উৎপাদন প্রক্রিয়াধীন ব্যবহৃত কাঁচামাল ও প্যাকিং সামগ্রী ইত্যাদি যাকাতের আওতাভুক্ত হবে। যাকাত নির্ধারণের জন্য তৈরি বা উৎপাদিত পণ্যের মূল্যায়ন উৎপাদন খরচ মূল্যের অথবা পাইকারী বাজার দরের ভিত্তিতে হবে। প্রক্রিয়াধীন বা অসম্পূর্ণ পণ্যের মূল্যায়ন ব্যবহৃত কাঁচামাল ও অন্যান্য উপাদানের খরচের ভিত্তিতে করতে হবে। মজুদ কাঁচামাল এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কাঁচামালের সাথে ব্যবহৃত প্যাকিং সামগ্রী ক্রয়-খরচ মূল্যের ভিত্তিতে হিসাব হবে এবং যাকাতের আওতাধীন পণ্যদ্রব্যসহ ব্যবসার নগদ অর্থ ও অন্যান্য চলতি সম্পত্তির সাথে যোগ করে যাকাত নির্ধারণ করতে হবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত স্থায়ী সম্পদ যেমন- জমি, দালান, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, যানবাহন ইত্যাদির উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে না।

প্রশ্ন ৩২. স্থায়ী সম্পত্তির যাকাত কিভাবে প্রদান করতে হবে?

স্থায়ী সম্পত্তি বলতে বুঝায় জমি, বিল্ডিং, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি।

(ক) বসবাস, ব্যবহার, উৎপাদন কাজে বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত স্থায়ী সম্পত্তির উপর যাকাত ধার্য হয় না।

(খ) আয় উপার্জনের জন্য ভাড়ায় নিয়োজিত স্থায়ী সম্পত্তি যেমন- গৃহ, দোকান, বিল্ডিং, জমি, যন্ত্রপাতি, গাড়ি, যানবাহন ইত্যাদির উপর যাকাত ধার্য হয় না। তবে এসব সম্পত্তি থেকে ভাড়া বাবদ অর্জিত নিট আয় অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পত্তির সঙ্গে যোগ করে ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করতে হবে।

(গ) বেচা-কেনার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত স্থায়ী সম্পত্তি যেমন- জমি, গৃহ, দোকান, এপার্টমেন্ট, দালানকোঠা, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, গাড়ি, যানবাহন ইত্যাদি ব্যবসায়িক পণ্য বলে গণ্য করা হবে এবং এগুলোর মূল্যের উপর যাকাত ধার্য হবে।

প্রশ্ন ৩৩. ঋণগ্রস্ত এবং ঋণ পরিশোধে কি যাকাত প্রদান করা যাবে?

হ্যাঁ যাবে। যথার্থ কারণে ঋণগ্রস্ত এবং ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়লে তাদের ঋণ মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা যায়। সফরকারী যদি আর্থিক অসুবিধায় পতিত হয়, তবে তাকে যাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা যায়, যদিও তার বাড়ীর অবস্থা ভালো হয়। নও-মুসলিমকে পুনর্বাসনের জন্য যাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা যায়। যাকাত এমন লোককেই দিতে হবে যারা যাকাত নিতে পারে।

প্রশ্ন ৩৪. ঋণদাতার উপর যাকাতের নিয়ম কি?

(ক) আদায়যোগ্য ঋণ আদায় হওয়ার পর অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে যোগ করে যাকাত প্রদান করতে হবে।
ক-১. যে ঋণ নগদে বা কোন দ্রব্যের বিনিময়ে কারো কাছে পাওনা হয়, এরূপ ঋণ আদায় হওয়ার পর যাকাত দিতে হবে, এবং বিগত বৎসর সমূহেরও যাকাত প্রদান করতে হবে।
ক-২. যে পাওনা কোন দ্রব্য বা নগদ ঋণের বিপরীতে নয়, যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পদ, দান, অছিয়ত, মোহরাণার অর্থ ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে আদায়ের পর যাকাত ধার্য্য হবে। এগুলোর উপর বিগত বৎসর সমূহের যাকাত প্রদান করতে হবে না।
(খ) আদায় অযোগ্য বা আদায় হবার ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে সে ঋণ যাকাতের হিসাবে আসবে না। যদি কখনও উক্ত ঋণের টাকা আদায় হয়, তবে কেবলমাত্র ১ (এক) বছরের জন্য উহার যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন ৩৫. ঋণগ্রহিতার উপর যাকাত আদায়ের নিয়ম কি?

(ক) ঋণগ্রহিতার ঋণের টাকা মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে। কিন্তু যদি ঋণগ্রহিতার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থায়ী সম্পত্তি (যেমন- অতিরিক্ত বাড়ী, দালান, এপার্টমেন্ট, জমি, মেশিনারী, যানবাহন, গাড়ী ও

আসবাবপত্র ইত্যাদি) থাকে যা দ্বারা এরূপ ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম, তবে উক্ত ঋণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে না।

(খ) স্থাবর সম্পদের উপর কিস্তিভিত্তিক ঋণ (যেমন-হাউজিং লোন ইত্যাদি) যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে না। তবে বার্ষিক কিস্তির টাকা অপরিশোধিত থাকলে তা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে।

(গ) ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্য ঋণ নেয়া হলে উক্ত ঋণের টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে। কিন্তু যদি ঋণগ্রহিতার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থায়ী সম্পত্তি থাকে তবে উক্ত ঋণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে না।

(ঘ) শিল্প-বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঋণের টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে। তবে যদি ঋণগ্রহিতার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থায়ী সম্পত্তি থেকে উক্ত ঋণ পরিশোধ করা যায় তবে তা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে না।

(ঙ) যদি অতিরিক্ত স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য ঋণের পরিমাণের চেয়ে কম হয়, তবে ঋণের পরিমাণ থেকে তা বাদ দিয়ে বাকী ঋণের টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে। বিলম্বে প্রদেয় বা পুনঃতপসিলিকৃত ঋণের বেলায় শুধুমাত্র ঋণের বার্ষিক অপরিশোধিত কিস্তি যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে।

প্রশ্ন ৩৬. যাকাতের টাকা রক্ত সম্পর্কের অন্যান্য গরীব আত্মীয়দেরকে দেয়া যায় কি?

যাকাতের টাকা রক্ত সম্পর্কের অন্যান্য গরীব আত্মীয়দেরকে দিতে পারবে। এতে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন ৩৭. আমি ১০ কোটি টাকা ব্যংক লোন নিয়ে ১০ তলা বিল্ডিং করেছি এবং তার শোধ হতে ৩০ বছর লাগবে, আমি তো ঋণী, আমার কি যাকাত দিতে হবে?

অবশ্যই যাকাত দিতে হবে। এই ঋণ এবং যিনি জীবন চালাতে গিয়ে বিপদে পরে ঋণী হয়ে গেছেন এই দুই ব্যক্তি এক না। তাই ঋণ শোধ হওয়ার জন্য ৩০ বছর অপেক্ষা করার প্রশ্নই উঠে না। এই ঋণ গণায় ধরা

যাবে না এবং এই লোনের হিসাব অন্যান্য অর্থ-সম্পদের সাথেও মিলানো যাবে না।

প্রশ্ন ৩৮. এক ব্যক্তির দশ লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার সার্টিফিকেট আছে। বর্তমানে বাজারে শেয়ার মূল্য ১২,০০,০০০ টাকায় উন্নীত হল বা ৮০০,০০০ টাকায় নেমে গেল। যাকাত প্রদানের সময় মূল্য কোনটা ধরতে হবে- ফেস ভ্যালু না মার্কেট ভ্যালু?

যাকাত আদায় করার সময় শেয়ারের যে বাজার মূল্য থাকে সে অনুযায়ী যাকাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন ৩৯. স্ত্রীর ব্যবহৃত নিসাব পরিমাণ স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে কি? নিসাবের কম পরিমাণ স্বর্ণ স্বামীর অর্থের সাথে মিলিয়ে নিসাব পরিমাণ হলে স্বামীকে স্ত্রীর স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে কি?

স্ত্রীর অলংকার বা সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে স্ত্রীর উপরই যাকাত ফরয হবে। তার সম্পদের যাকাত আদায় করা স্বামীর জন্য জরুরী নয়। অবশ্য স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামী আদায় করে দিলে আদায় হয়ে যাবে। নিসাব পূরণের জন্য স্বামীর অর্থের সাথে স্ত্রীর অলংকার বা অর্থকে মিলাতে হবে না।

প্রশ্ন ৪০. প্রাপ্ত বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়েকে যদি স্বর্ণ অথবা টাকা দেয়া হয় তাহলে কী সেটা পিতার সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে এবং পিতাকে সেই সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে?

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য মালিকানা শর্ত। মেয়েকে যে স্বর্ণ অথবা টাকা দেয়া হয় তা যদি তাকে পুরোপুরিভাবে দেয়া হয় অর্থাৎ সে যদি তার মালিক হয়ে যায় তাহলে সে সম্পদের যাকাত আদায় করা পিতার উপর ফরয নয়। কিন্তু মেয়েকে তার নিজের যাকাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন ৪১. আমার স্ত্রীর পঞ্চাশ ভরি স্বর্ণালংকার আছে। আমার নিজের আয় সীমিত হওয়াতে উক্ত স্বর্ণের যাকাত দেয়া খুবই কষ্টকর। এখন কি করব?

অলংকারের যিনি মালিক যাকাত তাকেই দিতে হবে। অলংকারের কিছু অংশ বিক্রি করে হলেও প্রতিবছর যাকাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন ৪২. স্বর্ণ বা রৌপ্যের যাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে খাদসহ হিসাব করতে হবে নাকি খাদ ছাড়া? এবং বিক্রয় মূল্য নাকি ক্রয় মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে?

স্বর্ণ রৌপ্যের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে আমরা বিক্রি করতে গেলে যে মূল্য পাই (বর্তমান বাজার মূল্য) সেই মূল্য হিসাব করে আমাদেরকে যাকাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন ৪৩. বছরের মাঝখানে যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকে তখন সময়ের হিসাবটা কিভাবে করবো?

বছরের শুরুতে যদি কারও নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং বছরের শেষেও যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে তাহলে মাঝখানে না থাকলেও তাকে ঐ বছরের যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন ৪৪. ধার দেয়া টাকা সময় মত না পেলেও এ টাকাকে কি যাকাতের হিসাবে ধরে নেবো?

যে ধার দেয়া টাকা নিশ্চিত ফেরত পাওয়া যাবে তার যাকাত আদায় করতে হবে। আর যে ধার দেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে, এমন টাকার যাকাত নেই। কেবলমাত্র টাকা হাতে পাবার পরে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন ৪৫. কাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না?

ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত খাওয়া বা ধনী ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া জায়িয নয়। আপন দরিদ্র পিতা-মাতা, দাদা-দাদী তথা ঊর্ধ্বস্থ সকল নারী-পুরুষ, অনুরূপ ভরণ-পোষণে নির্ভরশীল পুত্র-কন্যা, তাদের পুত্র-কন্যা এবং স্বামী স্ত্রীকে যাকাত প্রদান করা জায়িয নেই। যাকাত বহির্ভুত সম্পদের দ্বারা তাহাদের ভরণ-পোষণ করা ওয়াজিব। সুতরাং যাকাতের অর্থে মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করাও জায়িয নয়। যাকাত দেয়া যেমন শরীয়তের বিধান, অনুরূপ যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকেই যাকাত দেয়া শরীয়তের বিধান। সঠিক পাত্রে যাকাত প্রদান না করলে যাকাত পরিশোধ হবে না।

প্রশ্ন ৪৬. ব্যবসায়িক বিক্রয়যোগ্য মালামাল কি যাকাতের হিসাবে আসবে? আসলে মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য না বিক্রয় মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে?

ব্যবসায়িক মালামাল ক্রয় মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন ৪৭. স্থাবর সম্পত্তি যেমন বাড়িঘর, জায়গা-জমি, শিল্প প্রতিষ্ঠান কী যাকাতের হিসাবে আসবে?

বসবাসের বাড়ি, জায়গা-জমি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মেশিনপত্র কল-কারখানা এগুলোর যাকাত দিতে হয় না। কোন বাড়ি, এপার্টমেন্ট বা প্লট যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে রাখা হয় তাহলে তার যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন ৪৮. নাবালিকা মেয়ের নামে তার পিতা ফিক্সড ডিপোজিট করেছেন। ইচ্ছা করলে পিতা সেই টাকা যেকোন সময় উঠাতে পারেন এবং নিজের প্রয়োজনে খরচ করতে পারবেন। প্রশ্ন হলো যাকাতের হিসাবে পিতার টাকার সাথে এই টাকা যোগ করতে হবে কি না?

নাবালিকা সন্তানের নামে যে অর্থ সঞ্চিত হয়েছে সে অর্থের মালিক যেহেতু পিতা নিজে সেজন্য এর যাকাত পিতাকেই দিতে হবে।

প্রশ্ন ৪৯. আমি স্বর্ণের যাকাত দেই। আবার ব্যাংকে এক লাখ টাকা জমা আছে এবং মেয়ের নামে ইনশূর্যান্স আছে এগুলোরও কি যাকাত দিতে হবে?

আমাদের নগদ টাকারও যাকাত আদায় করতে হবে এবং ইনশূর্যান্স এ জমাকৃত টাকারও যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন ৫০. আমার স্ত্রীর ১০ ভরি স্বর্ণ রয়েছে। তার কি পুরো স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে? নাকি শুধু সাড়ে সাত ভরির যাকাত আদায় করলেই চলবে?

পুরো ১০ ভরি স্বর্ণের যাকাতই আদায় করতে হবে। এবং নিজের আরো কোন সম্পদ ও ক্যাশ টাকা থাকলে তাও তার সাথে যোগ করতে হবে।

প্রশ্ন ৫১. যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে ৫২ তোলা রুপার নিয়ম কেন হলো? দুটোর মূল্য তো সমপরিমাণ নয়। কোনটি কার জন্য প্রযোজ্য?

সে যুগে স্বর্ণ মুদ্রা (দীনার) ও রৌপ্য মুদ্রা (দিরহাম) চালু ছিল এবং সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণ ও সাড়ে ৫২ তোলা রুপার মূল্যমান প্রায় সমান ছিলো, তাই এই নিয়ম চালু করা হয়।

প্রশ্ন ৫২. ব্যাংকে ডিপিএস বাবদ প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা কিস্তি প্রদান করছি। উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

জি, হ্যাঁ। যে মাসে যাকাত আদায় করবো সে মাসে লাভসহ জমাকৃত মোট ব্যালেন্স যা আছে তার উপর যাকাত দিতে হবে। এবং অন্যান্য সম্পত্তি ও টাকা এর সাথে যোগ করতে হবে।

প্রশ্ন ৫৩. আমার RRSP, সন্তানদের RESP এবং Bond আছে। এগুলোর কি যাকাত দিতে হবে?

হ্যাঁ, এগুলো সব যোগ করে এবং ব্যাংকের টাকাসহ অন্যান্য সম্পদ যোগ করে তার উপর যাকাত আদায় করতে হবে। অর্থাৎ যে টাকা চাইলেই ক্যাশ করে নিজের হাতে নিয়ে আসা যাবে তারই যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন ৫৪. যৌথ মালিকানার মালের যাকাত কিভাবে আদায় করতে হবে?

যৌথ মালিকানার মালের যাকাত ব্যক্তিগতভাবে নিজের অন্যান্য মালের সাথে দেয়া যায় আবার সম্মিলিতভাবেও শুধু যৌথ মালিকানার মাল থেকে যাকাত পরিশোধ করা যায়।

প্রশ্ন ৫৫. যাকাত কি শুধু নগদ অর্থে প্রদান করতে হবে?

যাকাত নগদ অর্থে প্রদান করা উচিত। গরীবের কাছে নগদ অর্থই অধিকতর কল্যাণকর। কারণ নগদ অর্থের দ্বারা যে কোন প্রয়োজন মিটানো যায়। যাকাত কোন প্রকার দয়া বা অনুগ্রহ নয়। সর্বপ্রকার লৌকিকতা, যশ-খ্যাতি ও পার্থিব স্বার্থের উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন ৫৬. আমি আমার বাৎসরিক আয়ের উপর যথাযথভাবে ইনকাম ট্যাক্স প্রদান করে আসছি- যা আমার কোম্পানী প্রতিমাসে বেতন থেকে কেটে নিচ্ছে। তারপরও কি আমাকে যাকাত দিতে হবে?

যাকাত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক ধার্যকৃত। আর রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের ট্যাক্সের প্রচলন রয়েছে যা সরকারের হক। এ দু'টোই আলাদা আলাদা ভাবে আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন ৫৭. আমার কাছে ক্যাশ আছে ১ লাখ টাকা, স্বর্ণ আছে ১০ ভরি এবং লোন আছে ৭ লাখ টাকা। আমার যাকাত কত দিতে হবে?

ধরি, ১০ ভরি স্বর্ণের দাম ৬০০,০০০+ক্যাশ ১০০,০০০=৭০০,০০০ টাকা। লোন শোধ করার পর আর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে না, তাই যাকাত দিতে হবে না।

প্রশ্ন ৫৮. সুদ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদের যাকাত দিলে সম্পদ পবিত্র ও বৃদ্ধি পাবে কি? অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা হাজ্জ করলে তার হাজ্জ হবে কি?

সুদ আদান-প্রদান এবং যে কোন হারাম উপায়ে অর্জিত অর্থ যেমন সরকারকে ফাঁকি দেয়া ইনকাম ট্যাক্স, ব্যবসায় লস বা কম লাভ দেখিয়ে বা কম ইনকাম দেখিয়ে সরকার থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা নিয়ে জমানো টাকার যাকাত দিলে তা হালাল বা পবিত্র হয় না এবং তা দ্বারা হাজ্জ করলে সে হাজ্জ আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।

প্রশ্ন ৫৯. প্রতিমাসে প্রাপ্য বেতনের যাকাত কিভাবে প্রদান করতে হবে?

এক্ষেত্রে সুন্দর পন্থা হচ্ছে, প্রথম বেতনের যদি এক বছর পুর্তি হয়; তবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট করে সবগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে। যে বেতনে বছর পূর্ণ হয়েছে তার যাকাত সময়ের মধ্যেই আদায় করা হল। আর যাতে বছর পূর্ণ হয়নি তার যাকাত অগ্রীম আদায় হয়ে গেল। প্রতিমাসের বেতন আলাদা হিসাব রাখার চাইতে এটাই হচ্ছে সহজ পন্থা। কিন্তু দ্বিতীয় মাসের

বেতন আসার আগেই যদি প্রথম মাসের বেতন খরচ হয়ে যায়, তবে তার উপর কোন যাকাত নেই। কেননা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হচ্ছে বছর পূর্ণ হওয়া।

প্রশ্ন ৬০. শিশু ও পাগলের সম্পদে কি যাকাত ওয়াজিব হবে?

তাদের সম্পদে যাকাত আবশ্যক হবে। কেননা যাকাত সম্পদের অধিকার। মালিক কে তা দেখার বিষয় নয়। আল্লাহ বলেন, "তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন।" (সূরা তাওবা ঃ ১০৩)

এখানে আবশ্যকতার নির্দেশ সম্পদে করা হয়েছে। তাছাড়া মুআ'য বিন জাবাল (রা.)-কে নাবী ﷺ ইয়ামান প্রেরণ করে বলেছিলেন, "তাদেরকে জানিয়ে দিবে আল্লাহ তাদের সম্পদে যাকাত ফরয করেছেন। ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অভাবীদের মাঝে বিতরণ করা হবে।" অতএব এর ভিত্তিতে নাবালেগ ও পাগলের সম্পদে যাকাত আবশ্যক হবে। তাদের অভিভাবক এ যাকাত প্রদান করার দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রশ্ন ৬১. জনৈক ব্যক্তি চার বছর যাকাত আদায় করেনি। এখন তার করণীয় কি?

যাকাত আদায়ে বিলম্ব করার কারণে এ লোক গুনাহগার হবে। কেননা মানুষের উপর ওয়াজিব হচ্ছে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে যাকাত আদায় করে দেয়া। আবশ্যিক বিষয়ের মূল হচ্ছে, সময় হওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে তা সম্পাদন করে ফেলা। এ লোকের উচিত আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাওবা করা। তার উপর আবশ্যক হচ্ছে বছরগুলোর হিসাব করে যাকাত আদায় করে দেয়া। উক্ত যাকাতের কোন কিছুই তার থেকে বাদ যাবে না। তাকে তাওবা করতে হবে এবং দ্রুত যাকাত আদায় করে দিতে হবে। যাতে করে দেরী করার কারণে গুনাহ আরো বাড়তে না থাকে।

প্রশ্ন ৬২. নিজের প্রদত্ত যাকাত থেকে গ্রহীতা যদি উপহার স্বরূপ কিছু প্রদান করে, উহা কি গ্রহণ করা যাবে?

যাকাতের হকদার কোন ব্যক্তি যদি প্রাপ্ত যাকাত থেকে প্রদানকারীকে কিছু হাদিয়া বা উপহার স্বরূপ দেয়, তবে উহা নিতে কোন বাধা নেই। কিন্তু

তাদের মাঝে যদি পূর্ব থেকে কোন গোপন সমঝোতা হয়ে থাকে তবে তা হারাম। এই কারণে তার উক্ত হাদিয়া বা উপহার গ্রহণ না করাই উত্তম।

প্রশ্ন ৬৩. সম্পদের যাকাত টাকার পরিবর্তে কাপড় ইত্যাদি প্রদান করা কি জায়িয হবে?

না, তা জায়িয হবে না। আমাদের দেশে অনেক প্রভাবশালীরা ঘোষণা দিয়ে যাকাতের শাড়ি-লুঙি বিতরণ করে থাকেন এবং অনেক লোক ভীরের কারণে চাপাচাপিতে মারা যায়, এই কাজ মোটেও ঠিক নয়।

প্রশ্ন ৬৪. স্বর্ণের সাথে মূল্যবান ধাতু হীরা প্রভৃতি থাকলে কিভাবে স্বর্ণের যাকাত দিবে?

অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উহা নির্ধারণ করবেন। স্বর্ণ ব্যবসায়ী বা স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে পরিমাণ জেনে নিতে হবে। এখানে যে পরিমাণ স্বর্ণ আছে তা নিসাব পরিমাণ হয় কি না? নিসাব পরিমাণ না হলে যাকাত নেই। তবে তার কাছে অন্য স্বর্ণ থাকলে তা দ্বারা নিসাব পূর্ণ করে হিরা প্রভৃতি মিশ্রিত স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণ করে তা থেকে ২.৫% হারে যাকাত আদায় করবেন।

প্রশ্ন ৬৫. যাকাতের অর্থ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করার বিধান কি?

যাকাতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে আট শ্রেণীর কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন, তা ছাড়া অন্য কোন খাতে যাকাত প্রদান করা জায়িয নয়। তাই যাকাতের টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না।

প্রশ্ন ৬৬. যাকাতের টাকা দিয়ে কি ইয়াতিমখানা এবং মাদ্রাসা তৈরী করা যাবে?

না। যাকাতের টাকা দিয়ে ইয়াতিমখানা এবং মাদ্রাসা তৈরী করা যাবে না।

প্রশ্ন ৬৭. যাকাতের টাকা কি ইয়াতিমদের ভরণপোষণের জন্য দেয়া যাবে?

হ্যাঁ। যাকাতের টাকা ইয়াতিমদের ভরণপোষণের জন্য অবশ্যই দেয়া যাবে।

প্রশ্ন ৬৮. যাকাতের টাকা কি মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের অথবা স্কুল/কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ হিসেবে দেয়া যাবে?

হ্যাঁ। যাকাতের টাকা মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া-লেখার জন্য অবশ্যই দেয়া যাবে।

প্রশ্ন ৬৯. যাকাতের টাকা কি নিজ গরীব ভাই-বোনদের দেয়া যাবে?

হ্যাঁ। যাকাতের টাকা নিজ গরীব ভাই-বোনদের অবশ্যই দেয়া যাবে। তাদের হক আগে।

প্রশ্ন ৭০. কেউ কেউ প্রচুর টাকা বা সম্পদ এমন এমন খাতে ইনভেষ্ট করে রাখেন যেন যাকাত দিতে না হয়, এটা কি করা উচিত?

অবশ্যই এই কাজটি ঘৃনিত, আর এই কাজটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে চালাকি করা, তিনি বান্দার মনের খবর ঠিকই জানেন। মনে রাখতে হবে সম্পদ আল্লাহই দিয়েছেন এবং যাকাতের মাধ্যমে তিনি তা পবিত্র করেন।

প্রশ্ন ৭১. কেউ কেউ বলেন স্বর্ণের যাকাত আলাদা এবং উশরের মতো টাকা ও অন্যান্য সম্পদের যাকাত আলাদা, এটা কি ঠিক ?

এই ধরণের মতবাদ ঠিক নয়। স্বর্ণ, টাকা এবং অন্যান্য সম্পদ সব মিলে একটি খাত এবং এর নিসাবও এক। শুধু উশরের নিসাব ভিন্ন।

প্রশ্ন ৭২. ভাড়া বা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত গাড়ীতে কি যাকাত আবশ্যক?

ভাড়ার কাজে মানুষ যে গাড়ী ব্যবহার করে অথবা নিজের ব্যক্তিগত কাজে যে গাড়ী ব্যবহার করা হয় তার কোনটাতেই যাকাত নেই। তবে প্রাপ্ত ভাড়া যদি নিসাব পরিমাণ হয় বা তা অন্য অর্থের সাথে মিলিত করে তা নিসাব পরিমাণ পৌঁছে এবং এক বছর অতিক্রান্ত হয় তবে তাতে যাকাত দিতে হবে। অনুরূপভাবে ভাড়ায় ব্যবহৃত জমি বা ভূমিতে যাকাত নেই। তার প্রাপ্ত ভাড়া থেকে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন ৭৩. ওয়াক্‌ফাকৃত সম্পদ ও টাকার উপর কি যাকাত আছে?

না, ওয়াক্‌ফাকৃত সম্পদ এবং দান করা টাকার উপর কোন যাকাত নেই। কারণ এই টাকা এবং সম্পদের মালিক সে নয়। যদিও এই সম্পদ এবং টাকা তার নামে বা তার কাছে বা তার একাউন্টে গচ্ছিত থাকে।

প্রশ্ন ৭৪. এক ব্যক্তি বসবাসের উদ্দেশ্যে একটি প্লট ক্রয় করেছে। তিন বছর পর সে উহা দ্বারা ব্যবসা করার ইচ্ছা করল। এখন উক্ত তিন বছরের কি যাকাত দিতে হবে?

বিগত বছরগুলোর জন্য কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা সে তো বসবাসের জন্য উহা ক্রয় করেছিল। কিন্তু ব্যবসা ও উপার্জনের নিয়্যত করার সময় থেকেই বছরের হিসাব শুরু করতে হবে। যখন বছর পূর্ণ হবে তখনই তাতে যাকাত আবশ্যক হবে।

প্রশ্ন ৭৫. রমাদানের প্রথম দশকে যাকাতুল ফিতর (ফিতরা) আদায় করার বিধান কি?

যাকাতুল ফিতর শব্দটির নামকরণ করা হয়েছে সিয়াম (রোযা) ভঙ্গকে কেন্দ্র করে। সিয়াম (রোযা) ভঙ্গ বা শেষ করার কারণেই উক্ত যাকাত প্রদান করা আবশ্যক। সুতরাং উক্ত নির্দিষ্ট কারণের সাথেই সংশ্লিষ্ট রাখতে হবে, অগ্রীম করা চলবে না। একারণে ফিতরা দেয়ার সর্বোত্তম সময় হচ্ছে ঈদের দিন সলাতের পূর্বে। কিন্তু ঈদের একদিন বা দু'দিন আগে তা আদায় করা জায়িয। কেননা এতে প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর জন্য সহজতা রয়েছে। কিন্তু এরও আগে দেয়ার ব্যাপারে স্কলারদের মত হচ্ছে তা জায়িয নয়। এই ভিত্তিতে ফিতরা আদায় করার সময় দু'টি ঃ ১) জায়িয বা বৈধ সময়। তা হচ্ছে ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্বে। ২) ফযীলতপূর্ণ উত্তম সময়। তা হচ্ছে ঈদের দিন- ঈদের সলাতের পূর্বে। কিন্তু সলাতের পর পর্যন্ত দেরী করে আদায় করা হারাম। তা ফিতরা হিসেবে গ্রহণ হবে না এবং সাধারণ সদাকা হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ৭৬. সদাকায়ে ফিতর (ফিতরা) কাদের উপর ওয়াজিব?

ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের পূর্বে যার নিকট তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের পরিমাণ মাল আছে তাকে ফিতরা পরিশোধ করতে হবে। আর এ ফিতরা তাকে তার নিজের ও তার পোষ্যদের পক্ষ

থেকে ঈদের সলাতের আগে পরিশোধ করতে হবে। তবে, রমাদানের মধ্যেই পরিশোধ করে দেয়া উত্তম। ফিতরা আদায় করা হয় সিয়ামের ভুল ত্রুটি দূর করার জন্যে।

প্রশ্ন ৭৭. সদাকার নিয়তে বেশী করে ফিতরা আদায় করা জায়িয হবে কি?

হ্যাঁ, বেশী করে ফিতরা আদায় করা জায়িয। ফিতরার অতিরিক্ত বস্তু সদাকার নিয়্যতে প্রদান করবে। যেমন আজকাল বহু লোক এরূপ করে থাকেন। মনে করি একজন লোক দশ জনের ফিতরা আদায় করবে। এই উদ্দেশ্যে সে এক বস্তা চাউল ক্রয় করে যাতে দশ জনের অধিক ব্যক্তির ফিতরা আদায় করা যাবে। অতঃপর উহা নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে আদায় করেন। এটা জায়িয যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ বা তার চাইতে বেশী চাউল আছে। বস্তার মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ যদি জানা যায় তবে উহা আদায় করাতে কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন ৭৮. যে সমস্ত বস্তু দ্বারা ফিতরা দেয়ার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে চাল এবং টাকার কথা উল্লেখ নেই, তাই ফিতরা হিসেবে চাল অথবা টাকা দেয়া যাবে কি?

একদল আলেম বলেন, হাদীসে উল্লেখিত পাঁচ প্রকার বস্তু ঃ গম, খেজুর, যব, কিসমিস এবং পনীর- এগুলো যদি থাকে তবে অন্য বস্তু দ্বারা ফিতরা আদায় করা জায়িয হবে না। অন্য একটি মত হচ্ছে উল্লেখিত বস্তু এবং অন্য যে কোন বস্তু এমনকি টাকা-পয়সা দ্বারাও ফিতরা আদায় করা বৈধ। বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে ঃ মানুষের সাধারণ খাদ্য থেকে ফিতরা আদায় করা বৈধ। সহীহ বুখারীতে আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন “আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এক সা’ পরিমাণ খাদ্য ফিতরা হিসেবে বের করতাম। খেজুর, যব, কিসমিস ও পনীর।” এ হাদীসে গমের কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া যাকাতুল ফিতরে গম দেয়া যাবে এরকম সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ কোন হাদীস জানা নেই। কিন্তু তারপরও নিঃসন্দেহে গম বা চাল দ্বারা ফিতরা আদায় বৈধ যেহেতু এগুলো খাদ্যের মধ্যে পরে।

প্রশ্ন ৭৯. কারো নিকট যদি মৃত ব্যক্তির অসীয়তকৃত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থাকে এবং ইয়াতীমের কিছু সম্পদ থাকে, তাতে কি যাকাত দিতে হবে?

মৃত ব্যক্তির ছেড়ে যাওয়া সম্পদের উক্ত এক তৃতীয়াংশে কোন যাকাত নেই। কেননা তার কোন মালিক নেই। উহা তো অসীয়ত অনুযায়ী জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু ইয়াতীমের অর্থ যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং বছর পূর্ণ হয় তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। ইয়াতীমের অভিভাবক সেই যাকাত প্রদান করবেন। বিদ্বানদের মতসমূহের মধ্যে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া বা বিবেকবান হওয়া শর্ত নয়।

প্রশ্ন ৮০. ব্যক্তিগত ব্যবহৃত জিনিসে কি যাকাত দিতে হবে?

এতে কোন যাকাত নেই। স্বর্ণ-রৌপ্য ছাড়া মানুষের ব্যবহৃত কোন বস্তুতে যাকাত নেই। যেমন গাড়ী, ঘর-বাড়ী, শাড়ি, সালওয়ার-কামিজ, টিভি, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৮১. এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাকাত স্থানান্তর করার বিধান কি?

এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাত স্থানান্তর করলে যদি কল্যাণ থাকে তবে তা জায়িয। যাকাত প্রদানকারীর কোন নিকটাত্মীয় যাকাতের হকদার অন্য শহরে থাকে তবে তার নিকট যাকাত প্রেরণ করলে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে জীবন যাত্রার মান উঁচু এমন দেশে বসবাস করে এবং তুলনামূলক অভাবী দেশে যদি যাকাত প্রেরণ করে তবেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি অন্য শহরে বা দেশে যাকাত প্রেরণ করাতে তেমন কোন কল্যাণ না থাকে তবে তা স্থানান্তর করা যাবে না।

প্রশ্ন ৮২. ঋণগ্রস্তের হাতে যাকাত দেয়া উত্তম? না কি তার পাওনাদারের নিকট গিয়ে তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা উত্তম?

বিষয়টির বিধান অবস্থা ভেদে ভিন্ন রকম হতে পারে। ঋণ গ্রস্ত ব্যক্তি যদি দায়মুক্তি ও ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়। অর্থ হাতে এলে ঋণ

পরিশোধ করবে এরকম বিশস্ত হয় তবে যাকাতের অর্থ তার হাতেই প্রদান করা উচিত। যাতে করে উহা পরিশোধ করতে পারে। তার ব্যাপারটা গোপন থাকে। দাবীদারদের সামনে লজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি বেহিসাবী অপব্যয়ী হয়। তার হাতে অর্থ আসলে ঋণ পরিশোধের পরিবর্তে অপ্রয়োজনীয় খাতে তা খরচ করে, তবে যাকাতের অর্থ তাকে না দিয়ে সরাসরি পাওনাদারের নিকট গিয়ে, প্রাপ্য জেনে নিয়ে- তা পরিশোধ করে দিতে হবে অথবা সাধ্যানুযায়ী তার ঋণ হালকা করে দিতে হবে।

প্রশ্ন ৮৩. যারাই যাকাত গ্রহণের জন্য হাত বাড়ায় তারাই কি তার হকদার?

যাকাতের জন্য যে কেউ হাত বাড়ালেই তাকে যাকাত দেয়া উচিত নয়। কেননা সম্পদশালী হওয়া সত্বেও অনেক মানুষ পয়সার লোভে হাত বাড়ায়। এসমস্ত লোক কিয়ামত দিবসে এমন অবস্থায় আসবে যে তার মুখমন্ডলে এক টুকরা গোস্তও থাকবে না (নাউযুবিল্লাহ) সমস্ত মানুষের সাক্ষাতে কিয়ামত দিবসে তার মুখ মন্ডলের শুধুমাত্র হাড় ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না।

প্রশ্ন ৮৪. দুর্বল ঈমানের অধিকারী কোন ব্যক্তিকে ঈমান শক্তিশালী করার জন্য যাকাত দেয়া যাবে কি? সে কিন্তু কোন এলাকার নেতা নয়।

ইসলামের প্রতি ধাবিত করতে ঈমান শক্তিশালী করার জন্য তাকে যাকাত দিলে কোন অসুবিধা নেই। যদিও সে কোন এলাকার নেতা না হয়। কেননা আল্লাহ বলেন, "তাদের হৃদয়গুলো ইসলামের দিকে ধাবিত করার জন্য।"

প্রশ্ন ৮৫. ইসলামী জ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত ছাত্রকে যাকাত দেয়ার বিধান কি?

ইসলামী জ্ঞান শিক্ষার কাজে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত ছাত্রদেরকে যাকাত দেয়া জায়িয, যদিও তারা কামাই রোজগার করার সামর্থ রাখে। কেননা ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা করা এক প্রকার আল্লাহর পথে সংগ্রাম। আর আল্লাহর পথে সংগ্রাম হচ্ছে যাকাতের একটি খাত।

প্রশ্ন ৮৬. মুজাহিদদেরকে যাকাত প্রদান করা কি জায়িয?

যাকাত প্রদানের খাত সমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদদের কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব আল্লাহর পথের মুজাহিদদেরকে যাকাত প্রদান করা জায়িয। কিন্তু আল্লাহর পথের মুজাহিদ কে?

"যে ব্যক্তি সংগ্রাম করবে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে সেই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী।" (সহীহ বুখারী) অতএব প্রত্যেক যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য সংগ্রাম করবে- আল্লাহর শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার জন্য সেই আল্লাহর পথে, সেই মুজাহিদ। তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে। তাকে নগদ অর্থ প্রদান করা যাবে।

প্রশ্ন ৮৭. যাকাত কি শুধু রমাদান মাসেই আদায় করতে হবে?

দান-সদাকা রমাদান মাসের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং উহা সর্বাবস্থায় প্রদান করা মুস্তাহাব। আর নিসাব পরিমাণ সম্পদে বছর পূর্ণ হলেই যাকাত দেয়া ওয়াজিব এর সাথে রমাদানের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন ৮৮. স্ত্রী যদি স্বামীর সম্পদ থেকে নিজের জন্য দান করে বা মৃত নিকটাত্মীয়ের জন্য দান করে, তবে তা জায়িয হবে কি?

একথা নিশ্চিত জানা যে, স্বামীর সম্পদ স্বামীরই। অনুমতি ছাড়া কারো সম্পদ দান করা কারো জন্য বৈধ নয়। স্বামী যদি অনুমতি প্রদান করে তবে স্ত্রীর নিজের জন্য বা তার মৃত আত্মীয়ের জন্য দান করা জায়িয, কোন অসুবিধা নেই। অনুমতি না পেলে এরূপ করা হালাল নয়।

প্রশ্ন ৮৯. এক ফকীর এক ধনী লোকের যাকাত নিয়ে আসে এই কথা বলে যে, তার পক্ষ থেকে সে তা বিতরণ করে দিবে। তারপর তা সে নিজের কাছেই রেখে দেয়। তার এ কাজের বিধান কি?

এটা হারাম। ইহা আমানতের খিয়ানত। কেননা মালিক তো দায়িত্বশীল হিসেবে তাকে যাকাত দিয়েছে। যাতে করে উহা বন্টন করে দেয়। অথচ সে নিজেই তা রেখে দেয়। কোন বস্তুর জিম্মাদারপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত বস্তু থেকে নিজের জন্য কোন কিছু নিতে পারবে না। আবার কেউ কেউ যাকাত নিয়ে

নিজে খায় না, অন্য মানুষকে দেয়। কিন্তু যাকাতের মালিক বিষয়টি জানে না বা তাকে এ ব্যাপারে দায়িত্বও দেয়া হয়নি। এরূপ করাও তার জন্য হারাম।

প্রশ্ন ৯০. যাকাতের অর্থ কি কোন অর্গাইজেশনকে দেয়া যাবে?

হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি তার যাকাত, কোন যাকাত ম্যানেজমেন্ট বা ডিষ্ট্রিবিউশন অর্গাইজেশনকে দিতে পারবে। এতে হয়তো তার যাকাতের সঠিক ও উত্তম ব্যবহার হবে।

প্রশ্ন ৯১. যাকাতের টাকা দিয়ে কি ইসলামের দাওয়াতী কাজ করা যাবে?

হ্যাঁ, অবশ্যই যাকাতের টাকা দিয়ে ইসলামের দাওয়াতী কাজ করা যাবে। সূরা আত-তাওবায় যাকাত প্রদানের যে আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে তার সাত নম্বর খাতটি হচ্ছে 'ফী সাবিলিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর পথে যার অর্থ ব্যাপক। এই সাত নম্বার খাত অনুসারে যাকাতের টাকা ইসলামের দাওয়াতী কাজে লাগানো যাবে। যেমন, দাওয়াতী কাজের জন্য টিভি চ্যানেল, রেডিও চ্যানেল, পত্রিকা, প্রকাশনা, বিলবোর্ড, অমুসলিমদের জন্য দাওয়া মেটারিয়ালস, নানারকম লজিষ্টিক সাপোর্ট ইত্যাদি। যেমন, পিস টিভির মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতী কাজ হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ৯২. আমার কয়েকটি এপার্টমেন্ট আছে, কীভাবে যাকাত আদায় করবো?

নিজে যে এপার্টমেন্টে বসবাস করি সেটার যাকাত দিতে হবে না। এবং বাকী অন্যান্য এপার্টমেন্টের বাৎসরিক ভাড়া হিসাব করে (সমস্ত খরচ বাদে বছর শেষে হাতে নগদ যা থাকে) তার উপর যাকাত দিতে হবে অর্থাৎ ভাড়ার উপর যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন ৯৩. আমার কয়েকটি জমি আছে, কীভাবে যাকাত আদায় করবো?

জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের যাকাত আদায় করতে হবে। তবে যদি এগুলো ফসলের জমি না হয়ে বিল্ডিং করার মতো প্লট হয়ে থাকে এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে না হয়ে থাকে তাহলে তার উপর যাকাত দিতে হবে না।

প্রশ্ন ৯৪. উশর কী?

ফসল ও ফলমূলের যাকাতকে উশর বলে। জমিতে ফসল উৎপাদিত হলেই তার যাকাত দিতে হবে। এর কোন সময় নেই।

প্রশ্ন ৯৫. শস্য ও ফলের যাকাতের (উশর) নিয়ম কী?

জমি থেকে উৎপন্ন সকল প্রকার শস্য, শাকশব্জি, তরি-তরকারি ও ফলের উপর যাকাত প্রযোজ্য। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা হলে বনজ বৃক্ষ, ঘাস, নলখাগড়া, ঔষধি বৃক্ষ, চা বাগান, রাবার চাষ, তূলা, আগর, ফুল, অর্কিড, বীজ, চারা, কলম ইত্যাদি যাকাতের আওতাভুক্ত হবে। ফসল আসার সাথে সাথে উশর পরিশোধ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। বৎসরে একাধিকবার ফসল আসলে একাধিকবার উশর পরিশোধ করতে হবে। অনেক ধরনের ফল, ফসল ও শাকশব্জি একই সাথে কাটা বা উত্তোলন করা যায় না। যেমন- মরিচ, বেগুন, পেঁপে, লেবু, কাঁঠাল ইত্যাদির পরিপক্কতা বুঝে কিছু কিছু করে কয়েকদিন পর পর পুরো কৃষি মৌসুমে বার বার উত্তোলন করা হয়। ফসলের মালিক যদি ফসলের আনুমানিক পরিমাণ নিরূপণ করতে সমর্থ হন এবং তা যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবে প্রথম থেকেই প্রতি উত্তেলনের সাথে সাথে উশর(যাকাত) পরিশোধ করবেন। যদি মালিকের পক্ষে ফলফসলের পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব না হয়, তবে তিনি প্রথম উত্তোলন থেকে ফসলের হিসাব রাখবেন এবং যখনি মোট উত্তোলিত ফসলের পরিমাণ নিসাব পরিমাণে পৌঁছবে তখনি ঐ দিন পর্যন্ত মোট উত্তোলিত ফসলের যাকাত পরিশোধ করবেন এবং তৎপরবর্তী প্রতি উত্তোলনের সাথে সাথে যাকাত পরিশোধ করবেন। জ্বালানি কাঠ, আসবাবপত্র ও গৃহনির্মাণে ব্যবহার উপযোগী বৃক্ষের ক্ষেত্রে, এরূপ বৃক্ষ যখন কাটা হবে তখন এগুলোর উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে, তা যত দীর্ঘ সময় পর কাটা হউক না কেন।

প্রশ্ন ৯৬. শস্য ও ফলের যাকাতের (উশর) হিসাব কিভাবে হয়?

যে জমিতে সেচ প্রয়োজন হয় না, প্রাকৃতিক ভাবে সিক্ত হয়, তার ফসলের যাকাত হবে দশ ভাগের একভাগ (১০%) আর যে জমিতে সেচের প্রয়োজন হয়, তার ফসলের যাকাত হবে বিশ ভাগের একভাগ (৫%)। ফসল উৎপাদনের ব্যয় যেমন- চাষ, সার, কীটনাশক, বপন ও কর্তণ ইত্যাদি খরচ উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ থেকে বাদ যাবে, তবে এ সব খরচ মোট

উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশের বেশী বাদ যাবে না। ফসলের নিসাবের পরিমাণ ৫ ওয়াস্ক বা ৬৫৩ কিলোগ্রাম। অনেক কৃষি ফসল আছে যা মাপা বা ওজন করা হয় না। যেমন বিভিন্ন ধরনের ফল, ফসল, শাকশব্জি, ফুল, অর্কিড, চারা, বৃক্ষ ইত্যাদি। এগুলোর নিসাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেশের সাধারণ ফসল চাল বা গমের ৬৫৩ কেজির মূল্য (স্থানীয় বাজারে গড় মূল্য) নিসাব হিসাবে গণ্য করা যাবে।

প্রশ্ন ৯৭. আমাদের দেশে উশর একটি অবহেলিত ফরয ইবাদত? অনেকেরই গ্রামে ফসলের জমি আছে এবং সেখানে ফসল উৎপাদিত হয় কিন্তু অবহেলা করে বেশীরভাগ লোকেরাই উশর আদায় করেন না। এর সমাধান কি?

এই প্রশ্নটি বাস্তব ভিত্তিক। অনেকেই তার স্বর্ণ-অলংকার, টাকা-পয়সা ও অন্যান্য সম্পদের যাকাত হয়তো ঠিক মতোই আদায় করেন কিন্তু উশরের কথা চিন্তা করেন না। অনেক ধনী ধার্মিক ব্যক্তিও এই ভুলটা করে থাকেন। গ্রামের প্রায় প্রতিটি মাতব্বর, চেয়ারম্যান, মেম্বার যাদের শতশত একর জমি-জমা আছে এবং তা থেকে ফসল পান কিন্তু উশর আদায় করেন না। এর মূল কারণ উশর সম্পর্কে প্রচারের অভাব। আমাদের দেশের আলেমরা তাদের ওয়াজে বা জুম্মার খুৎবায় এই বিষয়ে সবাইকে সচেতন করেন না এবং দেশবাসীও এই বিষয়ে জানেনও না এবং তা পালনও করেন না।

প্রশ্ন ৯৮. পশুর যাকাত আদায়ের নিয়ম কি?

উটের সর্বনিম্ন নিসাব পাঁচটি, গরু-মহিষের ত্রিশটি এবং ছাগল-ভেড়ার চল্লিশটি। তবে এ ধরণের পশু বৎসরের অর্ধেকের বেশী সময় মুক্তভাবে চারণভূমিতে খাদ্য গ্রহণ করলেই এসব পশুর উপর সংখ্যা ভিত্তিক যাকাত ধার্য হবে। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে যে কোন পশুসম্পদ প্রতিপালন করা হলে সেগুলোকে ব্যবসায়িক পণ্য বলে গণ্য করা হবে এবং এদের উপর যাকাত সংখ্যার ভিত্তিতে নয়, মূল্যের ভিত্তিতে ধার্য হবে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে খামারে পালিত মৎস্য, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদি এবং খামারে উৎপাদিত দুধ, ডিম, ফুটানো বাচ্চা, মাছের রেণু, পোনা ইত্যাদি ব্যবসার সম্পদ হিসাবে যাকাত প্রদান করতে হবে। নাবী মুহাম্মাদ ﷺ পানিতে বাস করা অবস্থায় মাছ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। মাছ যখন বিক্রির জন্য ধরা হবে তখনই এর যাকাত পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন ৯৯. যাকাত পরিশোধ না করার পরিণাম কি?

আল্লাহ বলেন, “আর যারা সোনা ও রুপা জমা করে রাখে এবং তা হতে আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। সেদিন বলা হবে, এই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করতে। সূতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তা আস্বাদন কর” (সুরা তাওবা ঃ ৩৪-৩৫)। রসূল ﷺ বলেন, “কোন ব্যক্তি যদি তার ধনসম্পদের যাকাত না দেয় তবে ঐ সম্পদ কিয়ামতের দিন অজগর সাপের আকার ধারণ করে তার গলায় পেঁচিয়ে থাকবে”। রসূল ﷺ তারপর তিলাওয়াত করলেন, “আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তা হতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল, এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলায় বেড়ি হবে”। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৮০), নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ। রসূল ﷺ বলেছেন, “সুদখোর, সুদদাতা, উহার সাক্ষী ও লেখক, উল্কি অংকনকারিণী এবং যে নারী উল্কি অংকন করায়, অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তি যে যাকাত দিতে অস্বীকার করে, হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করানো হয়, এদের সকলের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ বা লা'নত ”। (আহমাদ ও নাসায়ী)

প্রশ্ন ১০০. সামাজিক কল্যাণে যাকাত কিভাবে অবদান রাখে?

ইসলামের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে যাকাত অর্থনৈতিক স্তম্ভ। ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা সমাজের দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্ট দূর করা ও মানবতার কল্যাণ সাধন করা। ধনীদের সম্পদে গরীব ও বঞ্চিতের হক রয়েছে। সঠিক হিসাব করে নিয়মিত যাকাত প্রদান করার ফলে ধনীর সম্পদের উপর গরীবের হক পরিশোধ হয়। ফলে সম্পদ পরিশুদ্ধ ও হিফাযত হয়, যাকাতদাতার মনকে লোভ থেকে পবিত্র করে এবং দান ও ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্থ হতে সাহায্য করে। যাকাত প্রদানকারীর জন্য রয়েছে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে অগণিত পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ। যাকাতের উপকারভোগী সমাজের দূঃখী-দরিদ্র জনগোষ্ঠি। যাকাতের অর্থে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠির অভাব পূরণে সহায়তা করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পায় এবং সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির গুণাবলী বৃদ্ধি পায়।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে

রমাদান ও সিয়ামের

১০০ প্রশ্ন ও উত্তর

তাহক্বীক (Verification)

শাইখ মু. বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহ.)
- সদস্য, সউদী ওলামা পরিষদ
শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী
- আল-মাজমাআহ, সউদী আরব

প্রশ্ন ১. সিয়াম ও সাওমের মধ্যে পার্থক্য কী?

সিয়াম এবং সাওম এই দু'টি শব্দকে অনেকে একই মনে করে থাকেন কিন্তু কুরআনের তাফসীরকারকগণ এই দু'টি শব্দকে আলাদাভাবে দেখিয়েছেন। সিয়াম হচ্ছে বিরত থাকা ঐ সমস্ত বাহ্যিক জিনিস থেকে যেমন ঃ খাবার, পানি, সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ইত্যাদি। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৩-১৮৫) আর সাওম হচ্ছে ঐ সকল গুনবাচক খারাপ কাজ যা থেকে বিরত থাকা যেমন ঃ গীবত, অশ্লিল কথা ইত্যাদি। (সূরা মারইয়াম ঃ ২৬, সূরা আহযাব ঃ ৩৫)

আমরা যদি সহীহ বুখারীর হাদীস নং ৬০৫৭ দেখি তাহলে সেখানে দেখতে পাই যে, যে গুণবাচক কাজগুলো হতে বিরত হতে পারলো না তার শারীরিক অভুক্ত থাকার কোন প্রয়োজন নেই। তাহলে আমরা বলতে পারি সিয়ামের জন্য সাওমের প্রয়োজন।

প্রশ্ন ২. রমজান, রোজা ও রমাদানের মধ্যে পার্থক্য কী?

আরবী ১২টি মাসের মধ্যে রমাদান একটি মাসের নাম। এটি আরবী শব্দ এবং এর সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে রমাদান। রমজান উচ্চারণটি সঠিক নয়। সিয়াম বা সাওম আরবী শব্দ এবং এর ফার্সি শব্দ হচ্ছে রোজা। আল-কুরআনে সিয়াম ও সাওম বলতে যে অর্থ বুঝিয়েছে রোজা বললে তা সঠিকভাবে প্রকাশ পায় না। তাই আমাদের উচিত সঠিক শব্দটিই ব্যবহার করা। "খোশ আমদেদ মাহে রমজান" আমাদের দেশে খুব প্রচলিত কিন্তু এর অর্থ হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। 'খোশ আমদেদ' ফার্সি শব্দ এর অর্থ ওয়েলকাম বা স্বাগতম এবং 'মাহে' ফার্সি শব্দ এর অর্থ মাস। "খোশ আমদেদ মাহে রমজান" মানে 'স্বাগতম রমাদান মাস'।

প্রশ্ন ৩. সিয়ামের উদ্দেশ্য ও আদব কী কী?

সিয়ামের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহভীতি অর্জন করা তথা আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন ও নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা। কেননা আল্লাহ বলেন ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৩)

- রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "(সিয়ামরত অবস্থায়) যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যার ব্যবসা ও অসৎকর্ম করা থেকে বিরত না হয়, সেই

ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার কোন গুরুত্বই আল্লাহর কাছে নেই। (অর্থাৎ আল্লাহ সেই ধরনের সিয়াম কবুল করবেন না।)" (সহীহ বুখারী)

- সিয়ামের আদব হচ্ছে, বেশী বেশী দান-খয়রাত করা, নেককাজ ও জনকল্যাণমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা। রসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সর্বাধিক দানশীল ব্যক্তি। রমাদান মাসে যখন জিবরাঈল (আ.) তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিতেন তখন তিনি আরো বেশী দান করতেন। (সহীহ বুখারী)
- আরো আদব হচ্ছে, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে দূরে থাকা। যাবতীয় মিথ্যাচার, গালিগালাজ, ধোঁকা, বিশ্বাসভংগ করা, হারাম ও অশ্লীল বস্তু দেখা বা শোনা প্রভৃতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা প্রতিটি মানুষের উপর ওয়াজিব। বিশেষ করে সিয়ামপালনকারীর জন্য তো অবশ্যই।

প্রশ্ন ৪. রমাদান মাসকে ১০ দিন ১০ দিন করে তিন ভাগে ভাগ করা কি সহীহ হাদীস সম্মত?

রমাদান রহমত, মাগফিরাত ও নাযাতের মাস বলে ১০ দিন ১০ দিন করে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এই হাদীসটি সহীহ নয়। এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে রমাদানের প্রথম ১০ দিনই শুধু রহমত বাকী ২০ দিনে আর কোন রহমত নেই বা এই মাসের মধ্যে শুধু ১০ দিনই মাগফিরাত আর বাকী ২০ দিনে কোন মাগফিরাত নেই, আসলে এই ধরণের কথা মোটেও ঠিক নয়। পুরো রমাদান মাসই অর্থাৎ ৩০ দিনই রহমত, মাগফিরাত, নাযাত এবং আল্লাহর আরো সব নিয়ামতের মাস। কোন অসুস্থ ব্যক্তি যদি তার অসুস্থতার কারণে প্রথম ১০ দিন সিয়াম পালন করতে না পারেন তাহলে কি সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে? অবশ্যই না। কেউ যদি সফরের জন্য শেষ ১০ দিন সিয়াম পালন করতে না পারেন তাহলে কি সে নাযাত থেকে বঞ্চিত হবেন? অবশ্যই না।

প্রশ্ন ৫. রমাদান মাসে সাহুর (সেহরী) খাওয়ার গুরুত্ব কী?

সেহরী হাদীসের শব্দ নয়, এটি আমাদের দেশের প্রচলিত শব্দ। প্রকৃত হাদীসের শব্দটি হচ্ছে সাহুর। রসূল ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাহুর খাও, কারণ সাহুরে বরকত আছে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) সাহুরে

বরকত থাকার মানে হল, সাহুর সিয়ামপালনকারীকে সবল রাখে এবং সিয়ামের কষ্ট তার জন্য হাল্কা করে।

রসূলুল্লাহ ﷺ এই সাহুর-এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে মুসলিম ও আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের) সিয়ামের মাঝে পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের সিয়াম ও আহলে কিতাবের সিয়ামের মাঝে পার্থক্য হল সাহুর খাওয়া।" (সহীহ মুসলিম)

প্রশ্ন ৬. কী খেলে সাহুর (সেহরী) খাওয়া হবে?

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "সাহুর খাওয়াতে বরকত আসে। সুতরাং তোমরা তা খেতে ছেড়ো না যদিও তাতে তোমরা এক ঢোক পানিও খাও। কেননা, যারা সাহুর খায় তাদের জন্য আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতারা দু'আ করতে থাকেন।" (আহমাদ)

আবূ হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুমিনের শ্রেষ্ঠ সাহুর হল খেজুর।" (আবু দাউদ)

প্রশ্ন ৭. ফজর হওয়ার ৫-১০ মিনিট আগে সাহুর খাওয়া বন্ধ করা কি বিদ'আত?

ফজর শুরু হওয়ার ৫-১০ মিনিট আগে সতর্কতামূলকভাবে পানাহার থেকে বিরত হওয়া একটি বিদ'আত। কোন কোন পঞ্জিকায় একটি ঘর সাহুর-এর শেষ সময় এবং পৃথক আর একটি ঘর ফজরের আযানের থাকে। এই ধরণের কাজ আসলে শরীয়ত-বিরোধী। কারণ, সাহুর-এর শেষ সময় যেটা, সেটাই ফজরের আযানের সময়। আর ফজরের আযানের সময়ের আগে লোকেদের পানাহার বন্ধ করা অবশ্যই শরীয়ত-বিরোধী কাজ।

প্রশ্ন ৮. সাহুরে লোক জাগানোর জন্য নতুন নতুন নিয়ম কি বিদ'আত?

ফজরের আগে একটি আযান আছে, যা তাহাজ্জুদ ও সাহুর-এর সময় জানাবার জন্য ব্যবহার করা হত রসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে। অতএব সাহুর-এর সময় লোকেদেরকে জাগানোর জন্য সেই আযানের বদলে কুরআন বা গজল পড়া, ঘন্টা বাজানো, অথবা ঢোল বাজানো বিদ'আত।

প্রশ্ন ৯. তাড়াতাড়ি ইফতার করার নির্দেশ কী?

রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সত্বর ইফতার করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে, তাতে আমাদের মঙ্গল আছে। তিনি বলেছেন, "লোকেরা ততক্ষণ মঙ্গলে থাকবে যতক্ষণ তারা (সূর্য ডোবার পর সলাতের আগে) ইফতার করতে তাড়াতাড়ি করবে।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

যেহেতু ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা সিয়াম রেখে দেরী করে ইফতার করে, তাই তিনি আমাদেরকে তাদের বিপরীত আচরণ করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "দ্বীন ততকাল বিজয়ী থাকবে যতকাল লোকেরা ইফতার করতে তাড়াতাড়ি করবে। কারণ, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা দেরী করে ইফতার করে।" (আবু দাউদ)

সতর্কতা-১ ঃ আমাদের সমাজে দেখা যায় যে মহিলারা ইফতার তৈরী ও পরিবেশন করতে গিয়ে নিজেরাই দেরীতে ইফতার করেন আর এতে রসূল ﷺ -এর আদেশকে অমান্য করা হয় ও সুন্নাহ পালন করা হয় না।

প্রশ্ন ১০. রমাদান মাসে মহিলা পরপুরুষের সাথে ফ্রী মিক্সিং করে ইফতার পার্টি কতটুকু ইসলাম সম্মত?

আরো একটি বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। আর তা হলো, সূরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে রমাদান মাস হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) অর্জনের মাস অর্থাৎ সমস্ত গুনাহ থেকে দূরে থেকে মুত্তাকী হওয়ার মাস। রমাদান মাসে অনেকের বাসায় ও বিভিন্ন জায়গায় ইফতার পার্টি থাকে। অনেক পার্টিতেই দেখা যায় মহিলারা পরপুরুষের সাথে ফ্রী মিক্সিং করে (হারাম কাজ করে) তাদের সারা দিনের অর্জন করা তাকওয়া সব শেষ করে দেয়। এছাড়াও মহিলারা সারাদিন বেপর্দায় শপিং করেও তাকওয়া অর্জন নষ্ট করে দেয়।

প্রশ্ন ১১. আল্লাহ কি সিয়াম দিয়েছেন গরীবের দুঃখ উপলব্ধি করা বা ক্ষুধার কষ্ট বুঝার জন্য?

আমাদের সমাজে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, গরীবের দুঃখ উপলব্ধি করা বা ক্ষুধার কষ্ট বুঝার জন্য আল্লাহ সিয়ামের বিধান দিয়েছেন! এটি ভুল কথা, এর কোন দলিল নেই। রমাদান মাসে যতো ইচ্ছে খাওয়া যাবে কিন্তু অপচয় করা যাবে না। আল্লাহ বলেন "তোমরা খাও এবং পান

কর, অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।” (সূরা আ’রাফ ঃ ৩১) তাই অপচয় থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

প্রশ্ন ১২. কী দিয়ে ইফতার করা সুন্নাহ?

আনাস (রা.) বলেছেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ [মাগরিবের] সলাত আদায়ের পূর্বে কিছু আধা-পাকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তা না পেলে পূর্ণ পাকা (শুকনা) খেজুর দিয়ে কিন্তু তাও না পেলে কয়েক ঢোক পানি খেয়ে নিতেন।” (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

ইফতার করার সময় খাওয়ার মত কোন জিনিস না পাওয়া গেলে মনে মনে ইফতারের নিয়ত করাই যথেষ্ট।

প্রশ্ন ১৩. ইফতার ও সাহুর-এর কোন নির্দিষ্ট নিয়্যত আছে কি?

ইফতারের এবং সাহুর-এর “নাওয়াইতুয়ান....” ইত্যাদি বলে মুখে উচ্চারণ করে কোন নিয়্যত নেই। আমাদের দেশে ইফতারের এবং সাহুর-এর যে নিয়্যত প্রচলিত আছে তা সহীহ হাদীসভিত্তিক নয়। এই ধরণের নিয়্যত বিদ’আত। তবে সিয়ামের জন্য রমাদানের শুরুতে অথবা প্রতি ফজরের আগে মনে মনে ইচ্ছা বা সংকল্প অবশ্যই থাকতে হবে।

যে ব্যক্তি ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগেই সিয়াম পালনের নিয়্যত করল না তার সিয়াম শুদ্ধ হল না। (আবূ দাঊদ ঃ ২৪৫৪)

প্রশ্ন ১৪. সাহুর ও ইফতারের সময় কী বলব?

পানাহারের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা। কারণ, রসূলুল্লাহ ﷺ তা বলতে আদেশ করেছেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

খাওয়ার শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে ভুলে গেলে এবং খেতে খেতে মনে পড়লে বলতে হয়, বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহু ওয়া আ-খিরাহ। (অর্থ ঃ শুরুতে ও শেষে আল্লাহর নাম নিয়ে খাচ্ছি।) (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন ১৫. সিয়াম অবস্থায় কখন দু’আ করতে হবে?

সিয়ামপালনকারীর উচিত, ইফতার করার আগে পর্যন্ত সিয়াম থাকা অবস্থায় সারাদিন বেশী বেশী করে দু’আ করা। কারণ, সিয়াম থাকা অবস্থায়

সিয়ামপালনকারীর দু'আ আল্লাহর নিকট কবুল হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তির দু'আ অগ্রাহ্য করা হয় না (বরং কবুল করা হয়); পিতার দু'আ, সিয়ামপালনকারী দু'আ এবং মুসাফিরের দু'আ।" (বাইহাকী)

খাওয়া শেষ হলে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলতে হয়। যেহেতু কিছু খাওয়া অথবা পান করার পর বান্দা আল্লাহর প্রশংসা করুক এটা তিনি (আল্লাহ) পছন্দ করেন। (সহীহ মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী)

প্রশ্ন ১৬. ইফতার করার পর কোন দু'আ পড়তে হবে?

ইবনে উমার (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ ইফতার করার পর এই দু'আ বলতেন,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَ ثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

যাহাবায যমা-উ ওয়াবতাল্লাতিল উরুকু ওয়াছাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ।

অর্থ ঃ পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা-উপশিরা সতেজ হল এবং ইনশাআল্লাহ সওয়াব সাব্যস্ত হল। (আবু দাউদ)

ইফতারের সময় এই দু'আ-ই সবচেয়ে সহীহরূপে রসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া ইফতারের অন্যান্য (আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ইত্যাদি) দু'আ বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন ১৭. ইফতারের ঠিক আগ মুহূর্তে দু'আ কবুল হওয়ার কথা কি বিশুদ্ধ?

আমাদের দেশে দেখা যায় যে রমাদান মাসে ইফতারের ঠিক আগ মুহূর্তে মুসল্লিরা বা সিয়াম পালনকারীরা ইফতার সামনে নিয়ে দুই হাত তুলে দু'আ করতে থাকেন। এখন প্রশ্ন এই দৃশ্য কেন আমাদের দেশে দেখা যায়? সিয়াম পালনকারীর দু'আ কবুলের বিষয়ে দু'টি হাদীস রয়েছে, ১) সিয়াম পালনকারীর দু'আ কবুল হয়। ২) ইফতারের আগে দু'আ কবুল হয়। প্রথম হদীসটি সহীহ কিন্তু দ্বিতীয় হাদীসটি সহীহ নয়। কিন্তু আমাদের দেশে দ্বিতীয় হাদীসটি বেশী প্রচলিত। আসলে প্রথম হাদীসটির গভীরে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাই যে সেহরী খাওয়ার পর সিয়ামের শুরু থেকে ইফতার করা পর্যন্ত সারাদিনই সিয়াম পালনকারীর দু'আ কবুল হয়।

প্রথম হাদীসকে লক্ষ্য করে যদি কেউ ইফতারের আগে দু'আ করেন তাহলে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু কেউ যদি প্রথম হাদীসকে বাদ দিয়ে শুধু দ্বিতীয় হাদীসকে লক্ষ্য করে দু'আ করেন তাহলেই আপত্তি, কারণ এতে সিয়াম পালনকারীকে সারা দিন দু'আ করা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বা সারা দিন দু'আ করার বিষয়ে উৎসাহিত করা হচ্ছে না। তাই আমাদের সারাদিনই পাপমুক্ত থেকে দু'আ করা উচিত, শুধু নির্দিষ্ট করে ইফতারের আগে নয়। পক্ষান্তরে ইফতারের ঠিক আগ মুহূর্তে দু'আ কবুল হওয়ার কথা বিশুদ্ধ হাদীসী বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ ব্যাপারে যা কিছু বর্ণনা করা হয়, তা যঈফ। অনুরূপ ইফতারের সময় একাকী বা জামাআতের সাথে হাত তুলে দু'আও বৈধ নয়। কারণ, সুন্নাহ [রসূলুল্লাহ (ﷺ) বা তাঁর সাহাবাগণের নিয়মে] এ আমলে এরকম বর্ণনা মিলে না।

কিছু কাজ আছে যা সিয়াম অবস্থায় বৈধ নয় বলে অনেকের মনে হতে পারে, অথচ তা সিয়ামপালনকারীর জন্য করা বৈধ। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই পরিষ্কার জ্ঞান নেই। তাই বিষয়গুলো শরীয়া মতে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো। যেমন-

প্রশ্ন ১৮. সিয়াম অবস্থায় পানিতে নামা, ডুব দেয়া ও সাঁতার কাটা যাবে কি?

সিয়ামপালনকারীর জন্য পানিতে নামা, ডুব দেয়া ও সাঁতার কাটা, একাধিকবার গোসল করা, এসির (A/C) হাওয়াতে বসা এবং কাপড় ভিজিয়ে গায়ে-মাথায় জড়ানো বৈধ। যেমন পিপাসা ও গরমের তাড়নায় মাথায় পানি ঢালা, বরফ বা আইস (ice) চাপানো দূষণীয় নয়।

আবু বাকর বিন আব্দুর রহমান রসূলুল্লাহ ﷺ -এর কিছু সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সাহাবী) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ -কে দেখেছি, তিনি সিয়াম রেখে পিপাসা অথবা গরমের কারণে নিজ মাথায় পানি ঢেলেছেন। (আহমাদ, আবু দাউদ, মালেক, মুআত্তা)

প্রশ্ন ১৯. সিয়াম অবস্থায় মিসওয়াক করা যাবে কি?

মিসওয়াক করা শুধুমাত্র সিয়াম পালনকারীর জন্যেই নয়, বরং সকলের জন্য এবং দিনের শুরু ও শেষ ভাগে সব সময়ের জন্যে সুন্নাহ। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ ব্যাপক; তিনি বলেন, "মিসওয়াক করায় রয়েছে

মুখের পবিত্রতা এবং প্রতিপালক আল্লাহর সন্তুষ্টি।" (আহমাদ, নাসাঈ, বাইহাকী)

দাঁতের মাড়িতে ক্ষত থাকার ফলে অথবা দাঁতন করতে গিয়ে রক্ত বের হলে তা গিলে ফেলা বৈধ নয় বরং তা বের করে ফেলা জরুরী। অবশ্য যদি তা নিজের ইচ্ছা ছাড়াই গলার নীচে নেমে যায়, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন ২০. সিয়াম অবস্থায় সুরমা লাগানো এবং চোখে ও কানে ওষুধ ব্যবহার করা যাবে কি?

সিয়াম অবস্থায় সুরমা লাগানো এবং চোখে ও কানে ওষুধ ব্যবহার বৈধ। কিন্তু ব্যবহার করার পর যদি গলায় সুরমা বা ওষুধের স্বাদ অনুভূত হয়, তাহলে (কিছু সংখ্যক উলামার মতে) সিয়াম ভেঙ্গে যাবে এবং সে সিয়াম কাযা করে নেয়াটাই উত্তম কাজ।

আনাস (রা.) সিয়াম থাকা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন। (আবু দাউদ)

নাকে ওষুধ ব্যবহার করার পর যদি গলাতে তার স্বাদ অনুভূত হয়, তাহলে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে সিয়ামের কাযা করতে হবে।

প্রশ্ন ২১. সিয়াম অবস্থায় মলদ্বারে ওষুধ ব্যবহার করা যাবে কি?

সিয়ামপালনকারীর জ্বর হলে তার জন্য মলদ্বারে ওষুধ (সাপোজিটরি) দেয়া যায়। তদনুরূপ জ্বর মাপা বা অন্য কোন পরীক্ষার জন্য মলদ্বারে কোন যন্ত্র ব্যবহার করা সিয়ামের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। কারণ এ কাজকে খাওয়া বা পান করা কিছুই বলা যায় না। (এবং মলদ্বার পানাহারের পথও নয়।)

প্রশ্ন ২২. সিয়াম অবস্থায় পেটে (এন্ডোসকপি মেশিন) নল সঞ্চালন করা যাবে কি?

পেটের ভিতর কোন পরীক্ষার জন্য (এন্ডোসকপি মেশিন) নল বা স্টমাক টিউব সঞ্চালন করার ফলে সিয়ামের কোন ক্ষতি হয় না। তবে হ্যাঁ, যদি পাইপের সাথে কোন (তৈলাক্ত) পদার্থ থাকে এবং তা তার সাথে পেটে গিয়ে পৌছে, তাহলে তাতে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এ কাজ ফরয বা ওয়াজিব সিয়ামে করা বৈধ নয়।

প্রশ্ন ২৩. সিয়াম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর আপোষের চুম্বন করা যাবে কি?

যে সিয়ামপালনকারী স্বামী-স্ত্রী মিলনে ধৈর্য রাখতে পারে; অর্থাৎ সঙ্গম বা বীর্যপাত ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা না করে, তাদের জন্য আপোসে চুম্বন বা কোলাকুলি করা বৈধ এবং তা তাদের জন্য মাকরূহ নয়। কারণ, রসূলুল্লাহ ﷺ সিয়াম রাখা অবস্থায় স্ত্রী-চুম্বন করতেন। আর তিনি ছিলেন যৌন ব্যাপারে বড় সংযমী। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী) অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ স্ত্রী-চুম্বন করতেন রমাদানে সিয়াম রাখা অবস্থায়; (সহীহ মুসলিম) রমাদান মাসে। (আবু দাউদ)

প্রশ্ন ২৪. সিয়াম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী একে অপরের দেহাঙ্গ দেখা কি বৈধ?

স্ত্রীর দেহাঙ্গের যে কোন অংশ দেখা সিয়ামপালনকারীর স্বামীর জন্যও বৈধ। অবশ্য একবার দেখার ফলেই চরম উত্তেজিত হয়ে কারো মযী বা বীর্যপাত ঘটলে কোন ক্ষতি হবে না। (সহীহ বুখারী)

প্রশ্ন ২৫. সিয়াম অবস্থায় নাক অথবা কোন কাটা-ফাটা থেকে রক্ত বের হওয়া যাবে কি?

দেহের কোন কাটা-ফাটা অঙ্গ থেকে রক্ত পড়লে সিয়াম নষ্ট হয় না। বরং তা দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করার মতই। অনুরূপ নাক থেকে রক্ত পড়লেও সিয়াম নষ্ট হয় না কারণ তাতে মানুষের কোন ইচ্ছা থাকে না। আর ইচ্ছা করে বের করলে তাও দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করার মত। তদনুরূপভাবে মাথায় বা দেহের অন্য কোন জায়গায় পাথর বা অন্য কিছুর আঘাত লেগে রক্ত ঝরলে সিয়াম নষ্ট হয় না।

প্রশ্ন ২৬. সিয়াম অবস্থায় রক্তদান করা যাবে কি?

পরীক্ষার জন্য কিছু রক্ত দেয়া সিয়ামপালনকারীর জন্য বৈধ। এতে তার সিয়ামের কোন ক্ষতি হয় না। তদনুরূপ কোন রোগীর প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে রক্তদান করাও বৈধ এবং তা দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করার মতই। এতেও সিয়ামের কোন ক্ষতি হয় না।

প্রশ্ন ২৭. সিয়াম অবস্থায় দাঁত তোলা যাবে কি?

সিয়ামপালনকারীর জন্য দাঁত (স্টোন ইত্যাদি থেকে) পরিষ্কার করা, ডাক্তারী ভরণ (inlay) ব্যবহার করা এবং যন্ত্রণায় দাঁত তুলে ফেলা বৈধ।

তবে এ সব ক্ষেত্রে তাকে একান্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত যাতে কোন প্রকার ওষুধ বা রক্ত গিলে ফেলা না হয় ।

প্রশ্ন ২৮. সিয়াম অবস্থায় কিডনী (মূত্রগ্রন্থি) অচল অবস্থায় দেহের রক্ত শোধন করা যাবে কি?

সিয়ামপালনকারীর কিডনী (kidney) অচল হলে সিয়াম অবস্থায় প্রয়োজনে দেহের রক্ত পরিষ্কার ও শোধন (Dialysis) করা বৈধ। পরিশুদ্ধ করার পর পুনরায় দেহে ফিরিয়ে দিতে যদিও রক্ত দেহ থেকে বের হয়, তবুও তাতে সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন ২৯. সিয়াম অবস্থায় খাদ্য বা পানীয় নয় এমন ওষুধ (ইঞ্জেকশন) ব্যবহার করা যাবে কি?

সিয়ামপালনকারীর জন্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেই ইঞ্জেকশন ব্যবহার করা বৈধ যা পানাহারের কাজ করে না। যেমন, পেনিসিলিন বা ইনসুলিন ইঞ্জেকশন অথবা অ্যান্টিবায়োটিক বা টনিক কিংবা ভিটামিন ইঞ্জেকশন অথবা ভ্যাক্সিন ইঞ্জেকশন প্রভৃতি হাতে, কোমরে বা অন্য জায়গায়, দেহের পেশী অথবা শিরায় ব্যবহার করলে সিয়ামের ক্ষতি হয় না। তবুও নিতান্ত জরুরী না হলে তা দিনে ব্যবহার না করে রাত্রে ব্যবহার করাই উত্তম। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে বিষয়ে সন্দেহ আছে সে বিষয় বর্জন করে তাই কর যাতে সন্দেহ নেই।" (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

প্রশ্ন ৩০. সিয়াম অবস্থায় ক্ষতস্থানে ওষুধ ব্যবহার করা যাবে কি?

সিয়ামপালনকারীর জন্য নিজ দেহের ক্ষতস্থানে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি করা দূষণীয় নয় হোক সে ক্ষত গভীর অথবা অগভীর। কারণ, এ কাজকে কিছু খাওয়াও বলা যায় না, অথবা পান করাও বলা যায় না। তা ছাড়া ক্ষতস্থান স্বাভাবিক পানাহারের পথ নয়।

প্রশ্ন ৩১. সিয়াম অবস্থায় মাথা ইত্যাদি নেড়া করা যাবে কি?

সিয়ামপালনকারীর জন্য নিজের মাথার চুল বা নাভির নিচের লোম ইত্যাদি পরিষ্কার করা বৈধ। তাতে কোন স্থান কেটে রক্ত পড়লেও সিয়ামের কোন ক্ষতি হয় না।

প্রশ্ন ৩২. সিয়াম অবস্থায় কুলি করা ও নাকে পানি নেয়া যাবে কি?

সিয়ামপালনকারীর ঠোঁট শুকিয়ে গেলে পানি দ্বারা ভিজিয়ে নেয়া এবং মুখ বা জিভ শুকিয়ে গেলে কুলি করা বৈধ। অবশ্য গড়গড়া করা বৈধ নয়। অতি প্রয়োজনে গড়গড়ার ওষুধ ব্যবহার করা বৈধ। তবে শর্ত হল যে পানি বা ওষুধ যেন গলার নিচে নেমে না যায়। (নচেৎ তাতে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে।) তাই সতর্কতামূলকভাবে তা দিনে ব্যবহার না করে রাতে করা উচিৎ।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "(ওযূ করার সময়) তোমরা নাকে খুব পানি টেনে নিও কিন্তু তোমরা সিয়াম অবস্থায় থাকলে নয়।" (আহমাদ, আবু দাউদ)

প্রশ্ন ৩৩. সিয়াম অবস্থায় সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়া যাবে কি?

সিয়াম রাখা অবস্থায় আতর বা অন্য প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং সর্বপ্রকার সুঘ্রাণ নাকে নেয়া সিয়ামপালনকারীর জন্য বৈধ। তবে ধুঁয়া জাতীয় সুগন্ধি যেমন আগরবাতি প্রভৃতি ইচ্ছাকৃতভাবে নাকে নেয়া বৈধ নয়। কারণ এই শ্রেণীর সুগন্ধির ঘনত্ব আছে যা পাকস্থলিতে গিয়ে পৌঁছে। রান্নার যে ধোঁয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাকে প্রবেশ করে তাতে সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না কারণ তা থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।

প্রশ্ন ৩৪. সিয়াম অবস্থায় নাকে বা মুখে স্প্রে (Spray/Inhelar/ Puffer) ব্যবহার করা যাবে কি?

স্প্রে দুই প্রকার ঃ ১ম প্রকার হল পাউডার জাতীয় যা স্প্রে করা হয় এবং ধূলোর মত উড়ে গিয়ে গলায় পৌঁছলে রোগী তা গিলতে থাকে। এই প্রকার স্প্রেতে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে রোগীর যদি বছরের সব মাসে এবং দিনেও ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে তাকে এমন রোগী গণ্য করা হবে, যার রোগ সারার কোন আশা নেই। সুতরাং সে সিয়াম না রেখে প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একটি করে মিসকীনকে খাইয়ে দেবে।

২য় প্রকার স্প্রে হল বাষ্প জাতীয়। এই প্রকার স্প্রেতে সিয়াম ভাঙ্গবে না। কেননা তা পাকস্থলীতে পৌঁছে না। কারণ তা এক প্রকার কমপ্রেসড গ্যাস যাতে প্রেসার পড়লে উড়ে গিয়ে ফুসফুসে পৌঁছে এবং শ্বাসকষ্ট দূর করে। এমন গ্যাস কোন প্রকার খাদ্য নয়।

প্রশ্ন ৩৫. সিয়াম অবস্থায় কোন মহিলা যদি বেপর্দায় বাইরে চলাফেরা করে তাহলে কি তার সিয়াম পালন হবে?

এই ক্ষেত্রে তার সিয়াম হবে কিন্তু সাওম হবে না। তার সিয়াম কোয়ালিটি সম্পন্ন হবে না, শুধু উপস থাকা হবে।

প্রশ্ন ৩৬. কেউ সিয়াম পালন করল কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করল না তার সিয়াম কি হবে?

সিয়াম হচ্ছে মুসলিমদের জন্য। ইসলামের নিয়মানুযায়ী কেউ দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের মধ্যে এক ওয়াক্ত সলাতও ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে সে আর মুসলিম থাকে না। তাই তার এই সিয়ামে কোন কাজ হবে কিনা তা আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন ৩৭. সেহরীর সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর ১০ মিনিট পরে মনে পড়লো যে ঔষুধ খাওয়া হয়নি অতপর ঔষুধ খেলে কি ঐ দিনের সিয়াম পালন হবে?

না। সেহরীর সময় শেষ হয়ে যাওয়ার ১০ মিনিট পরে ঔষুধ খেলে ঐ দিনের সিয়াম পালন হবে না। এই সিয়ামটি রমাদান মাসের পরে অবশ্যই কাযা করে নিতে হবে।

প্রশ্ন ৩৮. কী থেকে সিয়াম নষ্ট হয় না?

থুথু ঃ থুথু থেকে বাঁচা দুঃসাধ্য। কারণ তা মুখে বা গলার গোড়ায় জমা হয়ে নিচে এমনিতেই চলে যায়। অতএব এতে সিয়াম নষ্ট হবে না এবং বারবার থুথু ফেলারও দরকার হবে না।

অবশ্য যে কফ, শ্লেষ্মা বেশী মোটা এবং যা কখনো মানুষের বুক (শ্বাসযন্ত্র) থেকে, আবার কখনো মাথা (sinuses) থেকে বের হয়ে আসে, তা গলা ঝেড়ে বের করে বাইরে ফেলা ওয়াজিব এবং তা গিলে ফেলা বৈধ নয়। তবে যদি কেউ ফেলতে না পেরে গিলেই ফেলে, তাহলে তাতে সিয়াম নষ্ট হবে না।

রাস্তার ধূলা ঃ রাস্তার ধূলা সিয়ামপালনকারীর নিঃশ্বাসের সাথে পেটে গেলে সিয়ামের কোন ক্ষতি হয় না। কারণ এ সব থেকে বাঁচার উপায় নেই। অবশ্য মুখে মাস্ক ব্যবহার করে বা কাপড় বেঁধে কাজ করাই উত্তম।

প্রশ্ন ৩৯. সিয়াম অবস্থায় কী কী করা চলে?

এমন কিছু কাজ আছে যা আপাতদৃষ্টিতে সিয়ামপালনকারীর জন্য করা অবৈধ মনে হলেও আসলে তা বৈধ। সেরূপ কিছু কাজ নিম্নরূপ ঃ

সফর করা ঃ সিয়ামপালনকারীর জন্য এমন দেশে সফর করে সিয়াম রাখা বৈধ, যেখানের দিন ঠাণ্ডা ও ছোট।

সাহুরের শেষ সময় পর্যন্ত পানাহার করা ঃ সাহুর-এর শেষ সময় পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস করা সিয়ামপালনকারীর জন্য বৈধ। কিন্তু ফজর শুরু (সময় বা আযান) হওয়ার সাথে সাথে মুখের খাবার উগলে ফেলা ওয়াজিব। অনুরূপ সহবাস করতে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী পৃথক হয়ে যাওয়া জরুরী। পক্ষান্তরে সাহুর-এর সময় শেষ হয়ে গেছে বা ফজরের আযান শুরু হয়ে গেছে জেনেও যদি কেউ পানাহার বা স্ত্রী-সহবাসে মত্ত থাকে, তাহলে তার সিয়াম হবে না।

প্রশ্ন ৪০. ফজর শুরু হওয়ার পরেও কী নাপাক থাকা যায়?

স্ত্রী-সহবাস অথবা স্বপ্নদোষ হওয়ার পরেও সময়ের অভাবে গোসল না করে নাপাক অবস্থাতেই সিয়ামপালনকারী সিয়ামের নিয়ত করতে এবং সাহুর খেতে পারে। এমন কি সাহুরের সময় শেষ হয়ে গেলেও আযানের পর গোসল করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সিয়ামের শুরুর কিছু অংশ নাপাকে অতিবাহিত হলেও সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। অবশ্য সলাতের জন্য গোসল জরুরী।

মা আয়িশা ও উম্মে সালামাহ (রা.) বলেন, 'আল্লাহর রসূল (রা.)-এর (কখনো কখনো) স্ত্রী-মিলন করে অপবিত্র অবস্থায় ফজর হয়ে যেত। তারপর তিনি গোসল করতেন এবং সিয়াম রাখতেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

তদনুরূপ নিফাস ও ঋতুমতী মহিলার রাত্রে রক্ত বন্ধ হলে (সিয়ামের নিয়ত করে এবং সাহুর খেয়ে) ফজরের পর সিয়াম শুরু করে পরে গোসল করে সলাত আদায় করতে পারে। উপরোক্ত নাপাক পুরুষ ও মহিলার জন্য নাপাকীর গোসলকে সকাল বা দুপুরের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা বৈধ নয়। বরং সূর্য উদয়ের পূর্বেই গোসল করে যথাসময়ে সলাত আদায় করা তাদের জন্য ওয়াজিব।

জ্ঞাতব্য যে, রমাদানের দিনের বেলায় সিয়ামপালনকারীর স্বপ্নদোষ হয়ে গেলে তার সিয়াম বাতিল হয় না। কেননা, তা তার ইচ্ছার অধীন নয়। অতএব তার জন্য জরুরী হল, নাপাকীর গোসল করা। অবশ্য ফজরের সলাত আদায় করার পর ঘুমাতে গিয়ে স্বপ্নদোষ হলে, সঙ্গে সঙ্গে গোসল না করে যদি যোহরের আগে পর্যন্ত বিলম্ব করে গোসল করে, তাহলে তাতে দোষ হবে না। অবশ্য উত্তম হল, নাপাক না থেকে সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে গোসল করে বিভিন্নভাবে আল্লাহর যিকর করা।

প্রশ্ন ৪১. সিয়াম অবস্থায় কি দিনে ঘুমানো যায়?

সিয়ামপালনকারীর জন্য দিনে ঘুমানো বৈধ। কিন্তু সকল সলাত তার যথাসময়ে জামাআত সহকারে আদায় করতে অবহেলা প্রদর্শন করা বৈধ নয়। বরং উচিত হল, ঘুমিয়ে সময় নষ্ট না করে রমাদানের সেই মাহাত্ম্যপূর্ণ সময়কে নফল সলাত, যিকর-আযকার ও কুরআন কারীম তিলাওয়াত দ্বারা আমল করা। যাতে তার সিয়ামের ভিতরে নানা প্রকার ইবাদতের সমাবেশ ঘটে।

প্রশ্ন ৪২. সিয়াম অবস্থায় কি লবণ বা মিষ্টি চাখা যায়?

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'কোন খাদ্য, সির্কা এবং কোন কিছু কিনতে হলে তা চেখে দেখাতে কোন দোষ নেই।' (সহীহ বুখারী)

তবে এ কাজটি না করাই শ্রেয়। যদি খাবারে লবণ/মিষ্টি কমবেশী হলে পরিবারের কেউ অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে সেক্ষেত্রে চেখে দেখার বিষয়টি এসেছে। এছাড়া বিভিন্ন খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করতে গিয়ে বারবার কুলি করতে হবে এবং অসতর্কতার জন্য সিয়াম ভেঙ্গে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ কাজটি থেকে দূরে থাকাই উত্তম।

প্রশ্ন ৪৩. সিয়ামপালনকারীর জন্য কী কী করা অপছন্দনীয়?

উলামাগণ কিছু এমন বৈধ কর্ম করাকে সিয়ামপালনকারীর জন্য অপছন্দনীয় মনে করেন যা করার ফলে তার সিয়াম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর তা নিম্নরূপ ঃ

- মুখে থুথু জমা করে গিলে ফেলা।
- শ্লেষ্মা গিলে ফেলা।

- গাম (Gum) জাতীয় কিছু চিবানো।
- দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাবার পরিষ্কার না করা।
- অপ্রয়োজনে খাবার চেখে দেখা। কারণ তা গলার নিচে নেমে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।
- এমন জিনিস নাকে নিয়ে ঘ্রাণ নেয়া (শোঁকা) যা সিয়ামপালনকারীর নিঃশ্বাসের সাথে গলার ভিতরে যেতে পারে।
- এমন কিছু করা যাতে তার শরীর দুর্বল হয়ে যাবে এবং সিয়াম চালিয়ে যেতে কষ্ট হবে। যেমন দূষিত রক্ত বহিষ্করণ ও অধিক রক্তদান।
- কুলি করা ও নাকে পানি নেয়াতে আধিক্য করা।
- মাজন বা টুথ পেষ্ট দিয়ে দাঁত মাজা।

এ ছাড়া আরো কিছু কাজ রয়েছে যা করলে সিয়ামপালনকারীর সিয়াম অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং তার সওয়াবও কম হয়ে যায়। যেমন মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, গীবত করা, চুগলখোরী করা। অনুরূপভাবে এমন সব কথা বলা যা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন ৪৪. কী কী কারণে সিয়াম নষ্ট বা বাতিল হয়?

স্ত্রী-সহবাস, বীর্যপাত, পানাহার, যা এক অর্থে পানাহার (যথা স্যালাইন ইঞ্জেকশন), ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা, মহিলার মাসিক অথবা নিফাস শুরু হওয়া, নিয়ত বাতিল করা, মুরতাদ হওয়া। উপরের কারণে সিয়াম ভঙ্গ হলে কাফ্ফারা দিতে হবে।

প্রশ্ন ৪৫. কী কী কারণে বৈধভাবে সিয়াম ভঙ্গ করা যায়?

- অসুস্থতা ঃ কোন কারণে হঠাৎ অসুস্থ হলে।
- সফর ঃ "আর যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে (সে সিয়াম ভঙ্গ করে) অন্য দিনে তা কাযা আদায় করে নেবে।"(সূরা বাকারা ঃ ১৮৫)
- সিয়ামের ক্ষেত্রে মুসাফিরের জন্য উত্তম হচ্ছে সিয়াম পালন করা। সিয়াম ভঙ্গ করলেও কোন অসুবিধা নেই। পরে উক্ত দিনগুলোর কাযা আদায় করে নেবে। তবে সিয়াম ভঙ্গ করা যদি বেশী আরামদায়ক হয় তাহলে সিয়াম ভঙ্গ করাই উত্তম। কেননা আল্লাহ বান্দাকে যে সুবিধা দিয়েছেন তা গ্রহণ করা তিনি পছন্দ করেন।

- কোন বিপদগ্রস্ত মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে সিয়াম ভঙ্গ করা; যেমন পানিতে ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার, আগুন থেকে বাঁচাতে গিয়ে দরকার হলে সিয়াম ভঙ্গ করা ইত্যাদি।
- গর্ভবতী নারীর নিজের বা শিশুর জীবনের আশংকা করলে সিয়াম ভঙ্গ করবে।
- সন্তানকে দুগ্ধদানকারী নারী যদি সিয়াম রাখলে নিজের বা সন্তানের জীবনের আশংকা করে তবে সিয়াম ভঙ্গ করবে।
- আল্লাহর পথে যুদ্ধে থাকার সময় শরীরে শক্তি বজায় রাখার জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় সাহাবীদেরকে বলেছিলেন, "আগামীকাল তোমরা শত্রুর মোকাবিলা করবে, সিয়াম ভঙ্গ করলে তোমরা অধিক শক্তিশালী থাকবে, তাই তোমরা সিয়াম ভঙ্গ কর।" (সহীহ মুসলিম)

প্রশ্ন ৪৬. সিয়াম ভঙ্গের কাযা কীভাবে আদায় করতে হবে?

উপরোক্ত কারণগুলোর কারণে সিয়াম কাযা হলে রমাদান মাসের পরে সমপরিমাণ সিয়াম আদায় করতে হয়। অর্থাৎ প্রতিটি সিয়ামের জন্য একটি করে সিয়াম।

প্রশ্ন ৪৭. খুবই বৃদ্ধ লোক। সিয়াম পালন তার জন্য খুবই কষ্টকর। তার জন্যে সিয়াম পালনের হুকুম কী?

তার উপর সিয়াম পালন করা জরুরী নয়। তবে এ ব্যক্তি অন্য কাউকে দিয়ে কাযা আদায় করাবে অথবা ফিদইয়া দিবে। প্রতি এক রোযার জন্য একজন মিসকিনকে এক বেলা খাবার খাওয়াবে। (৫১০ গ্রাম পরিমাণ ভাল খাবার)

প্রশ্ন ৪৮. অসুস্থ ব্যক্তির সিয়ামের নিয়ম কী?

মানুষ যদি এমন রোগে আক্রান্ত হয় যা থেকে সুস্থ হওয়ার কোন আশা নেই তাহলে প্রতিদিনের সিয়ামের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে। এটাকে বলে ফিদইয়া।

খাদ্য দেয়ার পদ্ধতি হচ্ছে, মিসকীনকে পরিমাণমত চাউল প্রদান করা এবং সাথে মাংস ইত্যাদি তরকারী হিসেবে দেয়া উত্তম। অথবা দুপুরে বা রাতে তাকে একবার খেতে দিবে। এটা হচ্ছে ঐ রুগীর ক্ষেত্রে যার সুস্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

প্রশ্ন ৪৯. সিয়াম ভঙ্গের কাফফারা কিভাবে আদায় করতে হবে?

উপযুক্ত কারণ ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়া সিয়ামের বদলে দিতে হয় কাফফারা। আর কাফ্‌ফারা হলে, সিয়াম না রাখার কারণে সুনির্দিষ্ট কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়। কাফফারা তিন ধরনের। (১) দাস মুক্ত করা, আর তা সম্ভব না হলে (২) একাধারে ৬০+১টি সিয়াম রাখা, আর সেটিও সম্ভব না হলে (৩) ৬০ জন মিসকীনকে এক বেলা খাবার খাওয়ানো। (সহীহ বুখারীর বর্ণনা মতে)

(ক) একদিনের সিয়াম ভংগের জন্য একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করতে হবে। মাঝখানে একদিন বাদ গেলে এর পরের দিন থেকে আবার একাধারে পূর্ণ দু' মাস সিয়াম পালন করতে হবে। অথবা

(খ) ৬০ জন মিসকিনকে এক বেলা আহার করাতে হবে।

প্রশ্ন ৫০. তারাবীহ সলাতের ইতিহাস কী?

আয়িশা (রা.) বলেছেন, 'একদা রসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে সলাত আদায় করলেন। তাঁর অনুসরণ করে অনেক লোক সলাত আদায় করল। অতঃপর পরের রাতে সলাত আদায় করলে লোক আরো বেশী হল। তৃতীয় রাতে লোকেরা জমায়েত হলে তিনি বাসা থেকে বের হলেন না। ফজরের সময় তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আমি তোমাদের আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। তোমাদের নিকট (সলাতের জন্য) বের হতে আমার কোন বাধা ছিল না। কিন্তু আমি আশঙ্কা করলাম যে, ঐ সলাত তোমাদের জন্য ফরয করে দেয়া হবে।" এ ঘটনা হল রমাদানের।' (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

প্রশ্ন ৫১. তারাবীর সলাত কাকে বলে?

রমাদানের রাতের বিশেষ নফল সলাতকে সলাতুত তারাবীহ বা তারাবীর সলাত বলা হয়। 'তারাবীহ' মানে হল আরাম করা বা বিশ্রাম নেয়া।

যেহেতু সলফে সালেহীনগণ ৪ রাক'আত সলাত আদায় করে বিরতির সাথে বসে একটু বিশ্রাম নিতেন, তাই তার নামও হয়েছে তারাবীর সলাত ।

প্রশ্ন ৫২. রমাদান মাসে রোযা বা সিয়াম পালন করার জন্য তারাবীর সলাত আদায় করা জরুরী বা বাধ্যতামূলক কি?

রমাদান মাসে রোযা বা সিয়াম পালন করার জন্য তারাবীর সলাত আদায় করা জরুরী বা বাধ্যতামূলক নয়, এটি নফল ইবাদত, এর সাথে সিয়াম পালনের কোন সম্পর্ক নেই । তারাবীহ পড়লে সওয়াব হবে না পড়লে কোন গুনাহ হবে না ।

প্রশ্ন ৫৩. বাস্তবে দেখা যায়, অনেকে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সলাত ঠিক মতো আদায় করেন না, বা পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সলাত আদায় করলেও জামাতের সাথে আদায় করেন না, বা 'ইশার সলাত জামাতে আদায় করেন না কিন্তু রমাদান মাস আসলে তারাবীর নফল সলাত খুবই গুরুত্ব দিয়ে মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করেন! এর কারণ কী?

ইসলামের ফরয এবং নফলের গুরুত্ব না বুঝার কারণে অনেকেই এই বড় ধরণের ভুলটি করে থাকেন । বাস্তবে দেখা যায় যে, রমাদান মাসে মসজিদে 'ইশার সলাত শুরু হয়ে গেছে কিন্তু মুসল্লি মাত্র এক দুই লাইন এবং 'ইশার পরপরই দেখা যায় তারাবীর নফল সলাত আদায় করার জন্য মুসল্লি দিয়ে মসজিদ ভরপুর । এই ধরণের অজ্ঞতা অবশ্যই আমাদের জন্য কল্যাণকর নয় ।

প্রশ্ন ৫৪. তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ সলাত কি একই?

রাত্রির বিশেষ নফল সলাত তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ নামে পরিচিত । রমাদানে 'ইশার পর প্রথম রাতে পড়লে তাকে 'তারাবীহ' এবং রমাদান ও অন্যান্য সময়ে শেষরাতে পড়লে তাকে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয় ।

উল্লেখ্য যে, তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, ক্বিয়ামুল লায়িল সবকিছুকে এক কথায় 'সলাতুল লায়িল' বা 'রাত্রির নফল সলাত' বলা হয় ।

তারাবীহ প্রথম রাতে একাকী অথবা জামা'আতসহ এবং তাহাজ্জুদ শেষরাতে একাকী পড়তে হয় । রসূলুল্লাহ ﷺ রমাদানের রাতে তারাবীহ ও

তাহাজ্জুদ দু'টিই পড়েছেন মর্মে সহীহ বা যঈফ সনদে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। (মির'আত ৪/৩১১ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ-৩৭)

প্রশ্ন ৫৫. রসূল ﷺ কিভাবে তারাবীহ পড়েছেন?

রসূল ﷺ প্রথম ৪ রাক'আত সলাতকে এক সময়ে একটানা পড়েছেন। অর্থাৎ তিনি ২ রাক'আত সলাত আদায় করার পর সাথে সাথেই আবার ২ রাক'আত সলাত আদায় করতেন। অতঃপর বসে বিরতি নিতেন। অতঃপর তিনি উঠে পুনরায় ২ রাক'আত সলাত আদায় করার পর সাথে সাথে আবার ২ রাক'আত আদায় করতেন। অতঃপর আবার বসে একটু জিড়িয়ে নিতেন এবং সবশেষে ৩ রাক'আত বিতর আদায় করতেন। এখান থেকেই সলফগণ (যারা সাহাবীদের অনুসরণ করেছেন) ১১ রাক'আত সলাতের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং তাই তাঁরা প্রথমে ২ সালামে ৪ রাক'আত সলাত আদায় করে একটু বিশ্রাম নিতেন। অতঃপর আবার ২ সালামে ৪ রাক'আত সলাত আদায় করে পরিশেষে ৩ রাক'আত বিতর আদায় করতেন। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

প্রশ্ন ৫৬. রসূল ﷺ কত রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন?

আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, রমাদানে আল্লাহর রসূল ﷺ -এর সলাত কত রাক'আত ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি রমাদানে এবং অন্যান্য মাসেও ১১ রাক'আতের বেশী সলাত আদায় করতেন না।' (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ)

সায়েব বিন ইয়াযীদ বলেন, '(খলীফা) উমার উবাই বিন কাব ও তামীম আদ-দারীকে আদেশ করেছিলেন যেন তাঁরা রমাদানে লোকদের নিয়ে ১১ রাক'আত তারাবীহ পড়েন। (মালেক মুওয়াত্তা, বাইহাকী)

পক্ষান্তরে ২০ রাক'আত তারাবীহ নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীস নেই। সাহাবাদের তরফ থেকে যে আসার বর্ণিত করা হয়, তার সবগুলিই যঈফ। ('স্বালাতুত তারাবীহ'-মুহাদ্দিস নাসিরউদ্দিন আলবানী)

প্রশ্ন ৫৭. তারাবীর সলাতে কুরআন খতম কি বাধ্যতামুলক?

তারাবীর সলাতে কুরআন খতম করার ব্যাপারে কোন দলীল নেই। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, ইমাম তাঁর ক্বিরাআতে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করবেন, ধীর ও শান্তভাবে কুরআন তিলাওয়াত করবেন খতম করতে না পারলেও; বরং মুক্তাদীরা যাতে উপকৃত হয় সেই চেষ্টাই করবেন। কুরআন খতম করা কোন জরুরী কাজ নয়; জরুরী হল লোকদেরকে তাদের সলাতের ভেতরে ক্বিরাআতের মাধ্যমে বিনয়-নম্রতা সৃষ্টি করে উপকৃত করা।

প্রশ্ন ৫৮. তারাবীর ইমাম কেমন হবেন?

তারাবীর মাধ্যমে কুরআন খতম করার উদ্দেশ্যে সাধারণত মসজিদগুলোতে ইমাম হিসেবে হাফিয নিয়োগ দেয়া হয়। এখন আমাদেরকে জানতে হবে যে সলাতের জন্য কে ইমাম হতে পারবেন বা ইমামের যোগ্যতা কী হবে? ইমাম তিনিই হবেন যিনি তাজবীদ ভাল জানেন, কুরআন ভাল জানেন, আর কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কুরআন ভাল জানা মানে হচ্ছে যিনি কুরআন শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করেন, কুরআন ভালভাবে বুঝেন ও দ্বীন ইসলাম ভাল জানেন ও সেই অনুযায়ী আমল করেন অর্থাৎ জীবন পরিচালনা করেন।

আমাদের সামাজে তারাবীর সলাত পড়ানোর জন্য অনেক হাফিয নিয়োগ দেয়া হয় যারা কুরআন শুধু মুখস্তই জানেন কিন্তু দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে ভাল জানেন না, আর কুরআন অনুযায়ী জীবনও পরিচালনা করেন না, এছাড়া নিজেদের চরিত্রের সাথেও কুরআনের তেমন মিল নেই। অনেক সময় ছোট ছোট বাচ্চাদেরও হাফিয হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় যাদের দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে ভাল জ্ঞান নেই। আর একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে হাফিয (ইমাম) যেন নাবালক না হন। এই বিষয়টিকে নিয়ে যেন আমরা নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি বা তর্কের সৃষ্টি না করি।

প্রশ্ন ৫৯. খতমে তারাবীহ কি ইসলামে কিছু আছে?

আমাদের দেশে তারাবীতে যেভাবে রেলগাড়ির মতো দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তা মোটেও ঠিক নয়। কুরআন তিলওয়াত করতে হবে ধীরস্থিরভাবে যাতে নিজে এবং মুক্তাদীরা বুঝতে পারেন। এছাড়া তারাবীর সলাতকে “খতমে তারাবীহ” বলাও বিদ’আত। কারণ তারাবীতে কুরআন খতম করতেই হবে এমন কোন বিধান নেই। অনেকে এই ভুল ধারণার

কারণে এক মসজিদে তারাবীহ্ শুরু করলে সারা মাস আর অন্য মসজিদে তারাবীহ্ পড়েন না! এই ধরণের কাজ ঠিক নয়।

প্রশ্ন ৬০. রমাদান মাসে আমি 'ইশা এবং তারাবীহ্ পড়তে মসজিদে গিয়ে দেখি 'ইশার জামা'আত হয়ে গেছে এবং তারাবীর সলাত চলছে। এখন আমি কোন সলাত আদায় করবো? 'ইশা নাকি তারাবীহ্?

সমাধান হচ্ছে ইমামের পিছনে জামা'আতে যোগদান করা। সকলে তারাবীহ্ আদায় করছে কিন্তু আমার নিয়ত থাকবে ইমামের পিছনে চার রাক'আত জামা'আতের সাথে 'ইশা আদায় করছি। ইমাম যখন দুই রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরাবেন তখন আমি সালাম ফিরাবো না বরং চার রাক'আত 'ইশা সম্পূর্ণ করবো।

এতে জামা'আতের সাথে আমার 'ইশার সলাত আদায় হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে যে মসজিদে ইমামের নেতৃত্বে কোন জামা'আত চললে একাকী কোন সলাত আদায় করা যাবে না অথবা কয়েকজন মিলে পিছনে আরেকটা জামা'আতও করা যাবে না, ইমামের সাথে জামা'আতে যোগ দিতে হবে।

প্রশ্ন ৬১. একটা সিয়াম ভংগের জন্যে ফিদইয়ার পরিমাণ কত?

এক মুদ (৫১০ গ্রাম) পরিমাণ গম।

অর্থাৎ প্রতি একদিনের সাওমের বদলে একজন মিসকীনকে এক মুদ (৫১০ গ্রাম) পরিমাণ গম (ভাল খাবার) প্রদান করবে। (বাইহাকী)

ফিদইয়া কার জন্য ঃ যে চিররোগী অথবা অতিবৃদ্ধ, যে রমাদানের পরেও সিয়াম পালন করতে অপারগ তার জন্যই শুধু ফিদইয়া। যে রমাদানের পরে কাযা করতে পারবে তার জন্য ফিদইয়া প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন ৬২. কী পরিমাণ অসুস্থ হলে সিয়াম ভঙ্গ করা যাবে?

রোগের কারণে যদি স্বাভাবিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলে, ডাক্তার যদি বলে যে, এ সিয়ামের কারণে রোগের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে, বা রোগীর ক্ষতি হতে পারে বা সুস্থতা বিলম্বিত হতে পারে তবেই সিয়াম ভাঙ্গবে। কিন্তু সামান্য অসুখ যেমন মাথাব্যাথা, সর্দি-কাশি অনুরূপ কোন সাধারণ রোগের কারণে সিয়াম ভঙ্গ করা জায়িয হবে না। মনে রাখতে হবে যে, রোগের কারণে

যেসব সিয়াম ভঙ্গ হবে ঠিক অনুরূপ সংখ্যক সিয়াম পরে কাযা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন ৬৩. অসুস্থ হলেও সিয়াম পালনে খুব কষ্ট হচ্ছে না এবং কোনরূপ ক্ষতির আশঙ্কাও নেই, এমতাবস্থায় কী করবে?

সিয়াম পালন করবে। এমন হলে সিয়াম ভঙ্গ করা জায়িয নয়।

প্রশ্ন ৬৪. সিয়াম অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে গেলে কী করবে?

সিয়াম ভেঙ্গে ফেলবে এবং পরে তা কাযা আদায় করবে।

প্রশ্ন ৬৫. কোন রোগী সুস্থ হওয়ার পর কাযা আদায় করার আগেই মৃত্যুবরণ করল, তার জন্য কী করতে হবে?

তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে প্রতি একদিনের সিয়াম-এর বদলে একজন মিসকিনকে একবেলা খাবার খাওয়াবে। অথবা তার কোন আত্মীয় যদি তারপক্ষ থেকে কাযা আদায় করে তবে মৃতের জন্য তা আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ৬৬. কোন অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থ হওয়ার পর কাযা সিয়াম আদায় না করে শুধু ফিদইয়া দিলে চলবে কি?

না, তা জায়িয হবে না। কাযা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন ৬৭. এক রমাদান মাসের কাযা আদায়ের পূর্বে অন্য রমাদান মাস এসে গেলে কী করবে?

এমতাবস্থায় চলতি রমাদানের সিয়াম আদায় করার পর পূর্বের সিয়ামগুলোর কাযা পালন করবে।

প্রশ্ন ৬৮. আমাদের সন্তানদের উপর কত বছর বয়স থেকে রমাদানের সিয়াম ফরয হবে?

ছেলে বা মেয়ে বালেগ হলেই তার উপর ঐবছর থেকে রমাদানের সিয়াম ফরয। সেই বছর থেকে উপরের সমস্ত নিয়ম-কানুন তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

নোট এক ঃ যে ব্যক্তি শরীয়তী ওযর ছাড়া (রমাদান) মাসে একটি সিয়ামও ছেড়ে দেবে, সে যদি এর বদলে সারা জীবনও সিয়াম পালন করে তবু তার গুনাহ মাফ হবে না। (সহীহ বুখারী)

নোট দুই ঃ যারা বালেগ হওয়ার পরও দীর্ঘ দিন সিয়াম পালন করেনি তাদেরকে সেই দিনগুলো হিসাব করে এখন কাযা আদায় করতে হবে এবং তাওবা করতে হবে।

প্রশ্ন ৬৯. কঠিন শারীরিক পরিশ্রম যারা করে তারা কি রমাদানের ফরয সিয়াম ভাঙ্গতে পারবে?

না, পারবে না।

প্রশ্ন ৭০. পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়নের চাপের কারণে সিয়াম কি ভাঙ্গতে পারবে?

না, তাও পারবে না। অধ্যয়ন সিয়াম ভঙ্গের ওযর (কারণ) হিসেবে গণ্য হবে না।

প্রশ্ন ৭১. যে ব্যক্তি বিনা কারণে অতীতে সিয়াম ভঙ্গ করেছে সে কীভাবে কাযা ও কাফফারা আদায় করবে?

এক রমাদানের সাওম তাকে পরবর্তী রমাদানের আগে আদায় করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে সারা জীবনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা কাযা আদায় করে নিতে হবে। এবং প্রতি সাওম-এর বদলে একটি সাওম পালন করতে হবে। আর তা রাখতে শারীরিকভাবে অক্ষম হলে একজন মিসকীনকে এক বেলা করে খাবার খাওয়াতে হবে।

প্রশ্ন ৭২. আধুনিক যুগের যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত ও আরামদায়ক হওয়ার কারণে সফর অবস্থায় সিয়াম পালন করা মুসাফিরের জন্য কষ্টকর নয়। এ অবস্থায় সিয়াম পালন করার বিধান কি?

মুসাফির সিয়াম পালন করা ও ভঙ্গ করার ব্যাপারে ইচ্ছাধীন। সাহাবায়ে কিরাম নাবী ﷺ -এর সাথে সফরে থাকলে কেউ সিয়াম পালন করতেন কেউ সিয়াম ভঙ্গ করতেন।

প্রশ্ন ৭৩. কারণ বশতঃ কোন ব্যক্তি যদি সিয়াম ভঙ্গ করে আর দিন শেষ হওয়ার আগেই উক্ত ওযর (কারণ) দূর হয়ে যায়। সে কি দিনের বাকী অংশ সিয়াম অবস্থায় কাটাবে?

না, দিনের বাকী অংশ সিয়াম অবস্থায় থাকা আবশ্যক নয়। তবে রমাদান শেষে উক্ত দিবসের কাযা তাকে আদায় করতে হবে। কেননা শরীয়ত অনুমদিত কারণেই সে সিয়াম ভঙ্গ করেছে।

প্রশ্ন ৭৪. সফর অবস্থায় কষ্ট হলে সিয়াম পালনের বিধান কি?

সফর অবস্থায় যদি এমন কষ্ট হয় যা সহ্য করা অসম্ভব, তবে সে সময় সিয়াম পালন করা মাকরূহ। কিন্তু সিয়াম পালন করতে যার কোন কষ্ট হবে না, তার জন্য উত্তম হচ্ছে নাবী ﷺ -এর অনুসরণ করে সিয়াম পালন করা। কেননা সফর অবস্থায় তিনি ﷺ সিয়াম পালন করতেন।

প্রশ্ন ৭৫. সন্তানকে দুগ্ধদানকারিণী কি সিয়াম ভঙ্গ করতে পারবে? ভঙ্গ করলে কিভাবে কাযা আদায় করবে? নাকি সিয়ামের বিনিময়ে খাদ্য দান করবে?

দুগ্ধদানকারিণী সিয়াম পালন করার কারণে যদি সন্তানের জীবনের আশংকা করে অর্থাৎ সিয়াম রাখলে স্তনে দুধ কমে যাবে ফলে শিশু ক্ষতিগ্রস্থ হবে, তবে মায়ের সিয়াম ভঙ্গ করা জায়িয। কিন্তু পরবর্তীতে তার কাযা আদায় করে নিবে। কেননা এ অবস্থায় সে অসুস্থ ব্যক্তির অনুরূপ।

প্রশ্ন ৭৬. ক্ষুধা-পিপাসা ও অতিরিক্ত ক্লান্তির সাথে সিয়াম পালন করলে সিয়ামের বিশুদ্ধতায় কি কোন প্রভাব পড়বে?

ক্ষুধা-পিপাসা ও অতিরিক্ত ক্লান্তির সাথে সিয়াম পালন করলে সিয়ামের বিশুদ্ধতায় এর কোন প্রভাব পড়বে না। বরং এতে অতিরিক্ত সওয়াব পাওয়া যাবে। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ আয়িশা (রা.)-কে বলেছিলেন, "তোমার ক্লান্তি ও কষ্ট অনুযায়ী তুমি সওয়াব পাবে।" (সহীহ বুখারী)

প্রশ্ন ৭৭. বমি করলে কি সিয়াম ভঙ্গ হবে?

কোন লোক যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তবে তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। রসূলুল্লাহ ﷺ

বলেন, “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বমি করবে সে যেন সিয়াম কাযা আদায় করে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত যার বমি হয় তার কোন কাযা নেই।” (আবু দাউদ)

প্রশ্ন ৭৮. রমাদানের প্রত্যেক দিনের জন্য আলাদা আলাদাভাবে কি নিয়ত করা আবশ্যক? নাকি পূর্ণ মাসের নিয়ত একবার করে নিলেই হবে?

রমাদানের প্রথমে পূর্ণ মাসের জন্য একবার নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে। কেননা সিয়াম পালনকারী যদি প্রতিদিনের জন্য রাতে নিয়ত না করে, তবে তা রমাদানের প্রথমের নিয়তের শামিল হয়ে তার সিয়াম বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ৭৯. সিয়াম পালনকারী ভুলক্রমে পানাহার করলে তার সিয়ামের বিধান কি? কেউ এটা দেখলে তার করণীয় কি?

রমাদানের সিয়াম রেখে কেউ যদি ভুলক্রমে খানা-পিনা করে তবে তার সিয়াম বিশুদ্ধ। তবে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে বিরত হওয়া ওয়াজিব। কেউ যদি দেখতে পায় যে ভুলক্রমে কোন মানুষ খানা-পিনা করছে, তবে তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে, তাকে বাঁধা দেয়া এবং সিয়ামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। কেননা ইহা গর্হিত কাজে বাধা দেয়ার অন্তর্গত।

প্রশ্ন ৮০. ঋতুবর্তী যদি ফজরের পূর্বে পবিত্র হয় এবং ফজর হওয়ার পর গোসল করে, তবে তার সিয়াম পালনের বিধান কি?

ফজরের পূর্বে পবিত্র হয়েছে এব্যাপারে নিশ্চিত হলে, তার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে।

প্রশ্ন ৮১. সিয়াম পালনকারীর ঠাণ্ডা ব্যবহার করার বিধান কি?

ঠাণ্ডা-শীতল বস্তু অনুসন্ধান করা সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির জন্য জায়িয, কোন অসুবিধা নেই। রসূল ﷺ সিয়াম পালনরত অবস্থায় গরমের কারণে বা তৃষ্ণার কারণে মাথায় পালি ঢালতেন। (আবু দাউদ)

প্রশ্ন ৮২. সিয়াম পালনকারীর জন্য আতর-সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়ার বিধান কি?

সিয়াম পালনকারীর আতর-সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। চাই তৈল জাতীয় হোক বা ধোঁয়া জাতীয়। তবে ধোঁয়ার সুঘ্রাণ নাকের কাছে

নিয়ে শুঁকবে না। কেননা এতে একজাতীয় পদার্থ আছে যা পেট পর্যন্ত পৌঁছায়, তখন সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ৮৩. সিয়াম পালন করা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে কি সিয়াম বিশুদ্ধ হবে?

হ্যাঁ, তার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে। কেননা স্বপ্নদোষ সিয়াম বিনষ্ট করে না। স্বপ্নদোষ তো মানুষের অনিচ্ছায় হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ৮৪. সিয়াম পালনকারীর কফ অথবা থুথু গিলে ফেলার বিধান কি?

কফ বা শ্লেষা যদি মুখে এসে একত্রিত না হয় গলা থেকেই ভিতরে চলে যায় তবে তার সিয়াম নষ্ট হবে না। কিন্তু যদি গিলে ফেলে তবে সে ক্ষেত্রে বিদ্বানদের দু'টি মত রয়েছে ঃ

১ম মত ঃ তার সিয়াম নষ্ট হবে যাবে। কেননা উহা পানাহারের স্থলাভিষিক্ত।
২য় মত ঃ সিয়াম নষ্ট হবে না। কেননা উহা মুখের সাধারণ থুথুর অন্তর্গত। মুখের মধ্যে সাধারণ পানি যাকে থুথু বলা হয় তা দ্বারা সিয়াম নষ্ট হয় না। এমনকি যদি থুথু মুখের মধ্যে একত্রিত করে গিলে ফেলে তাতেও সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন ৮৫. সিয়াম কাযা থাকলে শাওয়ালের ছয়টি সিয়াম রাখার বিধান কি?

শাওয়ালের ছয়টি সিয়াম রমাদানের সাথে সম্পর্কিত। যে ব্যক্তি রমাদানের সিয়াম পূর্ণ করেনি তার জন্য উক্ত ছয় সিয়ামের সওয়াব সাব্যস্ত হবে না।

প্রশ্ন ৮৬. সিয়াম রেখে হারাম বা অশ্লীল কথাবার্তা উচ্চারণ করলে কি সিয়াম নষ্ট হবে?

নাবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (সিয়াম রেখে) মিথ্যা কথা, মিথ্যা অভ্যাস ও মূর্খতা পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার পরিহার করার মাঝে আল্লাহর কোন দরকার নেই।" (সহীহ বুখারী) অতএব এ কথা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, সিয়াম পালনকারী যাবতীয় ওয়াজিব বিষয় বাস্তবায়ন করবে এবং

সবধরনের হারাম থেকে দূরে থাকবে। মানুষের গীবত করবে না। অবশ্য এ সমস্ত বিষয় সিয়ামকে ভঙ্গ করে দিবে না। কিন্তু নিঃসন্দেহে তার সওয়াব বিনষ্ট করে দিবে।

প্রশ্ন ৮৭. মিথ্যা সাক্ষী দেয়ার বিধান কি? ইহা কি সিয়াম নষ্ট করে?

মিথ্যা সাক্ষী দেয়া অন্যতম কবীরা গুনাহ। আর তা হচ্ছে না জেনে কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া অথবা জেনে শুনে বাস্তবতার বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করা। এতে সিয়াম বিনষ্ট হবে না। কিন্তু সিয়ামের সওয়াব কমিয়ে দিবে।

প্রশ্ন ৮৮. জনৈক অসুস্থ ব্যক্তি রমাদানে সিয়াম কাযা করেছে। কিন্তু পরবর্তী মাস শুরু হওয়ার চারদিনের মাথায় তার মৃত্যু হয়। তার পক্ষ থেকে কি কাযা সিয়ামগুলো আদায় করতে হবে?

তার এই অসুখ যদি চলতেই থাকে সুস্থ না হয় এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে তবে তার পক্ষ থেকে কাযা আদায় করতে হবে না।

প্রশ্ন ৮৯. রমাদানের সিয়াম কাযা বাকী থাকাবস্থায় পরবর্তী রমাদান এসে গেলে কি করবে?

পরবর্তী রমাদান আসার পূর্বেই উহা কাযা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। কিন্তু সে যদি পরবর্তী রমাদান পর্যন্ত দেরী করে এবং সিয়ামটি রয়েই যায়, তবে তার উপর আবশ্যক হচ্ছে, আল্লাহর কাছে তাওবা ইস্তিগফার করা, এই শীথিলতার জন্য লজ্জিত অনুতপ্ত হওয়া এবং যত দ্রুত সম্ভব তা কাযা আদায় করে নেয়া।

প্রশ্ন ৯০. শাওয়ালের ছয়টি সিয়াম পালন করার ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি কি? এবং এই ছয়টি সিয়াম রাখার জন্য কি ইচ্ছামত দিন নির্ধারণ করা জায়িয?

শাওয়ালের ছয়টি সিয়াম পালন করার ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, ঈদের পর পরই উহা আদায় করা এবং পরস্পর আদায় করা।

"যে ব্যক্তি রমাদানের সিয়াম পালন করার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি সিয়াম পালন করবে, সে সারা বছর সিয়াম পালন করার প্রতিদান লাভ করবে।"

(সহীহ মুসলিম) এ ছয়টি সিয়ামের জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করা নেই। মাসের যে কোন সময় সিয়ামগুলো রাখা যায়।

প্রশ্ন ৯১. শবে বরাত, শবে মিরাজ ও লাইলাতুল ক্বদরে কী করণীয়?

শবে বরাত বলতে ইসলামে কিছু নেই এবং কোন আমলও নেই, এটি বিদ'আত, শবে রবাত পালন করলে গুনাহ হবে। শবে মিরাজে রসূল ﷺ উর্ধগমনে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কোন দিন শবে মিরাজ পালন করেন নাই তাই এটি পালন করাও বিদ'আত। ইসলামে যা আছে তা হচ্ছে সবই লাইলাতুল ক্বদরকে ঘিরে, এই রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে এবং শেষ দশ রমাদানে বিজোড় রাত্রিগুলোতে ইবাদত করতে বলা হয়েছে, এই রাত্রি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

প্রশ্ন ৯২. সিয়ামের উপকারিতা কী কী?

- তাকওয়া অর্জন (আল্লাহর ভয়/ভালবাসা)।
- পাপাচার থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংরক্ষণ হয়।
- ধৈর্যের অনুশীলন হয়।
- সিয়াম স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।
- জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ঢাল স্বরূপ।
- শয়তানের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়। কারণ যখনই মানুষ কম খায় তখন তার প্রবৃত্তির চাহিদা দুর্বল হয়ে যায়। ফলে সে গুনাহের কাজ হতে বিরত থাকে।

প্রশ্ন ৯৩. কেন রমাদানের জন্য প্ল্যান করা উচিত?

- সবচেয়ে সম্মানিত মাস।
- তাকওয়া অর্জন এবং নিজেকে তৈরী করার মাস।
- এই মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে।
- আল্লাহ নিজে সিয়ামদারদের জন্য পুরষ্কার দেন।
- জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফের উপযুক্ত সময়।
- জান্নাতের দরজাগুলো খোলা রাখা হয়।
- জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ রাখা হয়।
- শয়তানকে চেইন দিয়ে আটকিয়ে রাখা হয়।

- এই মাসের ক্বদরের রাত্রি এক হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

প্রশ্ন ৯৪. রমাদানের পূর্বে প্রস্তুতি ও প্ল্যানিং কী হওয়া উচিত?

- রমাদান মাস আসার পূর্বেই রমাদানের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা করে পরিবারের জন্য যা যা প্রয়োজন তা কিনে ফেলা যাতে রমাদানে আমরা বেশি বেশি ইবাদতে সময় দিতে পারি।
- যদি সম্ভব হয় রমাদান শুরু হওয়ার আগেই ঈদের শপিং করে ফেলা।
- বিশেষ করে রমাদানের শেষ দশ দিনের জন্য কোন প্রকার কেনা-কাটা বা বাইরের কোন কাজকর্ম ফেলে না রাখা।
- রমাদান শুরু হওয়ার আগে থেকেই সন্তানদের রমাদানের জ্ঞান দিয়ে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা যাতে তারা এর মর্ম বুঝতে পারে।

প্রশ্ন ৯৫. রমাদানের মধ্যে আমরা কী কী ভাল কাজ করতে পারি?

রমাদান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য এক অশেষ নিয়ামত। এই মাসে আল্লাহ তার বান্দার গুনাহ মাপের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। সব নেক কাজের প্রতিদান তো আল্লাহ্ অবশ্যই দিবেন, কিন্তু সিয়াম এর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "সিয়াম কেবল আমার জন্য এবং এর প্রতিদান আমি নিজেই দেব"। একটু ভেবে দেখি, হতে পারে এটিই আমার জীবনের শেষ রমাদান। তাই আসুন অন্যান্য কাজ কিছু কমিয়ে দিয়ে নিম্নের পরিকল্পনা অনুযায়ী পুরো রমাদান মাসটাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাই।

নিজের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা ঃ আমার ভিতরে যে সকল দোষ-ত্রুটি আছে সেগুলির একটা লিষ্ট তৈরী করে ফেলি এবং রমাদান মাসে নিজের ঐ সকল দোষ-ত্রুটিগুলো আস্তে আস্তে কমিয়ে নিয়ে আসি। যেমন ঃ অধিক বিলাসিতা এবং প্রাচুর্য, মিথ্যা কথা বলা, গীবত করা, চুগলখোরী করা, লোভ করা, অহংকার করা, গর্ব করা, রিয়া করা, হিংসা করা, সুদ দেয়া বা নেয়া, কাউকে ঠকানো, আমানত খিয়ানত করা, কথা দিয়ে কথা না রাখা, মুনাফিকী করা, কাউকে অপবাদ দেয়া, যিনা করা, লটারী খেলা বা যে কোন ধরনের জুয়া খেলা, মদ খাওয়া, হারাম জায়গায় যাওয়া, খারাপ লোকদের সাথে চলা-ফেরা করা, অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত কথা বলা, নিজেকে বড় ভাবা, অন্যকে তুচ্ছ মনে করা ইত্যাদি।

আত্মসমালোচনা ও তাওবা করা ঃ আমি আমার জীবনে যে সকল পাপ করেছি তা আমি ভাল করে জানি। এবার তার একটা লিষ্ট মনে মনে তৈরী করে ফেলি এবং আত্মসমালোচনা করে নিজের অতীত অপকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে খাঁটি অন্তরে তাওবা করি।

ইসলামের দাওয়াতী কাজ ঃ ইসলামের দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্যে লিষ্ট করে নিজের ঘর থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে রমাদান ও ঈদের উপহারস্বরূপ একসেট বই র‍্যাপিং করে গিফ্‌ট করতে পারি। এছাড়া অমুসলিমদেরকেও রমাদান উপলক্ষে দাওয়াতী মেটিরিয়্যালস গিফ্‌ট হিসাবে দিতে পারি।

সলাতে নিয়মিত হওয়া ঃ আমার যদি সলাতে গাফিলতি থাকে তাহলে এখন থেকেই ফরয পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের ব্যাপারে সিরিয়াস হওয়া উচিত এবং এটাই উপযুক্ত সময়, যেন কোনভাবেই এক ওয়াক্ত সলাত ছুটে না যায়। একই পলিসি পুরো পরিবারের জন্য চিন্তা করি। এছাড়া এই মাস থেকে জামাতে সলাতের অভ্যেস গড়ে তুলি। রাতে তারাবীর সলাত যথাসম্ভব পড়ার চেষ্টা করি।

তাহাজ্জুদ/নফল ইবাদত ঃ রমাদানের শেষ দশ রাতে লাইলাতুল ক্বদরের সন্ধান করি এবং সম্ভব হলে রমাদানের শেষ দশদিন ইতিকাফে বসার নিয়্যত করি। গভীর রাতে উঠে প্রতি রাতেই তাহাজ্জুদ সলাত পড়ার চেষ্টা করি। আত্মসমালোচনা করে নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে কান্না-কাটি করে তাওবা করি। এবং মা-বাবার জন্য বেশী বেশী করে দু'আ করি।

বুঝে কুরআন অধ্যয়ন ঃ পরিবারের সবাই টিভি দেখা কমিয়ে দিয়ে এবং সন্তানদের কম্পিউটার গেইমস খেলা কমিয়ে দিয়ে সকলে মিলে পুরো কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝার প্রজেক্ট হাতে নেই এই মাসে। প্রথমে এই সিলেক্টেড সূরাগুলো আমরা পড়তে পারি। যেমন ঃ সূরা ফাতিহা; সূরা বাকারাহ্ (১৮৩-১৮৭); সূরা মু'মিনুন (১-১১); সূরা হুজুরাত (১০-১২); সূরা ক্বদর; সূরা আসর; সূরা ইনফিতার; সূরা ইনশিকাক; ও সূরা তাগাবুন এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা অধ্যয়ন। তিলাওয়াতে সমস্যা থাকলে তাও এই মাসে ঠিক করে নিই। তবে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে নিজেদেরকে শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে যেন সীমাবদ্ধ না রাখি, কুরআন অর্থসহ বুঝার চেষ্টা করি। কারণ কুরআন এসেছেই বুঝার জন্য শুধু তিলাওয়াতের জন্য নয়।

শুধু তিলাওয়াতে আল্লাহর আদেশ বা নিষেধ কোনটাই বোঝা যায় না, ফলে আমলও করা যায় না ।

ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন ঃ আমাদের প্রকাশিত “ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজের” ১২ টি বই সংগ্রহ করে নিয়মিত অধ্যয়ন করা ।

১) তাকওয়া ২) ঈমানের স্বচ্ছ ধারণা ৩) এই আধুনিক যুগে কিভাবে সুখি ও সুন্দর পরিবার গঠন করবো? ৪) নারীদের যে বিষয়গুলো না জানলেই নয় ৫) The Way is One - তাওহীদ ও শিরক এবং সুন্নাত ও বিদ’আত ৬) প্যারেন্টিং ৭) মহিলা পুরুষে সলাতে কোন পার্থক্য নেই (Prophet’s Prayer) ৮) ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে কীভাবে উন্নতি করবে? ৯) One Ayah a Day (365 Ayaat) ১০) One Hadith a Day (365 Ahadith) ১১) আমাদের মুসলিম পরিবারের ছেলেমেয়েরা কেন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? ১২) সহীহ দু’আ ও নফল ইবাদত সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও পদ্ধতি ।

যাকাত ও সদাকা ঃ যাকাতের সঠিক হিসাব করে ফেলি এবং তার সাথে আরো অতিরিক্ত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অংক যোগ করে গরীব আত্মীয়-স্বজনদের লিষ্ট করে সদাকা করি এবং একটা বিশেষ অংশ দ্বীন ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যয় করি । এই মাসে কতজন সিয়ামদারকে ইফতার করাবো তার পরিকল্পনা করে ফেলি । দান-সদাকা যেন শুধু রমাদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখি । রমাদান হচ্ছে এক মাসের ট্রেনিং পরবর্তী ১১ মাসের জন্য । তাই নিজের হালাল ইনকাম থেকে প্রতি মাসে নিয়মিত সদাকা চালিয়ে যাই । হারাম ইনকাম অবশ্যই বর্জন করতে হবে কারণ হারামের রুজি থেকে দান-সদাকা আল্লাহ কবুল করবেন না ।

অন্যকে ক্ষমা করে দেয়া ঃ যাদের উপর আমাদের রাগ বা অভিমান আছে তাদের ভুলত্রুটি এই রমাদানে ক্ষমা করে দেই । তাদের উপর কোন অভিযোগ না রাখি । তাদেরকে কাছে টেনে নিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়াই ও সুসম্পর্ক গড়ে তুলি ।

প্রশ্ন ৯৬. সিয়ামের মধ্যে আরো কী কী করণীয় রয়েছে?

- সাহুর (সেহরি) খাওয়া এবং বিলম্বে সাহুর খেতে চেষ্টা করা । কারণ সাহুর খাওয়া রসূল ﷺ -এর সুন্নত ।
- যথাসম্ভব সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা, বিলম্ব না করা ।
- কল্যাণমূলক কাজ বেশি বেশি করা ।

- অর্থ বুঝে বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা।
- কম খাওয়া, কম ঘুমানো।
- গরিব-অসহায় মানুষের খোঁজ খবর নেয়া।
- ধৈর্যের অনুশীলন করা।
- দুনিয়ার ব্যস্ততা কমিয়ে আখিরাতের প্রতি ধাবিত হতে চেষ্টা করা।
- জান্নাতের প্রার্থনা করা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি চাওয়া।
- বেশি বেশি করে আল্লাহর নিকট দু'আ করা এবং গুনাহ মাফের জন্য কান্নাকাটি করা।
- তাহাজ্জুদ সলাতে দু'আ কবুল হয়।
- সিয়ামদারকে ইফতার করানো এবং সাহুর খাওয়ানো।
- যদি সম্ভব হয় রমাদান মাসের মধ্যে উমরাহ্ পালন করা।
- রমাদানের শেষ ১০ দিন ইতিকাফ করা।

প্রশ্ন ৯৭. রমাদানে কী খাওয়া উচিত নয়?

- ভাজা-পোড়া এবং চর্বিজাতীয় খাবার।
- যে খাবারে খুব বেশী চিনি আছে।
- সাহুরে পেট ভর্তি করে না খাওয়া।
- সাহুরে চা-কফি না খাওয়া। চা-কফি খাওয়ার কারণে প্রচুর প্রশ্রাব হয় এবং এতে মুল্যবান মিনারেল সল্ট বের হয়ে যায় যা দিনের বেলা শরীরের জন্য প্রয়োজন।
- সিগারেট বা ধুমপান না করা। একেবারে বন্ধ করতে না পারলে আস্তে আস্তে কমিয়ে নিয়ে আসা এবং রমাদানের পর একেবারে ছেড়ে দেয়া, ইনশাআল্লাহ। সিগারেট ত্যাগ করার উপযুক্ত সময় হচ্ছে রমাদান মাস।

প্রশ্ন ৯৮. রমাদানে কী খাওয়া উচিত?

- সেহরীতে ভাত, আলু, রুটি (কমপ্লেকস কার্বোহাইড্রেডস) খাওয়া উচিত যাতে শরীরে খাবারটা দীর্ঘক্ষণ থাকে এবং ক্ষুধা কম পায়।
- খেজুর হচ্ছে সবচেয়ে ভাল খাবার যার মধ্যে একসাথে চিনি, ফাইবার, কার্বোহাইড্রেডস, পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে।
- কলা খাওয়া খুবই ভাল যার মধ্যে কার্বোহাইড্রেডস, পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে।

- বিভিন্ন রকমের ফল খাওয়া উচিত। ইফতারে ঠান্ডা দুধ উপকারী।
- ইফতার এবং ঘুমুতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত প্রচুর পানি অথবা ফলের জুস খাওয়া। এতে শরীরের সারাদিনের পানির ঘাটতি পূর্ণ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ৯৯. আমাদের দেশে রমাদানের মধ্যে এবং রমাদানের পরের বাস্তব চিত্রগুলো কী কী?

রমাদান মাস বেশী বেশী ইবাদত-বন্দিগীর মাস। এই মাসে মহিলারা যতো কম ঘর থেকে বের হওয়া যায় ততোই ভাল। কিন্তু বাস্তবে দৃশ্য ভিন্ন। এই মাসেই আমদের মুসলিম মহিলারা বেশী শপিং নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়, সারা মাস ধরে কেনাকাটা করেন, অনেকে আবার কেনাকাটার চাপে পরে ওয়াক্তের সলাতটাও আদায় করতে পারছেন না। আল্লাহ বলেছেন রমাদানের শেষ দশ দিনে আরো বেশী বেশী ইবাদত কর এবং লাইলাতুল ক্বদর খোঁজ। কিন্তু বাস্তবে আমরা এই রমাদানের শেষ দশদিনে আরো বেশী ব্যস্ত হয়ে যাই। ব্যবসায়ীরা যেমন ব্যস্ত তেমনি মহিলা-পুরুষ উভয় ক্রেতারাই ব্যস্ত, সারা দিন মার্কেটে সময় কাটছে, কোন কোন মার্কেট আবার রমাদানের শেষ দিকে সারারাত খোলা রাখে। কোথায় তাহাজ্জুদ? কোথায় ইতিকাফ আর কোথায় লাইলাতুল ক্বদর?

এবার রমাদানের বিদায়ের পালা। এই তো বিদায় দিচ্ছি তিলাওয়াত, তাকওয়ার অনুশীলন, ধৈর্য, রহমত, মাগফিরাত ও মুক্তি লাভের মুবারক মাসটিকে। তাহলে কি আমরা প্রকৃত তাকওয়া অর্জন করতে পেরেছি? রমাদান এমন একটি মাস যাতে এ সময়টিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে আমরা নিজেদের আমল, শরিয়ত পরিপন্থী আচার ব্যবহার পরিত্যাগ ও চরিত্র সংশোধন করে নিতে পারি। আল্লাহ বলেছেন ঃ *“নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ পর্যন্ত কোন জাতির পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করে নেয়।” (সূরা রা’দঃ ১১)* লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো আমরা রমাদানে আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছি তা ভঙ্গ করার অনেক চিত্রই রমাদান শেষ হওয়ার সাথে সাথে সমাজে ফুটে উঠে। যেমন ঃ

- পুরো রমাদান মাস তারাবীর (সুন্নত) সলাতে মুসল্লি দ্বারা মসজিদ পরিপুর্ণ থাকার পর অন্য মাসগুলোতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সলাতে মুসল্লির সংখ্যা কমে যায়। তার মানে ফরযের চেয়ে সুন্নাতকে বেশী

গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে তাই সুন্নাত সলাতে মসজিদ ভরে যাচ্ছে কিন্তু ফরয পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে এক লাইনও হচ্ছে না!

- সারা রমাদান মাস তাকওয়া অর্জন করে ঈদ উদযাপন করা হচ্ছে নাচ-গান ও সিনেমা এবং ইসলাম বিরোধী কর্ম-কান্ড দিয়ে।
- আমাদের দেশে দেখা যায় রমাদান মাসে জাকজমকভাবে পত্রিকায় এবং টিভিতে বিজ্ঞাপন দেয়া হয় যে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে এবার সারা দেশব্যাপি মুক্তি পাচ্ছে নাচে গানে মন মাতানো ....ছবি। এই হচ্ছে একমাস তাকওয়া অর্জনের পর পবিত্র ঈদের উপহার।
- শুধু রমাদান মাসে পর্দা করা আর রমাদানের পরে পর্দা ছেড়ে দেয়া। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় আমাদের দেশে টিভিতে রমাদান মাস এলে মহিলারা খবর পড়ার সময় মাথায় কাপড় দেন আর ঈদের দিন থেকে মাথার কাপড় সরিয়ে নেন।

এত বড় নিয়ামতের এটাই কি শোকর আদায়, এটাই কি আমল কবুল হওয়ার নিদর্শন? নিশ্চয় নয়। বরং এটা আমল কবুল না হওয়ার আলামত। কেননা প্রকৃত সিয়ামদার ঈদের দিন সিয়াম ছেড়ে দিয়ে আনন্দিত হবে এবং সিয়াম পূর্ণ করার তাওফীক পাওয়ার দরুন তার প্রতিপালকের প্রশংসা করবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সাথে সাথে এই ভয়ে কাঁদবে যে, না জানি আমার সিয়াম কবুল হয়নি। আমাদের পূর্বসূরীগণ মাহে রমাদানের পর ছয় মাস পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে সিয়াম কবুল হওয়ার দু'আ করতেন। আমল কবুল হওয়ার আলামত হল, পূর্ববর্তী অবস্থার চেয়ে বর্তমান অবস্থা উন্নত হওয়া। সত্যিকার মু'মিন বান্দা সর্বদাই আল্লাহর ইবাদত করবে। কোন নির্দিষ্ট মাস, জায়গা অথবা জাতির সাথে মিলে আমল করবে না।

প্রশ্ন ১০০. রমাদানের পরে আমার দায়িত্ব কী?

রমাদানের পর কিন্তু আমাদের দায়িত্ব আরো অনেক বেড়ে যাবে। আমাদেরকে আগের চেয়ে অনেক বেশী সতর্ক থাকতে হবে। কারণ ইবলিস শয়তানের ডিউটি আমাদের পিছনে এখন আরো বাড়িয়ে দেবে। সে এখন আমাদেরকে বিপথে নেয়ার জন্য চারিদিক থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। সূরা আরাফের ১৭ নং আয়াতে ইবলিস শয়তান ঘোষণা দিয়েছে ঃ "আমি মানব জাতির ডান দিক দিয়ে আসব, বাম দিক দিয়ে আসব, সামনের দিক দিয়ে

আসব, পিছন দিক দিয়ে আসব।” তাই আমরা সতর্ক থাকবো এবং নিম্নের কাজগুলো অনুসরণ করবো, ইনশাআল্লাহ।

- যে সকল গুনাহগুলো আমরা পূর্বে করতাম সেগুলো আর করবো না, ইনশাআল্লাহ। হতে পারে সেগুলো ছোট গুনাহ বা বড় গুনাহ।
- নিজেকে এবং পরিবারকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রজেক্ট হাতে নেবো। নিজ বাড়িতে ইসলামী পরিবেশ তৈরী করবো।
- প্রতিদিন অন্ততপক্ষে একঘণ্টা কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর জ্ঞান অর্জন করবো।
- ভুল শিক্ষা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করবো এবং Authentic source থেকে জ্ঞান অর্জন করবো।
- নিজের হালাল রুজি থেকে নিয়মিত সদাকা করবো। আগের চেয়ে সদাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিবো। দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও দাওয়াতী কাজের জন্য বেশী বেশী অর্থ ব্যয় করবো।
- মহিলাদের মাঝে পর্দার ঘাটতি থাকলে তা দিন দিন পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করবো, পর্দার উপর কুরআন ও হাদীস থেকে পড়াশোনা করবো।
- টিভিতে আজে-বাজে হিন্দি মুভি, নাটক, গান, সিনেমা ইত্যাদি দেখা বন্ধ করে দিবো।
- নিয়মিত মসজিদে গিয়ে জামাতে সলাত পড়ার অভ্যেস গড়ে তুলবো।
- কোন দিন মসজিদে যেতে না পারলে নিজ ঘরে পরিবারের সবাইকে নিয়ে জামাত করে সলাত আদায় করবো।
- ইসলামী মনমানসিকতার পরিবারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবো এবং তাদের সাথেই নিয়মিত উঠা-বসা করবো।
- সপরিবারে নিয়মিত ইসলামিক প্রোগ্রাম, সেমিনার, শর্ট কোর্স এবং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করবো।
- ঘরে বসে সপরিবারে নিয়মিত ইসলামিক স্কলারদের প্রোগ্রাম টিভি চ্যানেলে এবং ডিভিডিতে দেখবো।
- কোন ইসলামিক অর্গানাইজেশনের সাথে থেকে নিয়মিত ইসলামের দাওয়াতী কাজ করবো, কারণ দাওয়াতী কাজ হচ্ছে টিম ওয়ার্ক, এতে

ফল ভাল পাওয়া যায়। (প্রথমে অমুসলিমদের মাঝে এবং তার পাশাপাশি নন-প্র্যাক্টিসিং মুসলিমদের মাঝে)।

- অতিরিক্ত অর্থ কামানোর প্রতি বা সম্পদের প্রতি লোভ কমিয়ে নিয়ে আসবো। অবৈধ আয়-রোযগারের সাথে জড়িত থাকলে তা অবশ্যই বন্ধ করে দিবো। অর্থের প্রতি লোভ মানুষের আত্মাকে মেরে ফেলে। মৃত আত্মাকে জাগ্রত করার জন্য বেশী বেশী সদাকা করবো।
- নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিবো। যে কোন পারিবারিক প্রোগ্রামে (যেমন বিয়ের অনুষ্ঠানে) নারী-পুরুষের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখবো।
- কোথাও দাওয়াত খেতে গেলে যেন পুরো সময়টা গল্প-গুজবে কেটে না যায়, সেখানে কুরআন-হাদীস থেকে ২০-৩০ মিনিটের শিক্ষণীয় বক্তব্য রাখবো এবং পারিবারিক দাওয়াতকে অর্থপূর্ণ করে তুলবো।
- পরিবারের সবাইকে নিয়ে সপ্তাহে একদিন নিজ ঘরে ইসলামের কোন একটা বিষয়ের উপর পারিবারিক প্রোগ্রাম করবো।
- নিজ ঘরে ইসলামী বই-পত্র এবং ডিভিডি দিয়ে একটি পারিবারিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করবো।

সহযোগী রেফারেন্স বই

- ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম - শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহ.)
- রমাযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল - আবদুল হামীদ ফাইযী
- ফিকহুস সিয়াম ঃ সিয়ামের বিধান ও মাসায়েল - মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ
- ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত - জাবেদ মুহাম্মাদ
- যাকাত ব্যবস্থা ঃ উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও আদায় - সারওয়ার কবির শামীম
- যাকাত হিসাব - ফরহাদ হোসেন চৌধূরী
- প্রশ্ন ও উত্তর - ড. জাকির নায়েক

হাজ্জ জীবনে একবার ফরয।

আসুন আল্লাহর রসূল ﷺ যেভাবে হাজ্জ করেছেন
ঠিক সেভাবে আমরাও সহীহভাবে হাজ্জ পালন করি।

হাইস্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েদের জীবন পরিচালনায়
কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সঠিক গাইডলাইন।